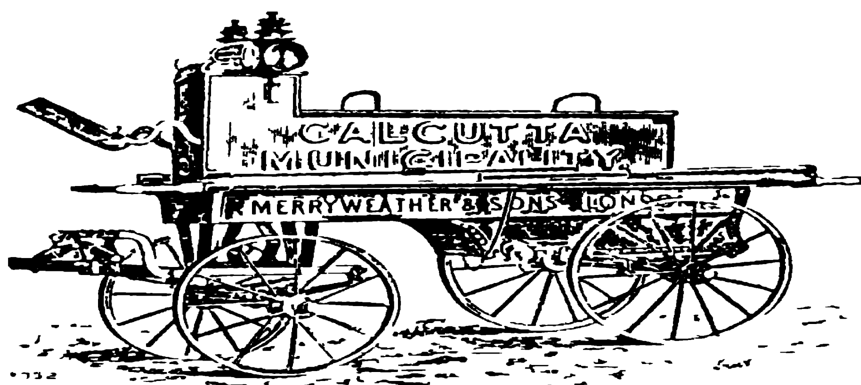
# কলের শহর
# কলকাতা

সিদ্ধার্থ ঘোষ




রীডার্স কর্নার
৫ শঙ্কর ঘোষ লেন । কলিকাতা ৬

প্রথম প্রকাশ—রাসপূর্ণিমা, ১৩৬৬

প্রচ্ছদ

শ্রীসমর দে

প্রকাশক ও মুদ্রক শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ মিত্র, এম-এ
বোধি প্রেস । ৫ শঙ্কর ঘোষ লেন । কলিকাতা ৬

# সূচি

## চিত্রসূচি

## ঋণ-স্বীকার

দেশ পত্রিকায় এই লেখাটির একটি পূর্বাভাস প্রকাশের পর পুস্তকাকারে সেটি পেশ করার সুযোগ পেয়েছি শ্রীবাদল বসুর সৌজন্যে। বিষয়টির প্রতি সাধারণ ভাবে আগ্রহের অভাব আছে জেনেও তিনি উৎসাহ দিয়েছেন। শ্রীনিখিল সরকারের উপদেশ রচনাটির প্রেক্ষাপট নির্মাণে বিশেষ ভাবে সহায়ক হয়েছে। পাণ্ডুলিপি পাঠের পর শ্রীরুদ্রাংশু মুখোপাধ্যায়ের অভিমত কিছু মূল্যবান সংযোজনের সুযোগ দিয়েছে। শ্রীবিমল পাল সংশোধন করে দিয়েছেন বানান ও ভাষার অসংগতি। কলকাতার পথে ছড়ানো পুরনো আসবাবের ফোটোগ্রাফের জন্য প্রধানত নির্ভর করেছি শ্রীসুমন দত্ত-র উপর। ছবি কপির কাজে মান্তুদার (প্রিয়রঞ্জন রক্ষিত) তৎপরতা তুলনাহীন। বইটির ডিজাইন নিয়ে শ্রীবিপুল গুহ-র প্রাথমিক পরিকল্পনা সার্থক হয়েছে শিল্পীবন্ধু শ্রীসুব্রত চৌধুরীর কুশলতায়। তাঁকে সহায়তা করেছেন শ্রীবিশ্বনাথ বসু। শ্রীঅমিয় ভট্টাচার্য যথারীতি উৎসাহ ও পরামর্শদানে অকৃপণ। তথ্য-সন্ধানে, বিশেষ ভাবে শ্রীদেবাশিস বসু, শ্রীঅশোক উপাধ্যায়, শ্রীবিনয়ভূষণ রায়, শ্রীদিলীপকুমার মিত্র, শ্রীসমর বাগচী ও শ্রী পি· থনকপ্পন নায়ারের কাছে ঋণী। রামচন্দ্র চ্যাটার্জির বেলুন আরোহণের পূর্ণ বৃত্তান্তটি শ্রীস্বপন বসুর সঙ্গে যৌথভাবে রচিত হয়েছিল দেশ পত্রিকার জন্য। মূলত তারই সংক্ষিপ্ত ও পরিমার্জিত রূপ এখানে প্রাসঙ্গিক অধ্যায়ে পেশ করা হয়েছে। বিড়লা শিল্প ও কারিগরি সংগ্রহালয় এবং নীলমণি মিত্রের বংশধর শ্রীমান সুবীর ও সুব্রত-র সৌজন্যে কিছু দুষ্প্রাপ্য নথিপত্র ও ছবি ইত্যাদি ছাপা সম্ভব হয়েছে।

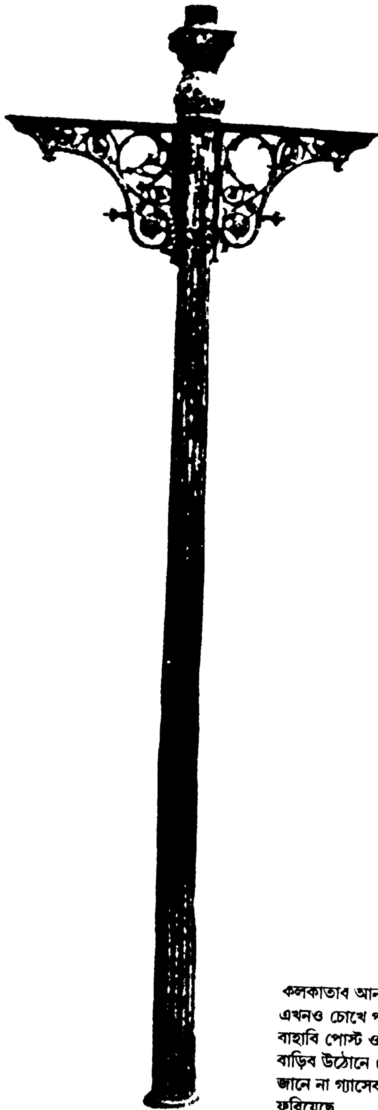


ছবির বাঁ দিকে, চাঁদপাল ঘাটে কলকাতার প্রথম জলতোলা কলের চিমনী



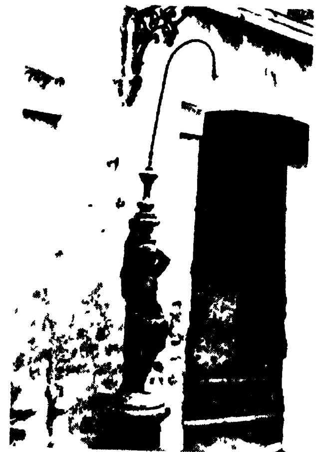


কলকাতার পথে পুরনো দিনের জলের কল

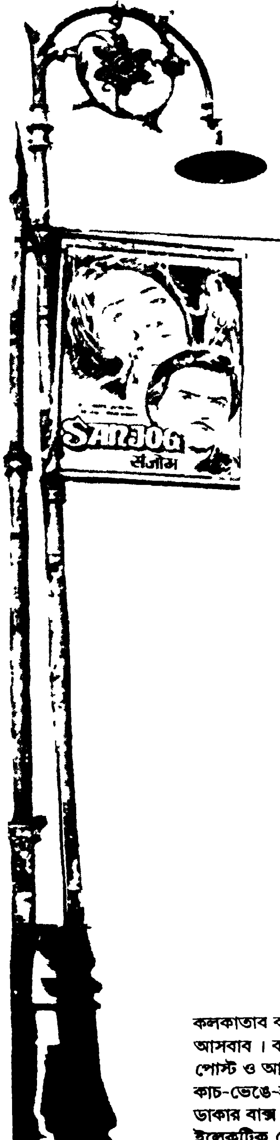






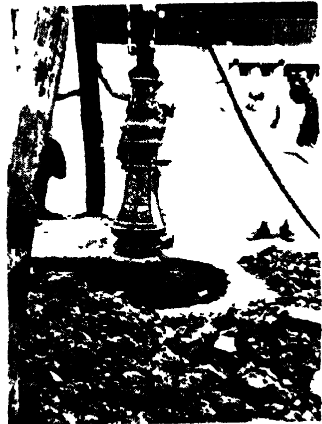


কলকাতার আনাচে কানাচে
এখনও চোখে পড়ে গ্যাসের আলোর
বাহারি পোস্ট ও ব্র্যাকেট। বনেদি
বাড়ির উঠোনে লোহার পরীরা আজও
জানে না গ্যাসের আলোর দিন
ফুরিয়েছে





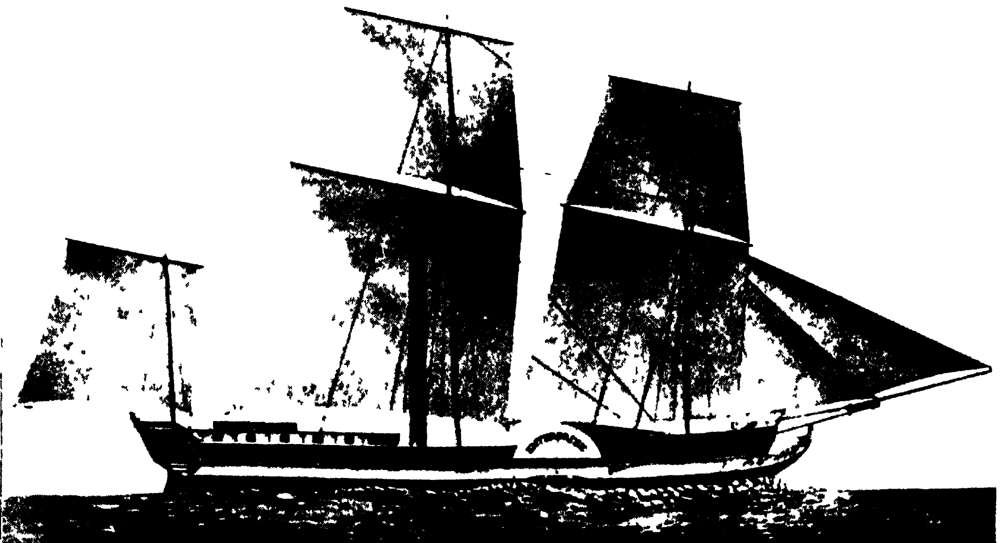


কলকাতাব বাস্তায় পুবনো
আসবাব । বাহাবি ইলেকট্রিক আলোব
পোস্ট ও আগুন লাগলে,
কাচ-ভেঙে-হাতল-ঘুবিয়ে দমকল
ডাকার বাক্স । নীচে ডান দিকে, প্রাচীন
ইলেকট্রিক পোস্ট অপসাবণের দৃশ্য

পুরনো মানচিত্রে শ্রীরামপুরের কাগজের কলের হদিশ। মানচিত্রের মধ্যে সন্নিবিষ্ট কেরী সংগ্রহালয়ের স্টিম ইঞ্জিন ও বয়লারের ফোটোগ্রাফ। ডান দিকে কলকাতার পুরনো মানচিত্রে চাঁদপাল ঘাটের স্টিম ইঞ্জিন ও কেল্লার মধ্যে সেমাফোর টাওয়ার

প্রথম বর্মীয় যুদ্ধে 'ডায়না  কলকাতাব প্রথম পুবোদস্তুব কলেব নৌকা। চিত্রকব  জোসেফ মুব



'এন্টারপ্রাইজ' · প্রথম বাষ্পের জাহাজ যা বিলেত থেকে ভারতে এসেছিল

THE I.C.S.N C... S ENGINE
WORKED THE MACHINE SHOP AT
GARDEN REACH FROM 1846 TO
1880 WHEN IT WAS REMOVED
TO RAJAH BAGAN IT DID DUTY
THERE UP TO 1897 WHEN
WAS REMOVED TO ITS PRESE...
POSITION UPON THE RECONSTRU...
OF THE DOCKYARD

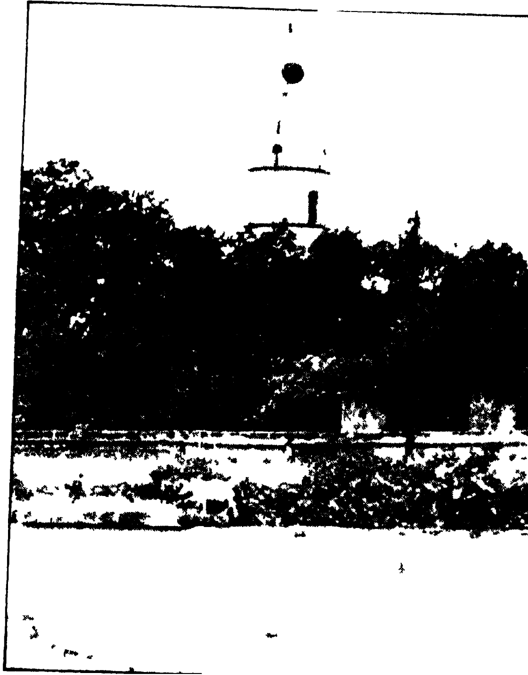
রাজাবাগান ডক ইয়ার্ডে দ্বারকানাথ ঠাকুরের স্টিম ইঞ্জিন
বাঁ দিকে ইঞ্জিনটির পরিচয়বাহী পিতলের ফলক



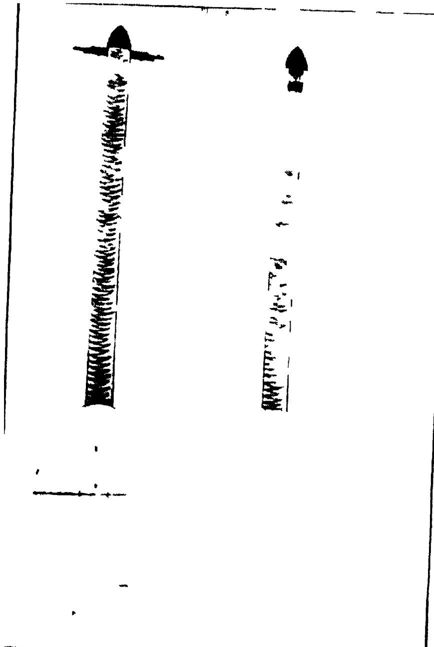
বিলিতি কোম্পানির
সঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ
ঠাকুরের প্রতিযোগিতা।
হ চ হ-র আঁকা
লিথোচিত্র।

জামালপুরে তৈরী প্রথম পুরোপুরি দেশী রেল-ইঞ্জিন 'লেডি কার্জন'

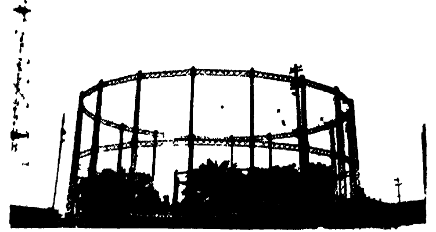
লেডি কার্জন'-এর ইঞ্জিনিয়ারিং নকশা



বাঁ দিকে ফোর্ট উইলিযামেব মধ্যে
বল্ টাওযাব। আধুনিক ফোটোগ্রাফ। সেমাফোব
টেলিগ্রাফেব সংকেত প্রেবণেব জন্য প্রথমে ব্যবহাব
হতো। নীচে, শিবচন্দ্র নন্দী ও তাঁব উদ্ভাবিত
টেলিগ্রাফ খুঁটিব নকশা

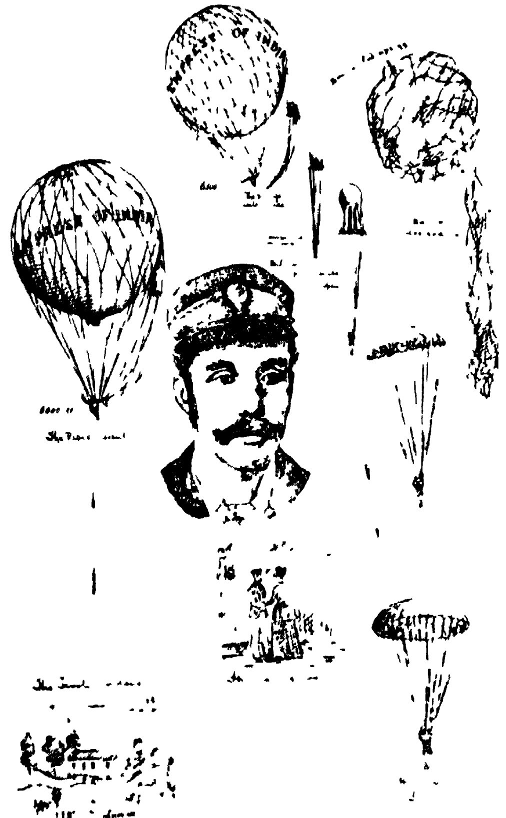






কাবিগবি পুবাতত্ত্বেব নিদর্শন নাবকেলডাঙায গ্যাস কোম্পানিব প্রাণহীন খাঁচা

বেলুন থেকে পার্সিভাল স্পেন্সাবেব প্যাবাশুটে কবে ঝাঁপ সচিত্র কাহিনী (১৮৮৯)

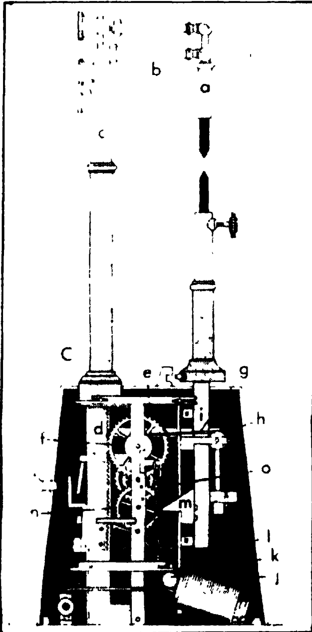


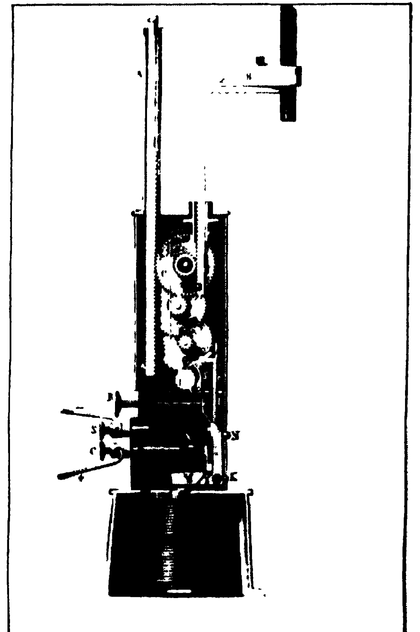


নৃত্যলাল শীলেব পঞ্জিকায় (১৮৯১) বামচন্দ্রেব বেলুনে ওড়ার খবরের সঙ্গে ছাপা উডকাট



কলকাতার চিড়িয়াখানায় ইলেকট্রিক রেলওয়ে : ১৮৮০



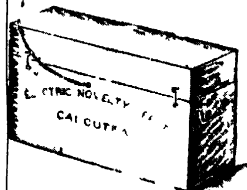
কালিদাস শীলের আমলের
বৈদ্যুতিক আর্ক ল্যাম্প বাঁ দিকে,
'সেরিন' ও ডান দিকে, 'সিমেন্স'

# 1 3 of Your Life is Spent in Bed

*Then why swelter and be miserable*

Electric Table Fans






Electric Light ... ck

Electric Bell Set

Electric Walking Cane

Electric Scarf Pin

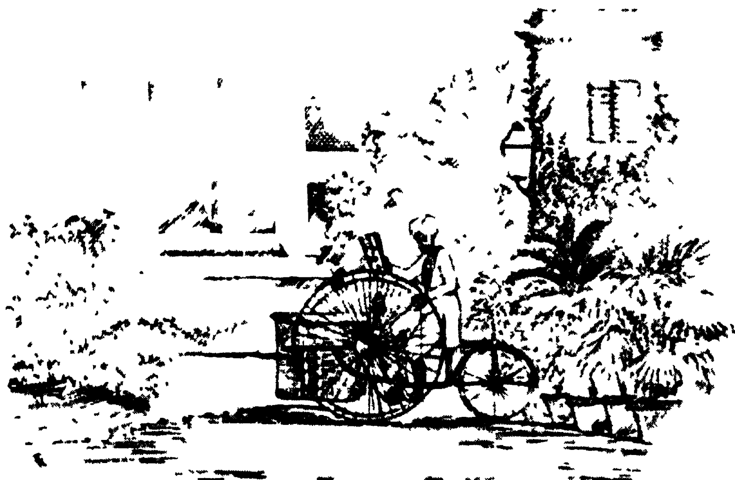
Electric Hanging Lamp,
in neat box with beautiful shade

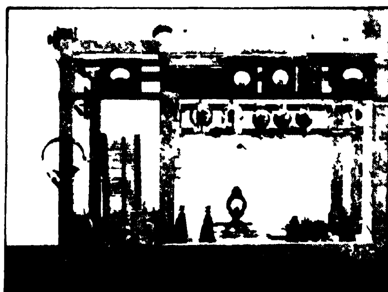
**ELECTRIC NOVELTY DEPOT,**

*DHURRUMTOLLAH STREET, CALCUTTA*

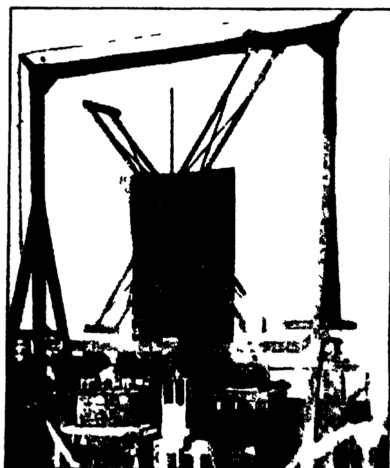
শেয়ালদা স্টেশনে ইঞ্জিন চালিত টানা পাখা ১৮৯৯ নীচে বাঁ দিকে ব্যাটারি চালিত পাখার বিজ্ঞাপন ১ ০৫ ডান দিকে শেয়ালদার প খা পুলি এর কল

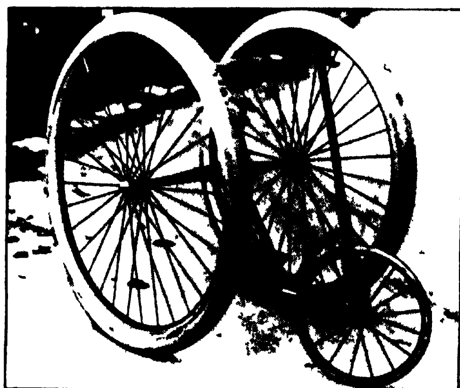




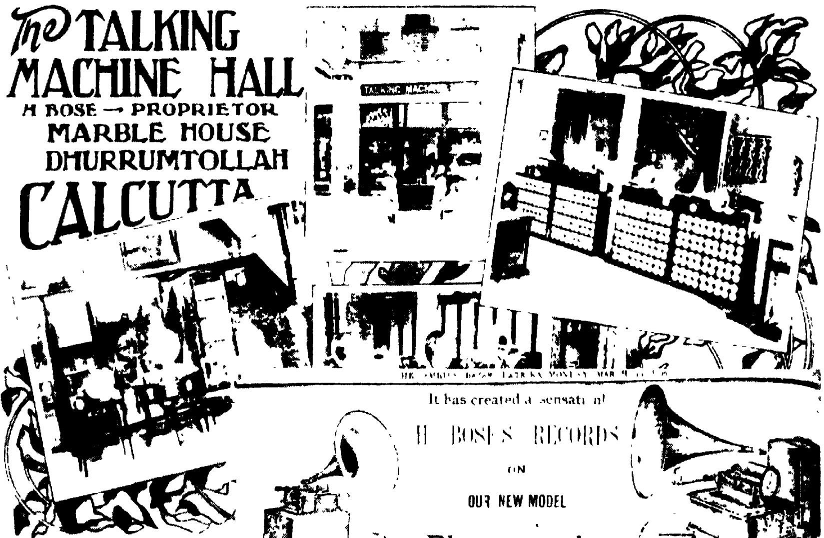


তিন চাকাব সাইকেলে খববেব কাগজেব ফিবিওলা ১৮৮৯ । বাঁ দিকে শিশিবকুমাব মিত্রেব তৈবী বেতাব যন্ত্র ও অ্যাটমস্‌ফেবিক্স যন্ত্র । নীচে আদ্যিকালেব ট্রাইসাইকেল ।





এইচ. বোস-এর কোম্পানির বিজ্ঞাপন : ১৯০৬




It has created a sensation!

H BOSE'S RECORDS

ON

OUR NEW MODEL

Phonographs

Family Phonograph
Rs 70 only

Grand Triple Phonograph
Rs 175 only

If you have not heard these records you don't know what a talking machine can do

H BOSE'S RECORDS will prove to you that it has become possible for a Talking Machine to take the place of a Singer

No hissing, no screeching, no nasal or metallic twang, which are the inseparable companion of the Foreign Records you have so long heard, but it is

THE PURE SONG AND NOTHING BUT THE SONG

For the First time in Calcutta.

BABU RABINDRA NATH TAGORE
DWIJENDRA LAL ROY

The following songs are a few examples of our large and varied stock

Sung by the Well-Known Bande Mataram Sampradya of Calcutta

If you love a good song, Come and Buy an Outfit now
you shall have to give up the old and take to the new.
The sooner you do, the better for your enjoyment

RECORDS:

RS 2 8 each

THE TALKING MACHINE HALL,

Messrs Dwarkin & Sons,

CALCUTTA

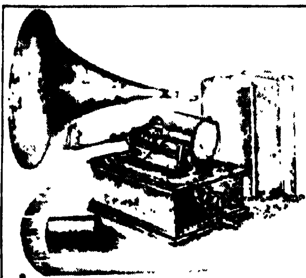
"Delkhosh Calcutta

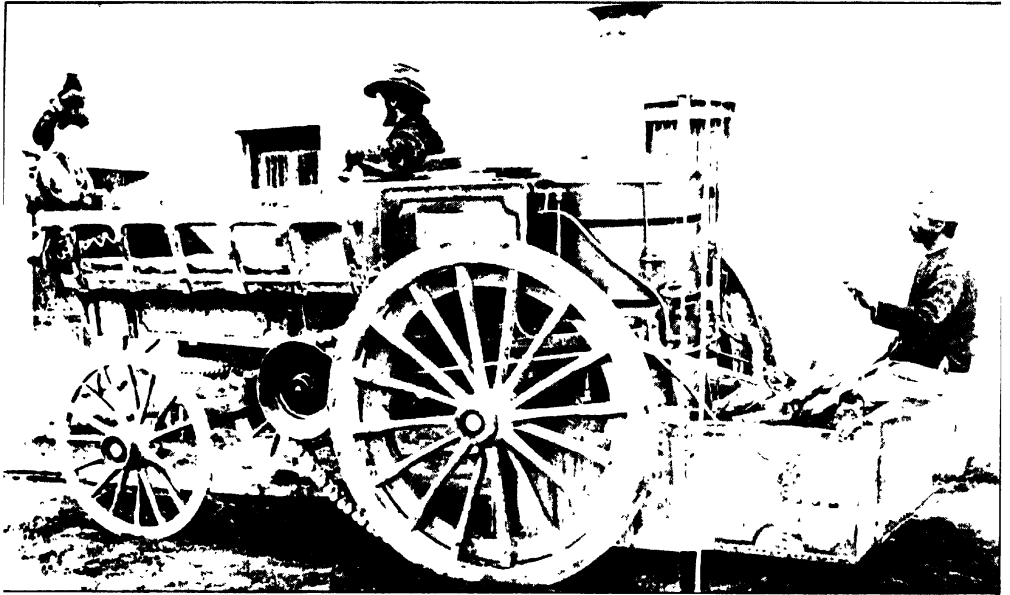
Club Phonograph, Rs 100 only.

Student Phonograph, Rs. 25 & 30 only

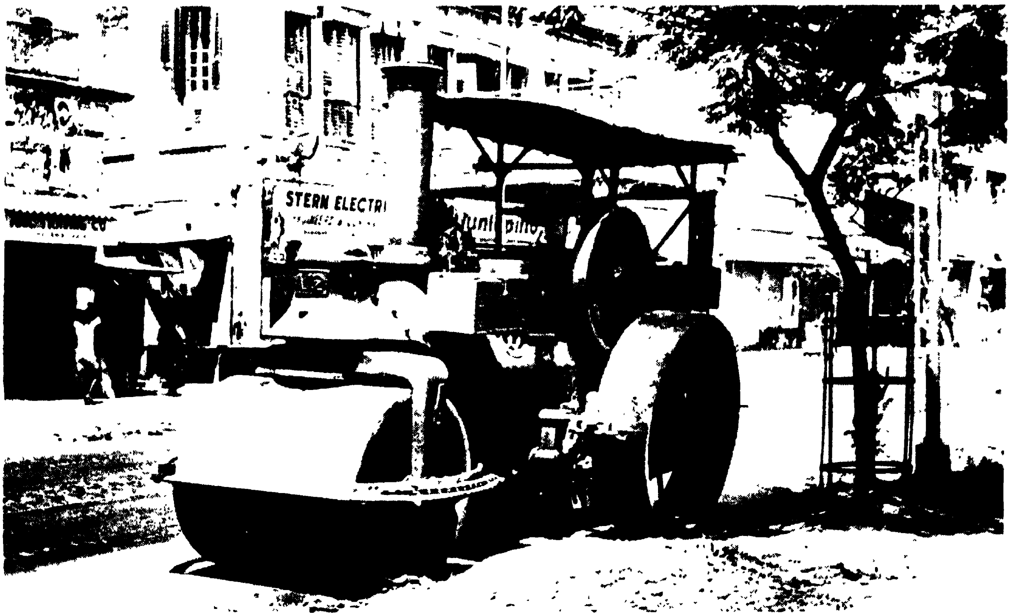



প্যাথে এইচ বোসেজ রেকর্ড, রবীন্দ্রনাথেব বেকর্ডেব প্রথম বিজ্ঞাপন ও এইচ. বোস-এব ফোনোগ্রাফ





আর. ই. ক্রম্পটন ও তাঁব 'ব্লু বেল'





কলকাতার প্রথম মোটর দৌড় । ময়দানে জমায়েত   ১৯০৪

মাঝপথে,মরকতকুঞ্জে দৌড় প্রতিযোগীদের সমাবেশ । প্রদ্যোৎকুমারের 'ইলেকট্রিক ল্যান্ডো'টিও আছে এরই মধ্যে



প্রথম মোটব দৌড   ডক্টব নিল্ড কুক ও ডি ডিও গাডি

প্রথম মোটব দৌড   ই  জ্যাকসন ও হিটলি গাডি



প্রথম মোটব দৌড   টি   আব প্র্যাট ও ওল্ডসমোবিল গাডি

প্রথম মোটর দৌড় : ডি ব্রয়নার ও ওল্ডসমোবিল গাড়ি

প্রথম মোটর দৌড়   আর্চি বার্কমাযাব ও উল্‌সলি গাড়ি

প্রথম মোটর দৌড়   আকাটোস ও জিও বিচার্ড ব্রেজিযাব গাড়ি

ভিক্টোবিযা মেমোবিযালেব সামনে বসা ১৯২০

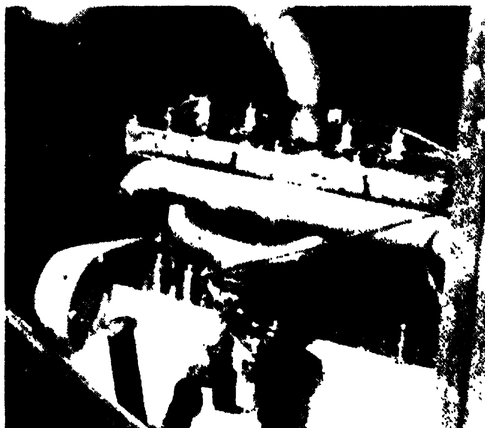


আর. এন. ম্যাথুসন-এর 'সোয়ান'

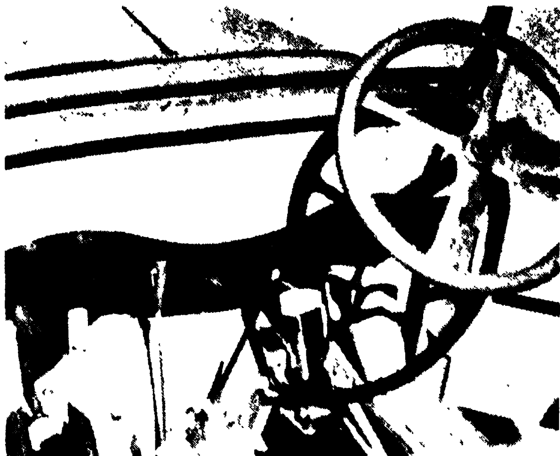
ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট জে. এন. মিত্র ও তাঁর পত্নী। দুই সিলিন্ডার 'সুইফট' (সাইকেল-কার)

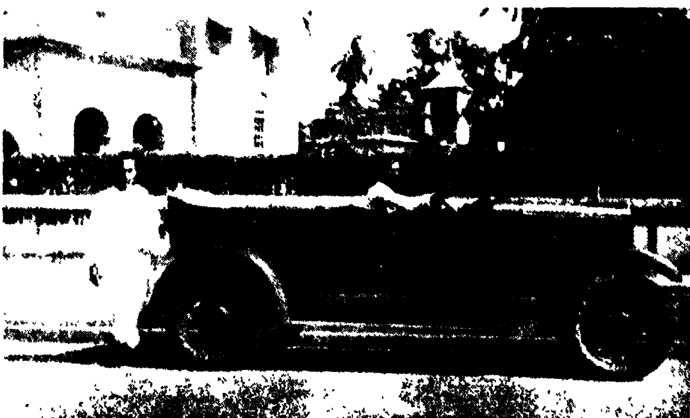
দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র ও তাঁর ফোর্ড











১. বিপিনবিহাবী দাস ও তাঁব 'স্বদেশী' গাড়ি ২. 'স্বদেশী'র ইঞ্জিন ৩. নিজের কাবখানায় বিপিনবিহারী ৪. 'স্বদেশী'ব স্টিয়াবিং ইত্যাদি ৫. বালিগঞ্জ ফাঁড়িব কাছে 'স্বদেশী' ও বিপিনবিহাবী

উপেন্দ্রকিশোর রায় উদ্ভাবিত 'স্ক্রিণ অ্যাডজাস্টমেন্ট ইন্ডিকেটব' সংযুক্ত প্রোসেস ক্যামেবা

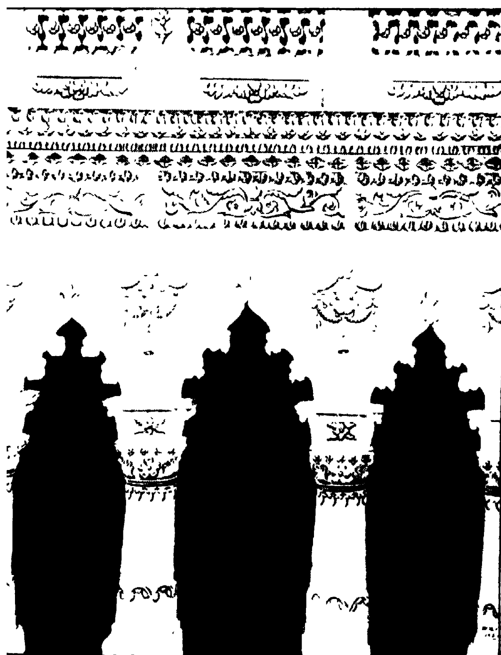
নীচে, জগদীশ্বর ঘটকের জলচর সাইকেল । ডান দিকে, ক্যাপ্টেন বাজকৃষ্ণ কর্মকাব







প্রথম পাশ-করা বাঙালি ইঞ্জিনিয়ার নীলমণি মিত্র ও তাঁর স্থাপত্যকর্মের দুটি নমুনা

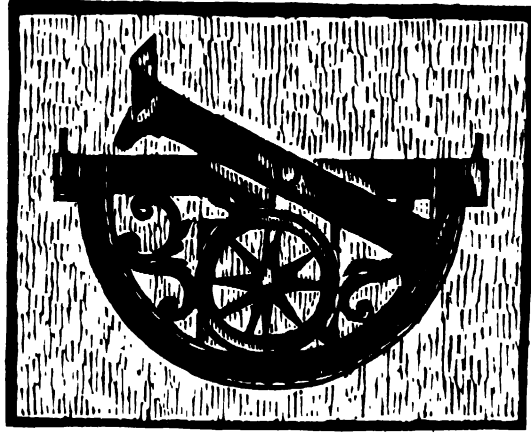






মধুপুবের একটি বাড়ি   নীলমণি মিত্রেব কবিতা

বাগবাজারে পশুপতি বোসের বাড়ির ঠাকুরদালানেব পুবানো ছবি · নীলমণি মিত্রের কীর্তি



# সূচনা

স্থান বা কাল যে দিক দিয়েই বিচার করা হোক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশ কোনো সুসম অব্যাহত ধারায় ঘটেনি। বিশেষ রাজ্যে বা অঞ্চলে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির প্রবল জোয়ারের পরে দীর্ঘ ভাটার উদাহরণ বিরল নয়। শিল্প ও বাণিজ্য-সংক্রান্ত তৎপরতার কেন্দ্র স্থানান্তরিত হওয়ার সঙ্গে বিজ্ঞানকেও তার অনুবর্তী হতে দেখা গিয়েছে। প্রাগিতিহাসে ব্যাবিলন, মিশর ও ভারত ছিল বিজ্ঞানচর্চার ঘাঁটি। এই ঐতিহ্যের সাধারণ উত্তরাধিকারী হিসাবে কিন্তু তার পরে গ্রীসের উত্থান। কিন্তু রোমান সাম্রাজ্য বা পশ্চিম ইওরোপের রাজ্যগুলি পরবর্তীকালে গ্রীক সংস্কৃতির বাহক হয়নি। সিরিয়া, পারস্য ও ভারতে আবার বিজ্ঞানের তাজা হাওয়া বইতে দেখা গিয়েছে **ইসলামের** ধ্বজার নিচে, গ্রীক ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী হিসাবে।

সাধারণত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে আমরা এক নিঃশ্বাসে উচ্চারণ করি, কিন্তু উভয়ের মধ্যে সম্পর্কের প্রকৃতি কোনো সরল পারস্পরিক নির্ভরশীলতার সূত্রে আবদ্ধ নয়। ভারতে যখন গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা প্রথম শ্রেণীর গবেষণায় লিপ্ত, চীনে কিন্তু প্রযুক্তিবিদরা ব্যবহারিক কর্মের বহু ক্ষেত্রেই বিজ্ঞান-নিরপেক্ষ ভাবেই উদ্ভাবনীশক্তির অসাধারণ পরিচয় পেশ করছেন। এই প্রসঙ্গে আরও একটি ভ্রান্ত ধারণার উল্লেখ প্রয়োজন। কোনো সভ্যতার বা সংস্কৃতির উন্নতির মাত্রা নির্ধারণে বিভিন্ন উদ্ভাবন-চিহ্নিত প্রযুক্তি নামক মানদণ্ডের ব্যবহারের কোনো সার্থকতা নেই। যে-সভ্যতা প্রথম চাঁদে রকেট পাঠিয়েছে, তারই সাংস্কৃতিক মান সর্বোচ্চ—এই বিচারধারা যুক্তিসিদ্ধ নয়। এই ধরনের উদাহরণ প্রাচীনকাল থেকেও সংগ্রহ করা যায়। চাকা ও চাকাযুক্ত গাড়ি ব্যবহারের ক্ষেত্রে ভারত বহু দেশের থেকেই পিছিয়ে। কিন্তু সেটিকে ভারতের প্রযুক্তিবিদ্যার তথা সভ্যতার অনগ্রসরতা রূপে বিবেচনা করার কোনো সুযোগ নেই। মহেঞ্জোদড়োয় চাকাওলা গাড়ির একাধিক খেলনা আবিষ্কৃত হয়েছে। কিন্তু খেলনাই, সেরকম গাড়ি ব্যবহারিক কাজের জন্য সম্ভবত তৈরি হয়নি। তার মানে, সৃজনশীল চিন্তার দিক থেকে এই ধরনের পরিবহণ-ব্যবস্থা নাগালের মধ্যে থাকলেও, সেটি প্রবর্তনের প্রয়োজন হয়নি।

কালক্রমে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মধ্যকার সম্পর্কটির প্রকৃতিও বদলেছে। দু' হাজার বছরেরও বেশি কাল জুড়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মধ্যে সম্পর্কটি ছিল বিচ্ছিন্ন যোগাযোগের। জ্যোতির্বিজ্ঞান ও গণিতবিজ্ঞানের সীমিত প্রভাব ছাড়া ষোড়শ শতাব্দী অবধি প্রযুক্তিবিদরা বিজ্ঞান-নিরপেক্ষ ভাবেই নিজেদের ক্ষেত্রে তৎপর ছিলেন।

বিজ্ঞান যেখানে একটি মূলত শিক্ষিত স্বাক্ষর মানুষের পেশা, প্রযুক্তি দেখা যাচ্ছে, অতীত অভিজ্ঞতার ঐতিহ্যবাহী। এই অভিজ্ঞতা, সামষ্টিক অভিজ্ঞতা, অতি-প্রতিভাধর ব্যক্তিবিশেষের উদ্ভাবনপটুত্বের উত্তরাধিকার নয়। পুরুষানুক্রমে প্রযুক্তিগত ঐতিহ্য পরিবাহিত হওয়ার জন্য পাঠ্যপুস্তক বা বিদ্যালয়ের পাঠক্রমেরও প্রয়োজন হয়নি।

মননশীল পণ্ডিতকুলের দার্শনিকচর্চার একটি বিশেষ ক্ষেত্রের বাইরে বিজ্ঞান যখন প্রথম মুক্তি পেল, তা সাধারণ ভাবে প্রযুক্তিবিদদের বিভিন্ন সাফল্য বা কুশলতার ব্যাখ্যা বা তাদের সমস্যার সমাধান সন্ধানেই নতুন দিশা লাভ করল। প্রযুক্তি-অনুবর্তী বিজ্ঞানচর্চার উদাহরণের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য তাপগতি বিদ্যা। স্টিম ইঞ্জিন বা বাষ্পীয়শক্তি চালিত ইঞ্জিন উদ্ভাবন ও প্রবর্তনের প্রায় সত্তর বছর পরে প্রথম তার তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা সন্ধানের চেষ্টা শুরু হয় এবং তাপগতি বিদ্যা বা থার্মোডায়নামিক্স আরও পঞ্চাশ বছর পরে তার রহস্যভেদ করে।

বিংশ শতাব্দীতে প্রবেশ করার পরেই প্রযুক্তিগত উন্নতি বা উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে একাধিক চালকের মধ্যে বিজ্ঞানও তার আসনটি দখল করেছে। ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদি বৃত্তির নামকরণের মধ্যেই রয়েছে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার প্রায়োগিক ক্ষেত্র হিসাবে আত্মপ্রকাশের ইঙ্গিত।

মধ্যযুগে যেসব উদ্ভাবন, প্রকৌশল বা প্রক্রিয়ার ব্যবহার বা উন্নতির সুবাদে ইওরোপ বিশ্বের উপর তার খবরদারিকে সুদৃঢ় করেছিল তার মধ্যে অ্যালকহল ও ঘড়ি ছাড়া প্রায় সবই বিকশিত হয়েছিল প্রাচ্যে এবং প্রধানত চীনে—ঘোড়ার লাগাম, কম্পাস, নৌকার পিছনে সংলগ্ন হাল, বারুদ, কাগজ ও মুদ্রণ। পুব থেকে পশ্চিমে প্রযুক্তিবিদ্যার সম্প্রসারণ, প্রতিটি ক্ষেত্রে নথিসাক্ষ্য সহযোগে প্রমাণ করা কঠিন হলেও, অস্বীকার করার উপায় নেই যে, দশম শতাব্দী বা তারও পরে পশ্চিম ইওরোপে এমন বহু উদ্ভাবনের প্রথম উল্লেখ মেলে যার অস্তিত্ব ছিল প্রথম শতকের চীনেই। জোসেফ নীডহ্যামের 'সায়েন্স অ্যান্ড সিভিলাইজেশন ইন চায়না' নামে বহু খণ্ড-বিশিষ্ট গবেষণাগ্রন্থ প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানের ইতিহাসে এ-বিষয়ে আর দ্বিতীয় প্রশ্নের অবকাশ রাখেনি।

ভারত সমেত ইসলামের দুনিয়ায় প্রারম্ভিক প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও প্রাচ্য সভ্যতা পঞ্চদশ শতাব্দীর পরে প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে কেন অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করতে পারল না তার আর্থ-রাজনৈতিক বিশাল গবেষণাক্ষেত্র এই প্রবন্ধের আওতার বাইরে। আহসান কাইজার ও ইরফান হাবিবের গবেষণা থেকে আমরা জানতে পেরেছি মুঘল আমলে ইওরোপীয় প্রযুক্তির সংস্পর্শে আসার পর কিন্তু ভারতীয় কারিগররা নির্বাচিত ক্ষেত্রে প্রয়োজনমতো সাড়া দিতে কুণ্ঠিত হননি। অভাব ঘটেনি দক্ষতার। সামাজিক রীতিনীতির প্রতিবন্ধকতা ইত্যাদি ইওরোপীয় ঐতিহাসিকের অজুহাত খণ্ডন করেছেন কাইজার ও হাবিব।[১]

কিন্তু এই একই ঘটনার কিভাবে পুনরাবৃত্তি ঘটেছিল ব্রিটেনের ভারত জয় করার পরে, সে-কাহিনী আজও বিবৃত হয়নি। ইংলণ্ডের ভারত দখলের পর্বে পশ্চিমী প্রযুক্তিবিদ্যার দুটি ভূমিকা নিয়ে শুধু আলোচনা হয়েছে। প্রথমত, সাম্রাজ্যবাদী হাতিয়ার হিসাবে রেলপথ, টেলিগ্রাফ ইত্যাদির ভূমিকা এবং দ্বিতীয়ত, ভারতের প্রথাগত শিল্প ও প্রযুক্তির বিনাশে (ডি-ইনডাস্ট্রিয়ালাইজেশন) ইংলণ্ডের শিল্পবিপ্লবের ফসলগুলির সুনির্বাচিত প্রয়োগ।

আপসোসের কথা, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকপ্রতিবন্ধকতা সম্বন্ধে ভারতীয় সামাজিক ঐতিহাসিকরা এতই সচেতন যে, তাঁরা কখনও অনুসন্ধানের প্রয়াস অবধি নেননি যে, ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতে, কারিগরি মহলে কোনো সাড়া পড়েছিল কিনা। নতুন প্রযুক্তির আগমন কিভাবে নাড়া দিয়েছিল তাঁদের। ঐতিহাসিকরা বিনা অনুসন্ধানেই রক্ষণাত্মক ভঙ্গি গ্রহণ করেছেন। শিল্প ও বাণিজ্যে ভারতীয়দের অনগ্রসরতাকে তাঁরা ভারতীয় কারিগর ও প্রযুক্তিবিদদের অসাফল্যের সঙ্গে সমার্থক বিবেচনা করে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দোহাই পেশ করতে বাধ্য হয়েছেন। উদ্দেশ্য সদর্থক হলেও তার প্রয়োজন ছিল না।

প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত জয় করার অর্থনৈতিক প্রেরণার অভাব থাকলেও, সমাজের সর্বাঙ্গীণ অগ্রগতি ব্যাহত হলেও, ভারতীয় সমাজে কারিগর শ্রেণীর মধ্যে বংশপরম্পরায় সঞ্চিত দক্ষতা হ্রাস পায়নি। বিদেশী ঐতিহাসিকরা ভারতীয় সমাজের জাত-বিভাজনের উপর অনগ্রসরতার যতটা দায় আরোপ করতে পেরেছেন ততটাই সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংসাত্মক ভাবমূর্তিকে আবছা ধোঁয়াটে প্রতিপন্ন করার সুযোগ জুটিয়ে নিয়েছেন।

কর্মকার, সূত্রধর ইত্যাদি পেশা ও বৃত্তিনির্ভর গোষ্ঠীবিশেষের অস্তিত্ব বিভিন্ন দেশেই লক্ষ্য করা যায়। সন্দেহাতীত ভাবে ভারতের হস্তশিল্পীরা ইতিহাসের এক অধ্যায়ে নিম্নবর্গ চিহ্নিত হয়েছিলেন। বৃত্তিনির্ভর শ্রেণীবিভাজনের সাক্ষ্য বহন করে চলেছে আজও নানা পদবী। এই বিভাজনের ফলে একদিকে নিশ্চয় শিক্ষিত উচ্চবর্ণের (বিজ্ঞানী অন্তর্ভুক্ত) সঙ্গে কারিগরদের ভাবনার আদান-প্রদান রুদ্ধ হয়েছিল। তাছাড়া, কারিগরি জ্ঞানকে নিজস্ব গোষ্ঠীর মধ্যে প্রায় দুর্ভেদ্য রহস্য হিসাবে প্রহরাধীন রাখার জন্য অনেক প্রকৌশল যুগান্তরে লুপ্তও হয়েছে। তবুও অনস্বীকার্য যে, বংশানুক্রমিক ভাবে সঞ্চারিত দক্ষতার মৃত্যু ঘটেনি। তারই প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল মুঘলদের আগমনের পরে যখন আবার পরিবর্তনের হাওয়া লেগেছিল।

কিন্তু, কোনো পরিণতি লাভের আগেই বাণিজ্যিক ও সামরিক শক্তিতে উন্নত ইওরোপীয় ধনতন্ত্রের আগমন হল ভারতে। ভারত লুণ্ঠনের বহুমুখী হাতিয়ার হিসাবে প্রযুক্ত হলেও, এই যন্ত্রসভ্যতার সংস্পর্শে আসার পর, ভারতের ঐতিহ্যময় কারিগর মহল কিভাবে সাড়া দিয়েছিলেন, কতখানি আয়ত্ত করতে পেরেছিলেন তথাকথিত 'এলিয়েন' প্রযুক্তি, অনুকরণ থেকে উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে কী তাঁদের অবদান, সেই বিবরণ সংগ্রহের আশাতেই শহর কলকাতাকে ঘিরে এই প্রবন্ধের অবতারণা। কলকাতার শিল্পায়ণের ইতিহাস প্রসঙ্গক্রমেই এখানে এসেছে। ব্রিটিশ ভারতের রাজধানীরূপে শিল্পবিপ্লবের বহু ফসল আমদানি হয়েছিল কলকাতায়। পর্যবেক্ষণের কলকাতা-কেন্দ্রিকতার তাই একটা স্বতন্ত্র গুরুত্ব আছে।

ইংলণ্ডের যন্ত্রশিল্পের কি কি দিকে অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় পর্যটকদের চোখ পড়েছিল, জানতে পারলে, সেটা মূল কাহিনীতে প্রবেশ করার পথ তৈরি করতে সাহায্য করবে। দু'জন প্রখ্যাত পর্যটকের বিবরণ থেকে প্রাথমিক ভাবে আমরা কিছু অভিনব কল ও কৌশল শনাক্ত করার চেষ্টা করব যা তখন আমাদের দেশে প্রবর্তিত না হলেও তাদের প্রভাব অনুভূত হতে শুরু করেছে ও অচিরেই তাদের অনিবার্য আগমন বিপুল পরিবর্তন ঘটাবে।

'শিফার্গ-নামা এ বিলায়েৎ' বা বিলেতের আশ্চর্য দৃশ্যাবলীর বিবরণদাতা মির্জা শেখ ইতিসামুদ্দীন ১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দে ইংলণ্ড ও স্কটল্যাণ্ড সফল করেন।[২] তিনি নিজেই জানিয়েছেন যে, তাঁর পূর্বে চট্টগ্রাম ও জাহাঙ্গীরনগরের (ঢাকার) খালাসী ছাড়া এইরকম পোশাক পরা কোনো মুনশি বিলেতে যায়নি। ইতিসামুদ্দীনের জন্ম নদীয়া জেলায়। কর্মোপলক্ষে বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়ালেও, তিন দফায়, দীর্ঘকাল তিনি কলকাতায় অতিবাহিত করেন। যাতায়াতের সময় বাদ দিয়ে প্রায় এক বছর ছিলেন বিলেতে। ১৭৬৭-তে কলকাতায় ফিরে আসেন এবং তাঁর ভ্রমণের বিবরণটি ১৭৭৯-তে রচনা করেন।

সমুদ্রপথের বর্ণনা শুরু করার আগেই তিনি অত্যন্ত বিশদে 'টুপিধারী ফিরিঙ্গিদের' নৌ-পরিচালনা-বিদ্যা সম্বন্ধে নানা তথ্য পেশ করেছেন। বিশেষ করে সেইসব সহায়ক যন্ত্রের বর্ণনা দিয়েছেন তিনি, যার সম্যক প্রচলন তখনও ভারতীয়দের মধ্যে ঘটেনি। দিকদর্শন যন্ত্র বা কম্পাস (ভারতীয় নাবিকদের ভাষায় হুক্কা), বায়ুর এবং জাহাজের গতি মাপার যন্ত্রের সাহায্যে সমুদ্রপথের বিবরণ ও নকশা তৈরি, প্রতিটি সমুদ্রযাত্রার রোজনামচা লিপিবদ্ধ করা ইত্যাদি ফিরিঙ্গি রেওয়াজের গুরুত্বের উল্লেখ করেছেন তিনি। জাহাজের নির্মাণ-কৌশল, পাল টাঙানোর পদ্ধতি, চাকা ঘুরিয়ে হাল নিয়ন্ত্রণের ও বিভিন্ন ধরনের সামুদ্রিক বাতাসের বর্ণনা সমেত নৌপরিচালন বিদ্যার তৎকালীন করণকৌশলের প্রায় সব দিকেই তাঁর দৃষ্টি। স্পষ্টতই ভারতীয় নাবিকদের শিক্ষাগ্রহণের ক্ষেত্রগুলিকেই তিনি চিহ্নিত করতে চাইছেন।

লণ্ডন বা এডিনবরার প্রাসাদ, সেতু বা গির্জার আকার আভিজাত্য বা অভিনবত্ব যা-ই থাক, শুধু বাইরের রূপেই মজে যাননি ইতিসামুদ্দীন। গঠনকৌশল ও নির্মাণ-সামগ্রীর বৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষণ করে ভারতীয় রেওয়াজের সঙ্গে সর্বদা তুলনামূলক পর্যালোচনা করেছেন। ভূগর্ভস্থ পাইপ দিয়ে লণ্ডনে ঘরে-ঘরে জলসরবরাহ ব্যবস্থার প্রবর্তনপর্বেই তিনি তার বিবরণ পেশ করেন।

বিলেতের অভিনব যন্ত্রকৌশলের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুটি উদ্ভাবন ও তার প্রয়োগকে শনাক্ত করার মধ্যেই রয়েছে ইতিসামুদ্দীনের আবেগ-বর্জিত মনের স্বচ্ছ দৃষ্টির সেবা পরিচয়। পানিচাক্কি ও হাওয়াচাক্কির (ওয়াটার মিল ও উইন্ড মিল) সহায়তায় কিভাবে পেষাই, মাড়াই, সরষের তেল নিষ্কাষণ, কাঠ-চেরাইয়ের করাত-চালনা বা বারুদ তৈরির কাজে শ্রমলাঘব করা হচ্ছে, তার তিনি উল্লেখ কবেন। এমনকি, ১৭৭৯-তে গ্রন্থটি রচনার সময়ে এ-কথাও যোগ করতে ভোলেননি যে, "আজকাল কলকাতাতেও এরকম যন্ত্র [উইন্ড মিল] চালু হয়েছে শুনেছি।" রেশমের সুতো তৈরির কারখানারও উল্লেখ আছে, "একজন চরকা ঘোরায় আর লাইনবন্দী প্রায় বিশটি চরকা তারই আবর্তনে ঘুরতে থাকে এবং বেশ লম্বা-লম্বা সুতা তৈরি হয়।"

ইতিসামুদ্দীনের বিলেত যাত্রার মাত্র বছরখানেক আগে হারগ্রিভ্‌সের 'স্পিনিং জেনি' উদ্ভাবিত হয়েছে, আর্করাইটের 'ওয়াটার ফ্রেম' ও ক্রম্পটনের 'মিউল' তৈরি হতে তখনও যথাক্রমে পাঁচ ও চোদ্দ বছর বাকি। সবচেয়ে বড় কথা, সেই ১৭৬৫-তে জেমস্ ওয়াট গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ে ইন্স্ট্রুমেন্ট নির্মাতা হিসাবে সদ্য নিউকোমেনের বাষ্পীয় ইঞ্জিনের উন্নতিসাধন বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা শুরু করেছেন। শিল্প বিপ্লবের চাকা ঘোরাবার মতো স্টিম ইঞ্জিন তখনও তৈরিই হয়নি। কিন্তু মানুষের পেশীশক্তিকে হটিযে শিল্পোদ্যোগে প্রাকৃতিক শক্তি নিয়োজনেরই পরবর্তী অধ্যায়-স্বরূপ, বায়ু ও জলের ভৌগোলিক নির্ভরশীলতা কাটিয়ে বাষ্পীয় ইঞ্জিনের আবির্ভাব। কাজেই ইতিসামুদ্দীনের পর্যবেক্ষণের মধ্যেই রয়েছে পরবর্তী অধ্যায়ের অপরিহার্য ইঙ্গিত। কোনো খনি অঞ্চল তিনি পরিদর্শন করেননি তাই বাষ্পীয় ইঞ্জিনেব ইল্লেখ নেই তাঁর বিবরণে। সে-যুগে একমাত্র গভীর খনিগর্ভ থেকে জল নিষ্কাশনের জন্যই বাষ্পীয় ইঞ্জিন ব্যবহার হতো।

ভারতীয় ও ইওরোপীয়দের মনন ও কর্মের মধ্যে ফারাকের কারণ তিনি যে-ভাষায় পেশ করেছেন তা লেখকের মুক্তমনের পরিচায়ক। ধর্ম ও সামাজিক রীতিনীতির বিষয়ে রক্ষণশীল হয়েও ভিন্ন সংস্কৃতি থেকে প্রয়োজনমতো আহরণে তিনি বিমুখ নন, "বিজ্ঞানের নতুন আবিষ্কার, চিকিৎসাশাস্ত্রে নতুন পরীক্ষা ও গবেষণা, নতুন শিল্প ও যন্ত্র উদ্ভাবন এবং ইতিহাস ও দর্শনশাস্ত্রের গ্রন্থ প্রণয়ন, কারখানার পরিকল্পনা ও কার্যপদ্ধতি রচনা এবং পুস্তক রচনায় এরা রত থাকে, যাতে আপামর জনসাধারণ উপকৃত হয় এবং সমগ্র মানব জাতির কাজে লাগে। এদের তুলনায় আমাদের (হিন্দুস্থানের) **ভাল** [গুরুত্ব-রেখা আরোপিত] মানুষদের দেখুন, যাঁরা প্রেয়সীর মুখের ছাঁচ ও নাসার তিল, শরাব সাকী ও কুটনীদের বর্ণনায় হিন্দী ও ফারসী কাব্য রচনা করতে মশগুল থাকেন, প্রণয় ও বিরহের দীর্ঘশ্বাস ফেলেন, এবং কৃত্রিম আবেগে রাতকে দিন ও দিনকে রাত করেন। এঁরা যে ফার্সী গদ্য লেখেন তাতেও অনুপ্রাসবহুল বাক্য, কথা ও শব্দের চাতুরি, অসংখ্য উপমা ও ইডিয়ম, অনভ্যস্ত বাচনভঙ্গি ও অভিধানের দুরূহতম শব্দ ও অতি সূক্ষ্ম ভাব ও প্রকাশভঙ্গি ব্যবহার করে পাঠকের মনকে অযথা ক্লিষ্ট ও ভারাক্রান্ত করে তোলেন।"

'ভাল' শব্দটাকে চিহ্নিত করার কারণ, লেখক শুধু মননশীল, স্বাক্ষর ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দিকেই আঙুল তুলেছেন। বৃত্তিজীবীদের, ভারতের কারিগরদের দক্ষতা নিয়ে কোনো সংশয় প্রকাশ করেননি।

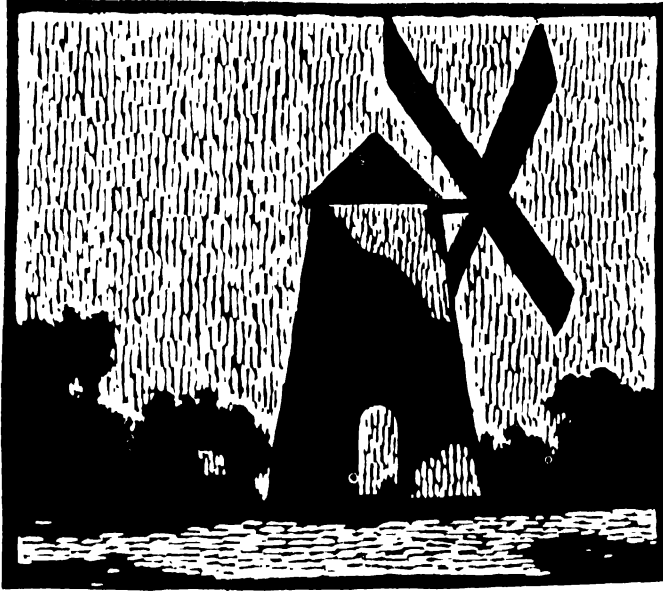
ইতিসামুদ্দীনের চৌত্রিশ বছর পরে বিলেতে এলেন মির্জা আবু তালেব খান। দুই শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে শিল্পবিপ্লবের তুমুল আলোড়নের পর্বে। ইতিসামুদ্দীনের অসমাপ্ত কাহিনী যেন পরিণতি পেল আবু তালেবের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে।[৩] যা ছিল ইঙ্গিতবাহী বীজ-মাত্র, এবারে তা মহাবিক্রমে আত্মপ্রকাশ করেছে। যন্ত্র, বিশেষ করে বাষ্পচালিত যন্ত্রের প্রয়োগ কিভাবে মানুষের শ্রমশক্তিকে বহুগুণ বাড়িয়ে তুলেছে তার অসংখ্য উদাহরণ দিয়েছেন আবু তালেব। পানিচাক্কি ও হাওয়াচাক্কি দিয়ে শস্য পেষাইয়ের কাজ তখনও হচ্ছে কিন্তু

লোহা ঢালাইয়ের কারখানায় আসুরিক ক্ষমতাসম্পন্ন স্টিম ইঞ্জিনদেরই নায়কের ভূমিকা। মানুষের বাহুবলের ওপর ভরসা করে যা কখনই সম্ভব হতো না, এমন অনেক উদাহরণের মধ্যে কামান ঢালাই বা 'ফোর্জ হ্যামার' দিয়ে পিটিয়ে নোঙর তৈরির উল্লেখ করেছেন ভ্রমণকারী। স্পিনিং ইঞ্জিন, দড়ি ও তার তৈরির কারখানা, সুচ নির্মাণ, পোর্টার ব্রিউয়ারির জলতোলা কলের সঙ্গে যুক্ত পঞ্চাশ ঘোড়ার শক্তিবিশিষ্ট স্টিম ইঞ্জিন, বা আরও বিশাল আকারের, লণ্ডনের বাষ্পচালিত জলসরবরাহ ব্যবস্থা ইত্যাদির বিবরণ দিয়ে তিনি মন্তব্য করেছেন, যেখানেই ক্ষমতার প্রয়োজন কিংবা বহু-উৎপাদনের, সেখানেই নিযুক্ত হচ্ছে স্টিম ইঞ্জিন।

যন্ত্রচালিত কাপড়ের কলের উৎপাদনের মান ভারতীয় দ্রব্যের সঙ্গে তুলনায় নিকৃষ্ট হলেও উৎপাদনের পরিমাণ ও সেইসঙ্গে তার সুলভ মূল্যটাও যে বিচার্য, সে-কথাও বলতে ভুল হয়নি।

লক্ষ্ণৌয়ে জন্ম হলেও কলকাতায় দীর্ঘদিন বাস করেছিলেন তিনি। লণ্ডনের মুদ্রণশিল্পের বিকাশ, বিশেষ করে সস্তা সংবাদপত্র মানুষের হাতে-হাতে পৌঁছে দেওয়ার পিছনে এই শিল্পের ভূমিকার বিশেষ প্রশংসা করলেও মুদ্রাযন্ত্রের কার্যপ্রণালী ব্যাখ্যা করেননি। কারণ, কলকাতার মানুষের কাছে বিষয়টি অজানা ক্ষেত্র নয়। তিনি বিবরণ দিয়েছিলেন প্রতিচ্ছবি মুদ্রণ প্রক্রিয়ার, এনগ্রেভিঙের। যা তখনও সুপ্রচলিত নয় কলকাতায়।

লণ্ডনের আর-একটি কারিগরি কাণ্ড তাঁকে সচকিত করে। টেমস নদীর তলা দিয়ে সুড়ঙ্গ নির্মাণের কাজ। কাজ তখনও শেষ হয়নি কিন্তু তখনই তার উপযোগিতা অনুধাবন করেছিলেন তিনি।



# কার কল হাওয়ায় নড়ে ?

সতেরো শ' উনআশি বা আশি সালে কলকাতাবাসীকে এই প্রশ্ন করা হলে সঙ্গে-সঙ্গে উত্তর পাওয়া যেত, কর্নেল ওয়াটসনের কল। জায়গাটাও বাতলে দিতে কোনো অসুবিধে হতো না। খিদিরপুরের একটু দক্ষিণে নদীর ধারে। জাহাজ তৈরি বা মেরামতির জন্য কীড্ সাহেব তখনও ঘাঁটি গেড়ে বসেননি। কলের ধোঁয়া আর ইঞ্জিনের গর্জনে তিতিবিরক্ত হয়ে বাঁদরের দলও খিদিরপুর ত্যাগ করেনি। **কর্নেলের** নাম এখনও বেঁচে আছে 'ওয়াটগঞ্জ' অঞ্চলে। সম্প্রতি অবশ্য 'ওয়াটগঞ্জ স্ট্রিট'কে অপসারিত করেছে কবিতীর্থ সরণি।

কলকাতায় আধুনিক রীতিতে জাহাজ তৈরিব কারখানা প্রথম স্থাপন করেন কর্নেল ওয়াটসন। ইংলণ্ডের শিল্পবিপ্লবের রেশ ধরে কলকাতায় বড় আকারের কারিগরি উদ্যোগের এই সূত্রপাত।

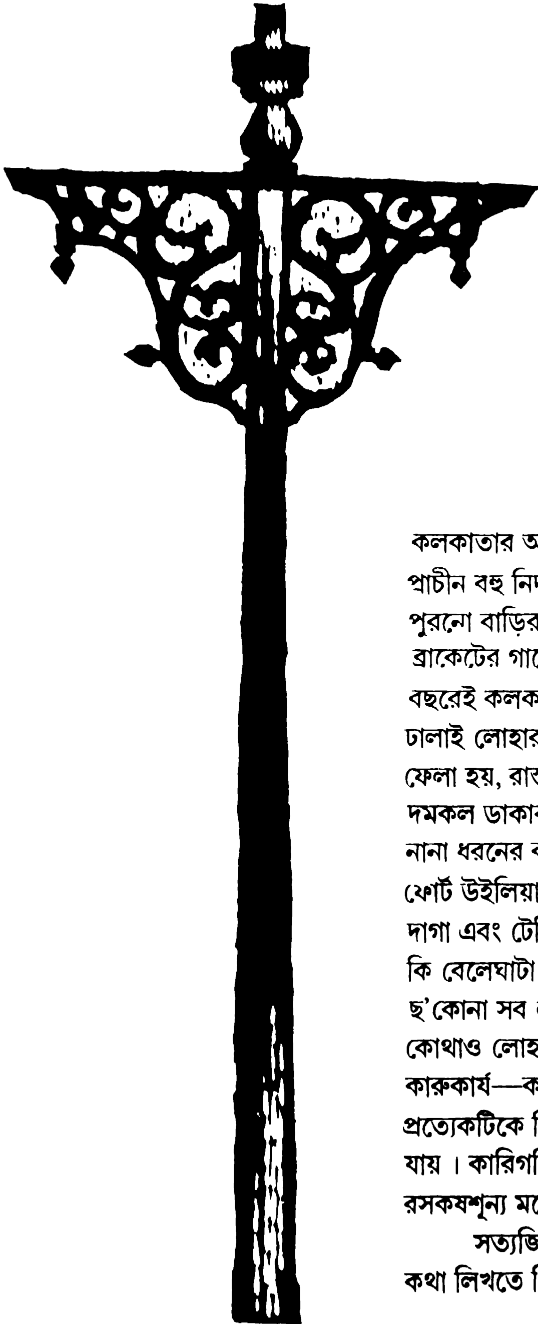
উইলিয়াম হিকির স্মৃতিকথা[১] থেকে জানা যায়, ওয়াটসন তাঁর জাহাজঘাঁটিতে দুটি বিশাল চেহারার উইন্ড মিল (যোগেশচন্দ্র রায়ের পরিভাষায় 'পবন চক্র') স্থাপন করেছিলেন। নৌকার পালের মতো বেশ কয়েকটা কাপড়ে হাওয়া ধরলেই বন্‌বন্ করে ঘুরত হাওয়াই কলের চাকা। আশপাশের বাড়িঘরের মাথা ছাড়িয়ে প্রায় আকাশ ছুঁয়েছিল একশো চোদ্দ ফুট উঁচু কলদুটো। পাঁচটি তলা ছিল এই হাওয়া-কলের বাড়িতে। ওপরের তলাগুলোয় ধান, গম বা শস্য পেষাই করা হতো আর নিচের তলায় বায়ু শক্তি-চালিত চক্রাকার করাত ঘুরিয়ে কাঠ-চেরাই। হিকি লিখেছেন বাংলাদেশে এর আগে কখনও উইন্ড মিল বসেনি। ওয়াটসনের এই হাওয়া-কলেরই উল্লেখ করেছিলেন ইতিসামুদ্দীন, ১৭৭৯-তে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর আগে ভারতে বাহুবলকে বাদ দিলে পশুবলই ছিল যন্ত্র-চালনার প্রধান উপায়। অবশ্য জলশক্তিকে ব্যবহার করে 'পানিচাক্কি'-র সাহায্যে শস্য পেষাইয়ের কাজ হয়েছে। কিন্তু বাংলায় নয়।

ওয়াটসনের এমন অভিনব হাওয়া-কলটি কিন্তু নেহাত অপঘাতে মারা পড়েছিল। গোকুল ঘোষাল নামে এক প্রভাবশালী আঞ্চলিক বাসিন্দার সঙ্গে জমিজিরেত-সংক্রান্ত মামলায় জড়িয়ে পড়েন ওয়াটসন। হিকি স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন যে, গোকুল ঘোষালকে প্ররোচিত করেছিল বিখ্যাত ব্যারিস্টার বার্ওয়েল। ব্যক্তিগত ঈর্ষার কারণে। যাই হোক, ঘোষাল মশাই মামলা ঠুকে দিলেন যে, ওয়াটসন এমন এক বেয়াক্কেলে ঢ্যাঙা জিনিস খাড়া করেছেন, যেটি তাঁর জেনানা মহলের দিকে সারাক্ষণ দৃষ্টি হানে। অন্দরমহলের আব্রু বলে আর কিছু রক্ষা করাই দুষ্কর হয়ে পড়েছে।[২] মামলায়, বিশ্বাস না করলেও উপায় নেই, ঘোষাল জিতে গেলেন। আদালতের রায়ে উইন্ড মিল্-কে খুলে নামিয়ে নিতে হলো।

কলের শহর কলকাতার আকাশে প্রথম দুটি আঁচড় এইভাবে বছর কয়েকের মধ্যেই মুছে গেল। কলকাতার স্কাইলাইনে যন্ত্রযুগের স্বাক্ষর পাকাপাকি স্থান নিতে এরপর প্রায় বছর-চল্লিশ সময় লেগেছে। বাষ্পশক্তির যুগের আগমনের সাক্ষ্য হিসাবে যতদিন না ইটের চিমনি মাথা উঁচু করতে শুরু করেছে।

বহু কাল পরে, কলকাতায় আরেকটি উইন্ড মিল স্থাপিত হয়েছিল যার হদিশ রয়েছে ১৮৪১ সালে চার্লস জোসেফ রচিত একটি ম্যাপে। ব্যান্ডেল থেকে গার্ডেনরিচ অবধি হুগলী নদীর তীরবর্তী অঞ্চলের এই সমীক্ষায় কাশিপুরের গান ফাউন্ড্রি রোডে, নদীব পাড়ে একটি উইন্ড মিল ধরা দিয়েছে।



# কলের শহরের কাব্য

কলকাতার আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে আছে কলের শহরের প্রাচীন বহু নিদর্শন। বৌবাজার-বেন্টিঙ্ক স্ট্রিটের মোড়ে পুরনো বাড়ির গায়ে লাগানো গ্যাসের আলোর লোহার ব্রাকেটের গায়ে ঢালাই হরফে যে-সালটি পড়া যায়, সেই বছরেই কলকাতার পথে গ্যাসের আলো প্রথম জ্বলেছিল। ঢালাই লোহার পেনফোল্ড 'পিলার বক্স' যাতে এখনও চিঠি ফেলা হয়, রাস্তার ধারে ঘোড়ার জল খাওয়ার চৌবাচ্চা, দমকল ডাকার জন্য কাচ ভেঙে হাতল ঘোরাবার বাক্স, নানা ধরনের বাহারি গ্যাস ও ইলেকট্রিক ল্যাম্পপোস্ট, ফোর্ট উইলিয়াম প্রাঙ্গণের স্তম্ভ, যার মাথা থেকে তোপ দাগা এবং টেলিগ্রাফের সঙ্কেত প্রেরণ হতো বা খিদিরপুর কি বেলেঘাটা পামার বাজার অঞ্চলের সুদৃশ্য চারকোনা বা ছ'কোনা সব লাল ইটের তৈরি চিমনি যার মাথায় আবার কোথাও লোহার সুদৃশ্য রেলিং বা চুন-বালির বেড় দিয়ে কারুকার্য—কলকাতার পথঘাটের এইসব আসবাবের প্রত্যেকটিকে ঘিরেই এক-একটি ইতিহাসের বই রচনা করা যায়। কারিগরি ইতিহাস অবশ্য। কিন্তু তা বলে তাকে রসকষশূন্য মনে করার কোনো কারণ নেই।

সত্যজিৎ রায় তাঁর ছেলেবেলায় দেখা কলকাতার কথা লিখতে গিয়ে একটি হাওয়াগাড়ির

শহরের বর্ণনা দিয়েছেন।[১] কত রকমের বিচিত্র চেহারার মোটরগাড়ি চলত কলকাতায়, তার বিবরণ দেওয়ার লোভ তিনি সংবরণ করতে পারেননি। চলচ্চিত্র 'পথের পাঁচালী'-র অপুও কাশবন পেরিয়ে ছুটে যেতে পেরেছিল 'কু ঝিক-ঝিক' রেলগাড়িরই আকর্ষণে। তার কালো ধোঁয়া আকাশে এঁকে দিয়েছিল ছুটে চলার নির্ভুল দিশা আর অপুর কাছে বয়ে এনেছিল শহর ও 'সভ্যতার' অজানা স্বাদ। সভ্যভব্য কালিমাবিহীন ইলেকট্রিক ট্রেনের যতই গুণ থাক, এই সিনেমাটোগ্রাফিক পরিস্থিতিকে সামাল দিতে পারতো না।

যন্ত্ররস নিয়ে একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে মনে করার কোনো সুযোগ কিন্তু নেই। টার্নার কন্‌স্টেবল কি মনেটের চিত্রকলায় শিল্পবিপ্লবের পরবর্তী যুগের নিসর্গরেখা দিয়ে কি কম বাষ্পীয় শকটের আনাগোনা ? সাহেবদের উদাহরণ যদি মনঃপূত না হয় তা হলে খাঁটি দিশি দাওয়াইও আছে বইকি ! অবশ্য ছবি নয়, কাব্য।

সিন্ধু কাফি রাগিণীতে রূপচাঁদ পক্ষী যখন ঊনবিংশ শতাব্দীর 'কলিকাতা বর্ণন' করেছিলেন, একটি কলের শহরই আত্মপ্রকাশ করেছিল :[২]

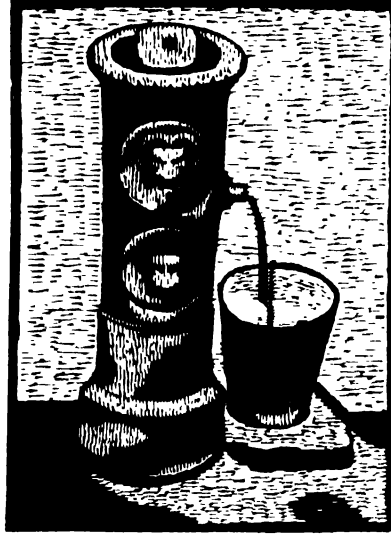
পরিষ্কার পথ নাইকো ময়লা সারি ২ গ্যাস লাইট আলা।
চন্দ্রদেবের ষোলকলা, হতে উজ্জ্বলা, শুক্লপক্ষে উদেন শশী,
এর পক্ষপাত নাই কোন নিশি, কৃষ্ণপক্ষ, শুক্লপক্ষ উভয় পক্ষ নয় অন্তর ॥
(চাঁদেতে আর "তাতে" তুল্লা কল্লে ইংরাজ কারিকর) ॥
ইস্টিম ভেসেল, রেলওয়ে, এই সকলের তেজ হেরিয়ে,
বেদ ব্রহ্মা ভোমা হয়ে গেলেন চাপিয়ে অগ্নি জল আর পবনে।
যায় এক মাসের পথ একটি দিনে, এক কোটী মণ দ্রব্য টানে, নাহি রাত্রি দিবা অবসর ॥
(রেলের বাঁশী শুনে আসি, যোটে যত নারী নর) ॥
নিকাশ হচ্ছে ময়লা জল, করেছে প্রস্তুত ড্রেনেজ কল,
ধুলো দিলে থামে জল, স্বতন্ত্র এক কল, অগ্নিদেব হলে প্রবল,
নির্ব্বাণ করে দমকল, গোরাদের চেহারা দেখে, ভয়ে পালায় বৈশ্বানর,
পাল্লে জল যোগাবে, সাধ্যমতে সাধ্য কি যে পোড়ে ঘর ॥
(মেসিনেতে দিলে দম, কোরে ঝমঝম, তেজে বেরোয় ওয়াটার) ॥

পাটের কল আর ময়দার কল, রেড়ির কল, কাপড়ের কল, সুরকির কল,
জলতোলা কল, খোয়া ভাঙ্গা কল, কলাকৃতি ঐরাবৎ করে এক দিবসে সোজা পথ।
কলের খুরে দণ্ডবৎ, জুড়ে গেল গ্রাম নগর ॥

সেরে দিলে কলে কলে, এর পরে কলেতে বানাবে ছেলে।
পুত্রহীন মহীমণ্ডলে থাকবে না মূলে, মলে করবে বিষয় ভোগ ॥

এই কলের শহর রূপচাঁদ পক্ষীর কাছে এক অবোধগম্য বিস্ময় । এই বিস্ময় কেটে যাওয়ায় পর এসেছিল বিরক্তি । সত্যি বলতে কলকব্জার ব্যাপারে একটা চাপা অনীহা আমাদের থেকেই গেছে । তার কিছুটা যুক্তিপূর্ণ । ইংলণ্ডের শিল্পবিপ্লবের পরবর্তীকালেই সত্যিকার কলকব্জার যুগ শুরু হয় । উপনিবেশ ভারতে ও বিশেষ করে তৎকালীন রাজধানী কলকাতায়ও তার অবশ্যম্ভাবী ছায়া পড়েছে । যন্ত্র—বিশেষ করে বাষ্পচালিত যন্ত্রকে আমরা বাংলার তাঁতীদের বাহুবলকে পরাস্ত করার প্রধান হাতিয়ার হিসাবেই আত্মপ্রকাশ করতে দেখেছি । একদিকে ম্যাঞ্চেস্টারের কারখানায় উৎপাদন বৃদ্ধি ও অন্যদিকে ভারতে রেলওয়ে ও স্টিমার ব্যবস্থার প্রবর্তনের পর কাঁচামাল সংগ্রহ ও ব্রিটিশ পণ্য সরবরাহের ব্যাপক ও বিপুল আয়োজন—এই পুরো কারসাজির পিছনে বাষ্পদেবের ভূমিকা ছিল খলনায়কের । কাজেই কলকব্জার উল্লেখমাত্র একটা বিজাতীয় গন্ধ পাই আমরা ।

বর্তমানে এমন কেউ নেই যিনি যন্ত্রযুগের অপরিহার্যতা অস্বীকার করেন কিন্তু কলকব্জার অতীতচর্চাটা অপাঙ্‌ক্তেয়ই রয়ে গেছে । অথচ 'কলকাতা তিনশো' নিয়ে আমাদের গর্ব ও হতাশার অজস্র সিনারিওর মধ্যে সবচেয়ে কটুভাষী সমালোচকও সাহেবী জমানার টাউন হল, মেটকাফ হল কি রাইটার্স বিল্ডিং ইত্যাদি রক্ষা করার কোনো প্রয়োজন নেই বলে মন্তব্য করেননি । শুধু তাই নয়, গত তিন বছরের মধ্যে কলকাতার বাড়িঘর নিয়ে যত লেখা বেরিয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে 'স্বদেশী' ভাবাপন্নরাও একবারের জন্য নীলমণি মিত্রের নাম করেননি । অথচ এই প্রথম পাসকরা বাঙালি ইঞ্জিনিয়ার উনবিংশ শতাব্দীর কলকাতাকে গথিক, ডোরিক, প্যালাডিয়ান ইত্যাদি ধার-করা স্থাপত্যশৈলীর উপর সম্পূর্ণ নির্ভরতার গ্লানি থেকে মুক্ত করার কাজে কম সাফল্য অর্জন করেননি । নীলমণি মিত্র একা নন, তাঁর আগে ও পরে বহু বাঙালি প্রযুক্তিবিদের কলকব্জার ক্ষেত্রে গর্ব করার মতো অবদান রয়েছে । বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, সত্যেন্দ্রনাথ বসু বা মেঘনাদ সাহা যেভাবে আমাদের হীনম্মন্যতার হাত থেকে ত্রাণ করেন, প্রযুক্তিচর্চার ক্ষেত্রেও তেমন ত্রাতার অভাব নেই । তাঁদের সন্ধান নেওয়ার জন্য কলের শহর কলকাতার অতীতে হানা দেওয়ার কাজটা জরুরি এবং বোধহয় আকর্ষণীয় ।



# জলের কল, টাকা-করা কল, পেষাই কল : বাষ্পের হরেক কল

১৮৫৩ নাগাদ কলকাতার নদীতটের বর্ণনা দেওয়ার সময় 'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ' লিখছে, "গঙ্গা হইতে জল উত্তোলনের এক বাষ্পীয় যন্ত্র স্থাপিত আছে, কিন্তু পাঠকবর্গ কেহই তদ্দ্বারা উত্তোলিত জল ব্যবহার করেন না, ও নগরের হিন্দু পল্লীতে তজ্জলদ্বারা রাজপথ অভিষিক্ত হয় না, সুতরাং উক্ত যন্ত্রের বর্ণনে বিমুখ হইয়া চাঁদপাল ঘাটে প্রস্থান করিলে কেহই বিরক্ত হইবার নয়েন" ।[১]

তেল, গ্রীজ, চামড়া, প্রভৃতি ম্লেচ্ছ দ্রব্যের সংস্পর্শের কারণে 'দূষিত' কলের জল বহুকাল ব্রাত্যদশা ভোগ করেছে । ১৮৭০-র 'সুলভ সমাচার' পত্রিকায় 'উদাসীনের ভ্রমণ বৃত্তান্তে'র মধ্যে তো রামপ্রসাদী সুরে একটা আস্ত গানই রয়েছে কলের জলের কেচ্ছা নিয়ে[২] :

বাবু ভেয়ে নল বসায়ে লয়ে যাচ্চে ঘরে ঘরে,
(ঘরের দেয়াল ফুঁড়ে উঠ্‌ছে বেগে) ধন্য 'জনার্দ্দনের বলদ' সকলই পার বুদ্ধির জোরে ।
উদাসীন বাবাজী বলে মজালে জাত ভ্রষ্টাচারে,
(ইংয় বেঙ্গলে আর হামবাগ মিলে) কেবল ধরা পলো ব্রহ্মজ্ঞানী সত্য কথা প্রকাশ করে ।
যাই বলিহারি সভ্যতারে ।
এবার জেতের দফা, করলে রফা, দিয়ে সুখ নানা প্রকারে ।
কলের গাড়ী জলের কল, দিয়েছে সব
আল্‌গা করে (ও ঘোর কলি বুঝি নিকট হলে)

কেবল গোঁড়া হিন্দু দুই এক জনা রেখেছে টেনে হিঁচিড়ে।
এমন সাধু কেবা আছে থাক্‌বে এ
সুবিধা ছেড়ে, (সেকাল নাই আর নাই রে ভাই)
দিলে ব্যবস্থা 'ধর্ম্মরক্ষিণী' খেয়ে দেখে বিচার করে।
মহাজ্ঞানী রাজা বাহাদুর দেখেছেন
শাস্ত্র পড়ে, (আহা মরি রে তোর অগাধ বিদ্যে)
থাক্‌বে হিন্দুয়ানী খেলে পানি শরীরের সুখের তরে।
দুঃখী প্রাণী মজুর মুটে খাচ্চে সব
সবে প্রাণ ভরে, (একাকার একাকার হইল)
রাজা প্রজা উঁচু নীচু দিলে জলে সমান করে।

কলকাতায় জাত-মারা প্রথম জলের কলের উল্লেখ প্রাচীন মানচিত্রে পাওয়া যায়। ১৮৩৩-এ ডয়েলির আঁকা চাঁদপাল ঘাটের ছবিতেও একটি চিমনি দেখে জলের কলের সন্ধান পাওয়া যায়। বয়লার হাউসে, অর্থাৎ যেখানে কয়লা পুড়িয়ে জল থেকে বাষ্প তৈরি হতো, সেখানে এমন একটি চিমনি থাকতেই হবে। এই জলতোলা বাষ্পের কলটি বসানো হয় ১৮২২-এ। একটি উন্মুক্ত প্রণালী (অ্যাকোয়াডাক্ট) দিয়ে তখন জল সরবরাহের ব্যবস্থা ছিল। এই কল বসার প্রায় পঞ্চাশ-ষাট বছর পরে বোর্ন অ্যান্ড শেফার্ডের তোলা ফোটোগ্রাফ সাক্ষী, বর্তমান রাজভবনের পশ্চিমে ফুটপাতের কিনারায় সেই প্রণালী থেকে কয়েকজন জল সংগ্রহ করছেন।

চাঁদপাল ঘাটে এই জলতোলা কল বসার আগে বাষ্পের কলের ইঞ্জিনিয়ার হেনরি জেসপ বাধ্য হয়েছিলেন মিলিটারি বোর্ডের অফিসিয়েটিং সেক্রেটারি ক্যাপ্টেন কোব্বেকে চিঠি লিখে আশ্বস্ত করতে যে, বাষ্পের কল জিনিসটি আসলে অতি নিরীহ, কারুর কোনো ক্ষতি করে না। "চুল্লীতে প্রথম আগুন দেওয়ার সময়ে ঘন কালো ধোঁয়া বেরোয় ঠিকই কিন্তু যেহেতু ভোরবেলাতেই এই কাজটা সেরে ফেলা হবে, বাতাস তখন পাতলা থাকবে, ধোঁয়া কখনোই নীচে নেমে আসবে না। তা ছাড়া কল (ইঞ্জিন) যদি ঠিক মতো তৈরি হয় একটুও আওয়াজ বা কাঁপুনি টের পাওয়ার কথা নয়। আমার বিশ্বাস, স্টিম ইঞ্জিন অসুবিধা সৃষ্টি করে, এটা শুধু নিছক কল্পনা, সত্য নয়।"[৩]

কলকাতার আকাশে গলগল করে ধোঁয়া ছড়ানো শুরু হলো ১৮৩০ নাগাদ বর্তমান হাওড়া ব্রিজের সামান্য উত্তরে স্ট্র্যান্ড রোডের টাঁকশাল বসার পর। এখনও এই বাড়িটি পুরনো টাঁকশাল নামেই পরিচিত। যদিও তার অংশবিশেষ সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশের কুক্ষিগত এবং টাঁকশাল কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীন 'সিলভার রিফাইনারি' বেশ কয়েক বছর ধরেই পরিত্যক্ত।

অতিকায় সব ইঞ্জিনের বাষ্পকে ঘনীভূত করার প্রয়োজনে এই কারখানায় গঙ্গা থেকে জল টেনে আনার জন্য সুড়ঙ্গ খোঁড়া হয়েছিল। ১৮৩৪-এর ২৬ ফেব্রুয়ারি 'সমাচার দর্পণ' জানিয়েছিল, "ক্লাইবস্ট্রিট নামক রাস্তার গড়ে ২৫ ফুট নীচে অথচ টাক্‌শালের মেজের ২৬৷৷· ফুট নীচে গঙ্গা হইতে প্রাপ্ত চড়ার উপরে বঙ্গদেশস্থ গৃহাদি নির্ম্মাণের অধ্যক্ষ অথচ তদ্বিষয়জ্ঞ শ্রীযুক্ত কাপ্তান ফর্বস সাহেব কর্ত্তৃক ১৮২৪ সালের মার্চ মাসের শেষে এ গৃহের ভিত্তি স্থাপিত হয় অতএব উপরিলিখিত ইমারত

অপেক্ষা মৃত্তিকার নীচে অধিক ইমারত আছে। ছয় বৎসরে ইহার তাবৎ কর্ম্ম সম্পন্ন হইয়াছে। তাহার মধ্যে বাষ্পীয় পাঁচ কল আছে বিশেষতঃ দুই কল ৪০ অশ্ব ও এক কল ২৪ অশ্ব ও এক কল ২০ অশ্ব এবং এক কল ১৪ অশ্বতুল্য বল এই যন্ত্রের দ্বারা দিবসে সাত ঘণ্টার মধ্যে ৩,০০,০০০ খান রূপা মুদ্রিত হইতে পারে।"[8]

ক্যাপ্টেন উইলিয়াম নেয়ার্ন ফর্বস (পরবর্তীকালে মেজর জেনারেল) ঊনবিংশ শতাব্দীর কলকাতায় বিদেশী ইঞ্জিনিয়ারদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কীর্তির অধিকারী। স্থপতি ও গৃহনির্মাতা হিসাবে তাঁর সেরা অবদান সেন্ট পল্স ক্যাথিড্রাল। অন্য দিকে কলকাতাকেন্দ্রিক অভ্যন্তরীণ জলপথে সরকারী স্টিমার-ব্যবস্থা চালু করার ব্যাপারেও তাঁর ভূমিকা ছিল গৌরবজনক। টাঁকশালে বাষ্পের

| Numbers of Portfolios | Name, and Locality of Mint. | Type of Engine | [illegible] | Letters and Number of order Book | Latest date on drawings | Number of Engines | Cylinder diam. Stk. | Nominal HP of Engine | No. of drawings in Portfolios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 707 | Calcutta Mint Rolling Mill Engine | Crank Beam | 19 | XO | 9/1822 | 2 | 32 x 6'0 | 40 | — |
| 707 | Calcutta Mint Coining Engine | Crank Beam | | S 5 | 8/1822 | 1 | x 5'0 | 20 | — |
| 707 | Calcutta Mint Workshop & General Eng. | Independent | | GZ | 1822 | 1 | x 2'6 | 14 | — 25 |
| 707 | Calcutta Mint Cutting out Engine | Crank Beam | | WS | 10/1822 | 1 | x 5'0 | 24 | — |
| 707 | Calcutta Mint miscellaneous drawings | — | — | — | — | — | — | — | 69 |
| 708 | Bombay Mint General Engine | Independent | 34 | EC | 9/1823 | 1 | x 2'6 | 10 | |
| 708 | Bombay Mint Cutting out & Coining Engine | Crank Beam | 21½ | VB | 10/1823 | 1 | x 5'0 | 24 | 16 |
| 708 | Bombay Mint Rolling Mill Engine | Crank Beam | 19 | VS | 10/1823 | 1 | x 6'0 | 40 | |
| 708 | Bombay Mint Miscellaneous drawings | — | — | — | 1823 | — | — | — | 57 |
| 709 | Lisbon Mint | | | | | | | | |
| 710 | Danish Mint | | 25 | F/4 | 5/1805 | 1 | 17⅓ x 4'0 | 14 | 5 |

বোল্টন অ্যান্ড ওয়াট কোম্পানির 'ইঞ্জিন বুক'-এ কলকাতার বাষ্পের ইঞ্জিনের উল্লেখ

কলগুলি তাঁরই পরামর্শমতো আনানো হয়েছিল ইংলন্ডের বিখ্যাত বোল্টন অ্যান্ড ওয়াট কোম্পানি থেকে। কুইজ প্রতিযোগিতার প্রশ্ন, 'স্টিম ইঞ্জিন কে আবিষ্কার করেন ?'—এর উত্তরে যে জেমস ওয়াটের নাম করা হয়, তিনিই এই কোম্পানির অন্যতম অংশীদার ছিলেন।

বার্মিংহামের পাবলিক লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত এই প্রাচীন ও সুবিখ্যাত ইঞ্জিননির্মাতা সংস্থার নথিপত্র থেকে জানা যায়, ভারতের জন্য প্রথম ইঞ্জিনটি তারা ১৮০৭-এ রপ্তানি করেছিল বোম্বের জাহাজঘাঁটির জন্য। কলকাতায় পাঠানো ইঞ্জিনের মধ্যে (সবই ১৮৪০-এর আগে) যেগুলির নকশা আজও সংরক্ষিত, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য—ক্যালকাটা ক্যানন্ ফ্যাক্টরি (কাশীপুর), ক্যালকাটা স্ মিল্ ও নাল্‌মু এস্টেটের স্ মিল এবং একটি অয়েল মিল-এর ইঞ্জিন (বোল্টন অ্যান্ড ওয়াট কোম্পানির ইঞ্জিন-বুক থেকে সংগৃহীত।)

এই অয়েল মিলটি সম্ভবত ১৮২৯-এ স্ট্র্যান্ড রোডে স্থাপিত হয়েছিন এবং 'স্ট্র্যান্ড মিল' নামেই পরিচিত ছিল। এই বাষ্পের কলটিও সেকালের কলকাতাব একটি দর্শনীয় স্থান। 'সমাচার দর্পণ'-কে সাক্ষী মানছি, "এই কলের দ্বারা গোম পেষা যাইবে ও ধান ভানা যাইবে ও মর্দ্দনের দ্বারা তৈলাদি প্রস্তুত হইবে এবং এই সকল কার্য্য ত্রিশ অশ্বের বল ধারি বাষ্পের দুইটা যন্ত্রের দ্বারা সম্পূর্ণ হইবে। এতদ্দেশীয় অনেক লোক এই আশ্চর্য্য বিষয় দর্শনার্থে যাইতেছেন এবং আমরা আপানারদের সকল মিত্রকে পরামর্শ দি যে তাঁহারা এই অদ্ভুত যন্ত্র বাষ্পের দ্বারা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দুই হাজার মোন গোম মিষিতে পারে তৎস্থানে গমন করিয়া তাহা দর্শন করেন"।[৫] (৮ আগস্ট, ১৮২৯)।

'ক্যালকাটা গেজেটে' প্রকাশিত হয়েছিল আরও বিস্তারিত বিবরণ। স্মিথসন অ্যান্ড হোল্ডসওয়ার্থ কোম্পানির এই কল বসানোর কাজ শুরু হয় ১৮২৮-এর ফেব্রুয়ারি নাগাদ। মাত্র আঠার মাসের মধ্যে ইংলন্ডের কারখানার ধাঁচে পাঁচতলা বাড়ি তৈরি ও যন্ত্রপাতি বসানোর কাজ শেষ হয়। ১৪৪ ফিট লম্বা ও ৫৬ ফিট প্রস্থ-বিশিষ্ট বাড়িটিতে দুটি ত্রিশ অশ্বশক্তির স্টিম ইঞ্জিন ছিল। আঠার জোড়া ফরাসী পেষাই-পাথর চালাত তারা। তাছাড়া বিভেল গিয়ারের সাহায্যে চলত তেল-কল। চেন কন্‌ভেয়ারের সাহায্যে ময়দা স্থানান্তরিত করার যান্ত্রিক পদ্ধতিটিও ছিল সেকালের বিচারে অভিনব।[৬]

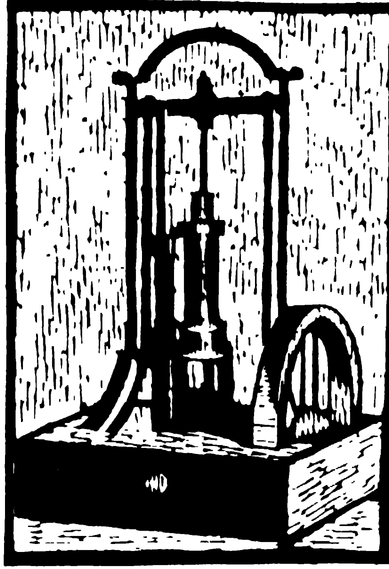
বিখ্যাত ব্যবসায়ী মতিলাল শীলের বেশ কিছু জাহাজের মধ্যে একটি কলের জাহাজও ছিল। তিনি প্রথম জীবনে এই স্ট্র্যান্ড মিলে কিছুদিন চাকরি করেছিলেন।

ঠিক কলকাতায় না হলেও, বাউরিয়া কটন মিলের কথা প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা দরকার। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে কলকাতার পনেরো মাইল দক্ষিণে স্থাপিত এই মিলটিতে বাষ্পশক্তিকে কলের চাকা ঘোরানোর কাজে লাগানো হয়। ১৮৩৭-এ মিলটি বন্ধ হওয়ার আগেই কর্তৃপক্ষ বেশ কিছু ইংরেজ মহিলা এনেছিলেন ভারতীয়দের কলে সুতো বোনা শেখাবার জন্য। কিন্তু "ব্যাচিলার ও জাহাজি লোকে ভর্তি টগবগে এই শহরে তাঁদের অনেকেই অবিলম্বে খুঁজে নিয়েছিলেন জীবন ধারণের অপেক্ষাকৃত কম গৌরবময় কিন্তু সহজতর উপায়।"[৭] ফোর্ট গ্লস্টার মিল কর্তৃপক্ষের ব্যবহারের জন্য ১৮২৯-এ ৪৩ ফিট লম্বা, দিশি 'বাউলে' ধাঁচের ছোট্ট একটি স্টিমার তৈরি করেন ম্যাকনট নামে এক ইঞ্জিনিয়ার। পাঁচ অশ্বশক্তি বিশিষ্ট স্টিমারের ইঞ্জিনটি নিজে ফোর্ট গ্লস্টারে নির্মাণ করেন তিনি। এর আগে সম্ভবত প্রাচ্যে আর কেউ স্টিমারের ইঞ্জিন তৈরি করেননি। শুধু তাই নয়, ম্যাকনটের আরও বড় কৃতিত্ব, তিনি উচ্চচাপ-বিশিষ্ট বাষ্পশক্তি ব্যবহার করেছিলেন, যা সে-যুগে

বয়লার বিস্ফোরণের ভয়ে করা হতো না। ১৮৩০-এ স্টিমারের জন্য ছয় অশ্বশক্তির আর-একটি ইঞ্জিন তৈরির কাজে তিনি হাত দিয়েছিলেন। কলকাতার এক ভদ্রলোকের ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য নাকি তৈরি হচ্ছিল সেটি।[৮]

তবে শুধু বাষ্পের কলের কথা ধরলে ম্যাকনটের আগেও কলকাতায় তা তৈরি হয়েছে। ১৮২০-র দশকে জনৈক টৌলমিন সোডা ওয়াটার তৈরির কারখানার জন্য ছোট্ট একটি স্টিম ইঞ্জিন তৈরি করেছিলেন।[৯]

শুধু বাষ্পের কল আমদানি আর সাহেবদের তা তৈরি করার বিবরণ ছেড়ে এবার বাঙালি উপাখ্যানে ঢোকা উচিত।



# ভারতের প্রথম 'ইঞ্জিনিয়ার' গোলোকচন্দ্র ও 'গুরু' জোন্‌স

"সর্ব্ব অগ্রে ছাপাখানা এই স্থানে হয়,
মুদ্রিত হইল যাতে বঙ্গ গ্রন্থচয় ।
কাগজের কল হেথা অতি চমৎকার,
জন্মিছে কাগজ তায় বিবিধ প্রকার ।"

'সুরধনী কাব্য'-তে দীনবন্ধু মিত্র এখানে শ্রীরামপুরের কথা উল্লেখ করছেন ।

বাংলা ভাষা ও মুদ্রণশিল্পের বিকাশের প্রসঙ্গে উইলিয়াম কেরীর অবদানের কথা বহু-আলোচিত । কিন্তু কাগজের কল স্থাপনা বা যন্ত্রযুগের সূচনায় কেরী ও তাঁর পরিজনদের ভূমিকা সেভাবে আলোচিত হয়নি । অথচ ভারতে ১৮৬৫ অবধি শ্রীরামপুরের কাগজের কারখানাটি ছিল কলে তৈরি কাগজ উৎপাদনের একমাত্র কেন্দ্র ।

বই ছাপার উপযোগী কাগজের অভাব থেকেই শ্রীরামপুরের কাগজের কলের জন্ম । ইংলন্ড থেকে আমদানি-করা কাগজের যেমন দাম তেমনই অনিশ্চিত সরবরাহ । অন্যদিকে স্থানীয় কাগজ, 'পাটনা' কাগজ, অমসৃণ, পোকা লাগত সহজে । ১৮০৪ থেকেই তাই শুরু হয় তোড়জোড় । ১৮০৯-এ সীমিতভাবে কাগজ উৎপাদন আরম্ভ হয় । এরপর ১৮১১ ও ১৮১৪-য় ক্রমশ আরও বড় আকারের দুটি কল বসানো হয় । শ্রীরামপুরের ছাপাখানা ও হরফ ঢালাইয়ের কারখানার মতো

কাগজের কলেরও অধ্যক্ষ ছিলেন কেরীর সহযোগী উইলিয়াম ওয়ার্ড। শেষোক্ত কাগজের কলটি ট্রেড মিল গোত্রের। মজদুররা পায়ের চাপে যন্ত্রের চাকা ঘোরাতেন। গ্রীষ্মের এক অসহনীয় দুপুরে শ্রান্ত এক কর্মী দুর্ঘটনায় পড়ে প্রাণ হারাবার পর উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন মিশনারিরা। বাষ্পশক্তি ব্যবহার করার কথা তখনই চিন্তা করেন তাঁরা। পরামর্শ নেন কলকাতার বিশেষজ্ঞ মিস্টার জোন্‌সের।[১]

জোন্‌স—হাওড়ার লোকের কাছে গুরু জোন্‌স। আধুনিক শিল্পাঞ্চল রূপে হাওড়ার প্রথম বীজ **বুনেছিলেন** তিনি। আর ওই 'গুরু' সম্বোধনের মধ্যেই ইঙ্গিত আছে স্থানীয় মানুষকে কলকব্জা সম্বন্ধে পাঠ দেওয়ার। জোন্‌স কলকাতার প্রথম সৃজনীপ্রতিভা-বিশিষ্ট আধুনিক ইঞ্জিনিয়ার। তিনি কলকাতায় আসেন ১৮০০ সালে। সাধারণ কারিগর হিসাবে বছর দশেক কাজ করার পর তিনি হাওড়ায় অ্যালবিওন ঘাটে ক্যানভাস তৈরির একটি কারখানা স্থাপন করেন। অনর্গল বাংলা বলতে পারতেন। ছোট একটি কাগজের কারখানাও খুলেছিলেন। সেখান থেকে ১৮১১-য় জাভা অভিযানের আগে সরকারি সেনাবাহিনীকে কার্তুজের জন্য কাগজ সরবরাহ করা হয়েছিল। স্থপতি হিসাবে ভারতের প্রথম গথিক রীতির সৌধটি নির্মাণের কৃতিত্বেরও অধিকারী তিনি। প্রাক্তণ বিশপ্‌স কলেজ, বর্তমানে শিবপুরের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের প্রাঙ্গণে আজও এক দর্শনীয় বস্তু। তবে জোন্‌সের সেরা কীর্তি ভারতের প্রথম আধুনিক রীতির কয়লাখনি পরিচালনায় কারিগরি সাফল্য অর্জন। ভারতীয় কয়লাখনি শিল্পের জনক হিসাবেই ইতিহাসে তিনি পরিচিত। রানীগঞ্জ কয়লাখনির পত্তন তাঁর হাতে।[২] তবে ব্যবসায়িকভাবে তিনি সফল হননি, সে-সাফল্য যাঁর উদ্যোগে এসেছিল এবং ওই রানীগঞ্জ খনিকেই কেন্দ্র করে, সেই দ্বারকানাথ ঠাকুরের কথায় পরে আসব আমরা।

১৮২০-র ১৮ই জানুয়ারি শ্রীরামপুর থেকে পুত্র জাবেজকে লেখা কেরীর একটি চিঠি থেকে জানা যায়, "ইংলন্ড থেকে সদ্য একটি স্টিম ইঞ্জিন এসে পৌঁছেচে যার দাম এটিকে স্থাপন করার খরচ সমেত কুড়ি হাজার টাকার কম হবে না।"[৩]

এই বাষ্পের কল তৈরি হয়েছিল বোল্টনের থোয়েটস্ হিক অ্যান্ড রথওয়েল্‌স কোম্পানিতে। বারো ঘোড়ার ইঞ্জিনটির প্রস্তুতকারকের নাম খোদাই করা মূল ধাতব ফলকটি শ্রীরামপুরের কেরী সংগ্রহশালায় দেখতে পাওয়া যায় :

12 Horse steam engine
Manufactured by
Thwaites Hick & Rothwells
Engineers
Bolton
Lanchashire England
For the
Baptist Missionary Society's
Establishment at
Serampore.

১৮২০ সালের ২৭ মার্চ কয়লার আগুন জ্বলল। বয়লারের নিচে চুল্লিতে গনগনে আঁচ। চিমনি দিয়ে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। জল ফুটে বাষ্প হয়ে ফোঁস-ফোঁস শব্দে যন্ত্রের চাকা ঘোরাচ্ছে। এই দৃশ্য দেখে লোকে ইঞ্জিনটির নাম দিল 'আগুনের কল'। শুধু ভারতীয়রাই এই বিস্ময়কর দৃশ্য দেখার জন্য ভিড় জমাত না, আর ইংল্যান্ড থেকে নিয়ে-আসা ইঞ্জিন চালককে প্রশ্নে-প্রশ্নে জর্জরিত করত না, বহু বিদেশীর কাছেও এ-দৃশ্য ছিল সম্পূর্ণ নতুন। ১৮২৪-এর ২৭ মে 'ক্যালকাটা গেজেট'-এ প্রকাশিত শ্রীরামপুর কলেজের চতুর্থ বার্ষিক রিপোর্ট থেকে দেখা যায়, "বাষ্পের ইঞ্জিনটি চালু হওয়ার পর চার বছর অতিক্রান্ত কিন্তু এখনও প্রতি সপ্তাহে ভারতীয়রা (নেটিভরা) এখানে এসে ভিড় জমায়। ইঞ্জিনটিকে নিরীক্ষণ করে। এমন কি নৌকারোহীরা দেশের বিভিন্ন স্থানে যাওয়ার পথে নৌকা ঘাটে বেঁধে নেমে আসে। ঘুরে ফিরে পর্যবেক্ষণ করে।[৪]

জন ক্লার্ক মার্শম্যানের ভাষায়, "এই ইঞ্জিনটি (পরবর্তীকালের) প্রথম বাষ্পচালিত নৌকা বা প্রথম রেল ইঞ্জিনের মতোই উত্তেজনা সৃষ্টি করেছিল।" আগুনের কলটি "দেবকুলের স্থপতি বিশ্বকর্মার কীর্তির সঙ্গে পাল্লা দিয়েছিল।"[৫]

এই ইঞ্জিনটি চালু হওয়ার পর শ্রীরামপুরে আর কাগজের অভাব রইল না। তার চেয়েও বড় কথা এই আগুনের কল দেখেই উৎসাহিত হয়েছিলেন প্রথম ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ার। আধুনিক অর্থে 'ইঞ্জিনিয়ার' শব্দটি ইংরেজি ভাষায় অবাচীন। 'ইঞ্জিন-নির্মাতা', এই অর্থেই জেমস ওয়াট ও তাঁর সতীর্থরা প্রথম'ইঞ্জিনিয়ার' অভিহিত হন। সেই আদি অর্থে গোলোকচন্দ্র নির্দ্বিধায় প্রথম ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ারের শিরোপা দাবি করতে পারেন।[৬]

কেরী প্রতিষ্ঠিত এগ্রি-হর্টিকালচারাল সোসাইটির ১৮২৮ সালের ৯ জানুয়ারির অধিবেশনের বিবরণ থেকে জানা যায়, "রেভারেন্ড ডক্টর কেরীর পরামর্শ মতো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে, টিটাগড়ের কামার গোলোকচন্দ্রকে তাঁর নিজের তৈরি স্টিম ইঞ্জিনটি প্রদর্শনের জন্য অনুমতি দেওয়া হবে। তিনি এটি কোনো ইউরোপীয় শিল্পীর সাহায্য ছাড়াই তৈরি করেছেন।" কেরীর জীবনীকার জর্জ স্মিথ লিখেছেন, সোসাইটির পরবর্তী মিটিঙের সময়, বার্ষিক প্রদর্শনীতে যখন ১০৯ জন মালী উপস্থিত, প্রতিযোগিতা চলছে কৃষিদ্রব্যের মধ্যে, স্টিম ইঞ্জিনটিকে পেশ করা হয় এবং সকলে এই মত ব্যক্ত করেন যে, শ্রীরামপুরের মিশনারিদের বড় স্টিম ইঞ্জিনের অনুকরণে গঠিত এই ইঞ্জিনটি জলসেচের কাজের উপযোগী। পঞ্চাশ টাকার বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল সৃজনশীল নির্মাতাকে উৎসাহিত করার জন্য।[৭]

১৮২৮-এর ১৭ জানুয়ারি 'ক্যালকাটা গেজেট'-এর প্রতিবেদনেও স্মিথের উক্তির প্রতিধ্বনি। বড়-বড় আলু, ফুলকপি, বাঁধাকপি ও পাঁচ সের দুধ-দেওয়া গরুর জন্য মেডাল ও সর্বোচ্চ চল্লিশ টাকা করে প্রাইজ পেয়েছিলেন চারজন, কিন্তু সোসাইটির নির্দিষ্ট কার্যকলাপের আওতার মধ্যে না-পড়লেও পঞ্চাশ টাকা পুরস্কার পেয়েছিলেন গোলোকচন্দ্র তাঁর striking instance of native ingenuity-র জন্য।[৮]

গোলোকচন্দ্রের পরবর্তী জীবন সম্বন্ধে এখনও পর্যন্ত আর কিছু জানা যায়নি। তবে ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে আরও বড় সাফল্য তিনি অর্জন করেছিলেন, এমন আশা করা বাতুলতা। তাঁর পূর্ববর্তী বিদেশী ম্যাকনট বা টৌল্‌মিনও তা পারেননি। ব্রিটিশ শক্তি ভারতে ভারী যন্ত্রশিল্প বিকাশের কোনো সম্ভাবনাকে মাথা তুলতে দেয়নি। এমনকি শ্রীরামপুরের কাগজের মিলের ক্ষেত্রেও সে-কথা

318 LIFE OF WILLIAM CAREY. 1828

and Government alike, is fast putting India in the place of China as a producer.

In the Society's *Proceedings* for 9th January 1828 we find this significant record:—"Resolved at the suggestion of the Rev. Dr. Carey that permission be given to Goluk Chundra, a blacksmith of Titigur, to exhibit a steam engine made by himself without the aid of any European artist." At the next meeting, when 109 *malees* or native gardeners competed at the annual exhibition of vegetables, the steam engine was submitted and pronounced "useful for irrigating lands, made upon the mode of a large steam engine belonging to the missionaries at Serampore." A premium of Rs.50 was presented to the ingenious blacksmith as an encouragement to further exertions of his industry. When in 1832

জর্জ স্মিথের বইয়ে গোলোকচন্দ্র প্রসঙ্গ

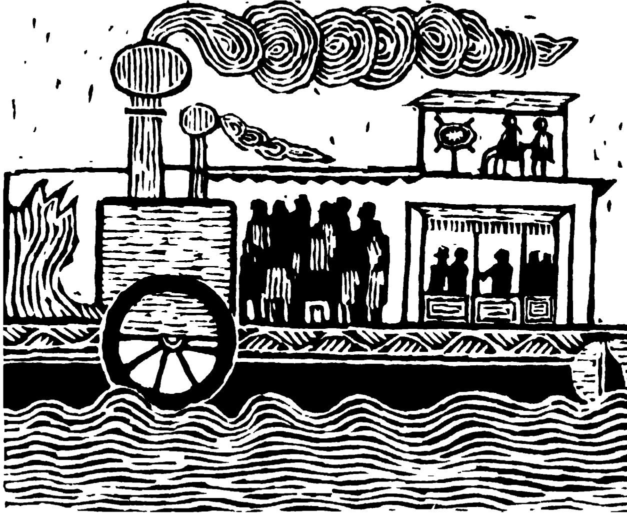
প্রযোজ্য। ১৮৪৫ অবধি মিলটি ক্রমশ সম্প্রসারিত হয়। তিনটি স্টিম ইঞ্জিন দিয়ে তখন দৈনিক ডিমাই আকারের পঞ্চাশ রিম করে কাগজ তৈরি হতো। ভারতে মেশিনে কাগজ উৎপাদনের এই প্রধান কেন্দ্রটি ১৮৬৫-তে বন্ধ হয়ে যাওয়ার পিছনে ছিল ব্রিটিশ শক্তির সাম্রাজ্যবাদী নীতির প্রয়োগ। শ্বেতাঙ্গ বণিকদের স্বার্থরক্ষার তাগিদ। কেরীর জীবনীকার স্মিথ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সে-কথা ঘোষণা করেছেন।

শ্রীরামপুরের সবচেয়ে ডাকসাইটে কারিগর অবশ্যই গোলোকচন্দ্র নন, পঞ্চানন কর্মকার। উইলকিন্‌সকে অনেকে বাংলার 'ক্যাক্সটন' বললেও, বাংলা হরফকে হাতে-কলমে ছেনিকাটা ও ঢালাইয়ের মাধ্যমে একটি সুনির্দিষ্ট রূপদান করার উপযোগী প্রয়োগবিদ্যা সফল করার কৃতিত্ব অনেকাংশেই পঞ্চাননের। তিনি ছিলেন উইল্‌কিনসের ডান হাত। পঞ্চানন যখন কলকাতার ছাপাখানায় কাজ করছেন, সেই সময় উইলিয়াম কেরী তাঁর প্রতিভার সন্ধান পান। ১৭৯৯ খ্রীস্টাব্দের ১ এপ্রিল কেরী একটি চিঠিতে লিখছেন :

We have a press and I have succeed in procuring a sum of money sufficient to get types cast. I have found a man who can cast them and the person who casts for the Company's press ; I have engaged a printer in Calcutta to superintendend the castion.

কেরী-পঞ্চাননের যৌথ উদ্যোগে বিভিন্ন ভাষার অসংখ্য গ্রন্থ মুদ্রিত হয়। ১৮০৪-এ পঞ্চাননের মৃত্যুর পর তাঁর কাজকে এগিয়ে নিয়ে যান তাঁর জামাতা মনোহর। পঞ্চাননের জীবদ্দশাতেই মনোহর শ্রীরামপুরের মিশনে ছাপাখানায় যোগ দেন। আমৃত্যু ১৮৫৩ অবধি এই যোগ অক্ষুণ্ণ ছিল। ছেনিকাটা ও ঢালাইয়ের কাজে পঞ্চাননের নৈপুণ্য প্রবাহিত হয় তাঁর শিষ্য ও জামাতা মনোহরের মধ্যে। অন্তত পনেরটি বিভিন্ন ভাষার হরফ তৈরি করেছিলেন তিনি। মনোহর শ্রীরামপুরে নিজস্ব মুদ্রণালয় 'চন্দ্রোদয়' প্রেস প্রতিষ্ঠা করেন ১৮৩৭ নাগাদ। মনোহরের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র এই ছাপাখানার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কৃষ্ণচন্দ্র নিজের হাতে তৈরি করেছিলেন চন্দ্রোদয় প্রেসের প্রথম লোহার তৈরি মুদ্রাযন্ত্র, শ্রীরামপুরের একটি যন্ত্রের অনুকরণে। কৃষ্ণচন্দ্র প্রকাশিত বাংলা-পঞ্জিকার কথা বলতে গিয়ে ১৮৪৬-এ 'ফ্রেন্ড অফ ইন্ডিয়া' এই মুদ্রাযন্ত্রটিরও উল্লেখ করেছিল[৯] :

The most popular Almanack is that published in this town by our spirited punch cutter, who has cut his own punches, cast his own types, manufactured his own iron press, and engraved with his own hand the veritable effigies of the gods and godesses which adorn his work.



# ধোঁয়া কলের ‘না’ : অগ্নিদানব
## ডায়না

১৮৪৩। রাজনারায়ণ বসু তখন কলেজের প্রথম বছরের ছাত্র। পুজোর ছুটিতে রামগোপাল ঘোষের স্টিমার ‘লোটাস’-এ চড়ে দেশভ্রমণে বের হয়েছেন। কলকাতা থেকে যাত্রা শুরু করে দুঃসাহসিক ভ্রমণকারীরা রাজমহল পেরিয়ে তখন মহানন্দায় প্রবেশ করেছেন[১] :

“যখন মহানন্দা নদীর ভিতর স্টীমার অগ্রসর হইতে লাগিল তখন গ্রাম্য লোকেরা ধোঁয়া কলের লা এয়েছেরে, ধোঁয়া কলের লা এয়েছেরে বলিয়া তীরে আসিয়া বাষ্পীয় পোত দর্শন করিতে লাগিল। ইহার পূর্বে বাষ্পীয় পোত কখন মহানন্দার ভিতর প্রবেশ করে নাই। লোকে তাহা দেখিয়া বিস্ময়ান্বিত হইল এবং আমাদিগকে কোন শ্রেষ্ঠতর লোক হইতে সমাগত অদ্ভুত জীব মনে করিল। স্টীমার হইতে যখন প্রথমে কেহ দুধ কিনিতে যাইত, তখন সে গিয়া দেখিত যে গ্রামের সমস্ত লোক পলায়ন করিয়াছে, গ্রাম শূন্য পড়িয়া আছে। একি ব্যাপার ! আমরা ইহা দেখিয়া মনে করিলাম যে, আমরা কলম্বস ও তাঁহার সঙ্গীর ন্যায় কোন একটা নূতন আমেরিকা আবিষ্কার করিয়াছি ; ও সেই আমেরিকাবাসী ইন্ডিয়ানগণ আমাদিগের সম্মুখ হইতে পলায়ন করিতেছে।.... যখন আমরা ভোলাঘাট নামক স্থানের সম্মুখে পৌঁছিলাম, তখন আমরা একটি ‘কড়কড়ে পানীতে’ (র‍্যাপিড) পড়িলাম। স্টীমার কোন মতে আর অগ্রসর হয় না। আমরা রামগোপালবাবুকে বলিলাম, ‘আর অগ্রসর হইবার আবশ্যক নাই, ঘরে ফিরিয়া যাওয়া যাক।’ রামগোপালবাবু অসম-সাহসিক কার্যসকল করিতে বড় ভালবাসিতেন। তিনি বলিলেন, ‘ফিরিয়া যাওয়া আমাদের অভিধানে লেখে না, স্টীমারের কলে সম্পূর্ণ

জোর দিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। তাহাতে বইল (বয়লার) ফাটিয়া আমরা যদি আকাশে উড়িয়া যাই, তাহাতে ক্ষতি নাই।' স্টীমারের পূর্ণ জোর দিবার পূর্বে স্টীমার হালকি করিবার জন্য স্টীমারের অধিকাংশ জিনিসপত্র জালিবোটে করিয়া তীরে নামান হইল। স্টীমার স্বকীয় কলে সম্পূর্ণ জোর পাইয়া ভয়ানক গাঢ় বাষ্পরাশি পুনঃ পুনঃ উদ্গিরণ করত ঈশ্বরেচ্ছায় 'কড়কড়ে পানী' কোন প্রকারে পার হইল। নদীর দুই তীরে লোকে লোকারণ্য ;যেমন পার হইল অমনি রামগোপলবাবু রামমোহন রায়ের গান ধরিলেন, 'ভয় করিলে যাঁরে না থাকে অন্যের ভয়', কেবল 'অন্যের' শব্দ পরিবর্তন করিয়া 'জলের' এই শব্দ ব্যবহার করিয়া গান গাইতে লাগিলেন—'ভয় করিলে যাঁরে না থাকে জলেরই ভয়'।"

সে-যুগের এই আগুন কলের 'না' বা 'কলের নৌকা' শান্তিপুরের তাঁতীদেরও বিস্মিত করেছিল। আশুতোষ মিউজিয়ামে গেলেই দেখা যাবে জমকালো শাড়ির আঁচলে চিমনিওলা নৌকা যার মাঝখানে খোলের দু'ধারে আঁটা বড়-বড় দুটো চাকা। আগুন-কল এই চাকা ঘুরিয়ে জল কেটে নৌকাকে এগিয়ে নিয়ে যেত। বাংলার মন্দিরের পোড়ামাটির কারুকার্যে বা কালীঘাটের পটেও 'কলের নৌকা' দেখতে পাওয়া যায়।

লিথোগ্রাফে কালীঘাটের পট সৃষ্টির ব্যাপারে উনিশ শতকের মধ্যভাগে বেচারাম দাস একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। লিথো ও জলরঙের সমন্বয়ে তিনি একটি প্যাডেল স্টিমারেরও ছবি আঁকেন। ছবির মধ্যে সবচেয়ে আশ্চর্য হলো, স্টিমারের পাটাতনের উপর তার ইঞ্জিনটিকে বসিয়ে দেওয়া।[২] প্রথমত, স্টিমারের ইঞ্জিন সব সময়েই তার খোলের ভেতরে থাকে এবং দ্বিতীয়ত, স্টিমারের ইঞ্জিন কস্মিনকালেও এরকম ছিল না। বেচারাম যে-ইঞ্জিনের ইঙ্গিত দিয়েছেন, সেটি সম্ভবত তিনি কোনো কারখানায় দেখে থাকবেন, কারণ এটি হচ্ছে 'স্টেশনারি' গোত্রের বিম্ ইঞ্জিন। পরবর্তী অধ্যায়ে দ্বারকানাথ ঠাকুরের আমলের এরকম একটি ইঞ্জিনের কথা আলোচিত হবে। সম্ভবত 'অজ্ঞ' দর্শকদের শিক্ষা দেওয়ার জন্যই বেচারাম স্টিমারের ইঞ্জিনটিকে ডেক-এ স্থাপন করেছিলেন।

ভারতের নদীতে স্টিমারের প্রথম আবির্ভাব ১৮১৯-এ। গোমতী নদীতে ছোট্ট এই স্টিমারটি ছিল অযোধ্যার নবাব গাজিউদ্দীন হায়দারের খেলনাবিশেষ।[৩] ১৮১৬ খ্রীস্টাব্দে নবাবের আমন্ত্রণে জেসপ কোম্পানি প্রতিষ্ঠাতা হেনরি জেসপ তাঁর দুই সহকারী, উইলিয়াম বার্টন ও উইলিয়াম ট্রিকেট-কে সঙ্গে নিয়ে লক্ষ্ণৌ আসেন একটি লোহার সেতু নির্মাণের জন্য। নবাব তখন জেসপ-কে তাঁর জন্য একটি স্টিম বোট তৈরি করে দিতে বলেন। শ্রফশায়ারের বাটার্‌লি ওয়ার্কস নামে কারখানা থেকে একটি আট অশ্বশক্তির স্টিম ইঞ্জিন ও বাষ্পীয় নৌকার নকশা আনানো হয়। নৌকাটি প্রস্তুত করেন ট্রিকেট। পঞ্চাশ ফিট লম্বা নৌকাটির সর্বাধিক প্রস্থ ছিল নয় ফিট এবং উচ্চতা চার ফিট। বয়লারে কয়লার বদলে কাঠ পুড়িয়ে বাষ্প উৎপন্ন হতো। জানা যায় ঘণ্টায় সাত বা আট মাইল জোরে চলতে পারত নৌকাটি। নৌকাটিতে দুটি ঘুরন্ত কামান বসানো ছিল।[৪] বিশপ হেবার লিখেছেন, সেটিকে 'ব্রিগ অফ ওয়ার'-এর মতো দেখাত। নবাবের অধীনস্থ এক ইংরেজ ইঞ্জিনিয়ার না কি 'স্পাইরাল হুইল' সংযুক্ত নতুন ধরনের একটি জলযানও তৈরি করেছিলেন।[৫] ১৮৩৭ খ্রীস্টাব্দেও নবাবের খেলনা স্টিমারটি চালু ছিল। লর্ড অকল্যান্ড সেটি পরিদর্শন করবেন বলে তাকে সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখা হয়।[৬]

King of Oude's STEAMER
Built at Lucknow

Drawn on Stone by J.B.A. Tassin — Printed at the Gov. Lith.c Press

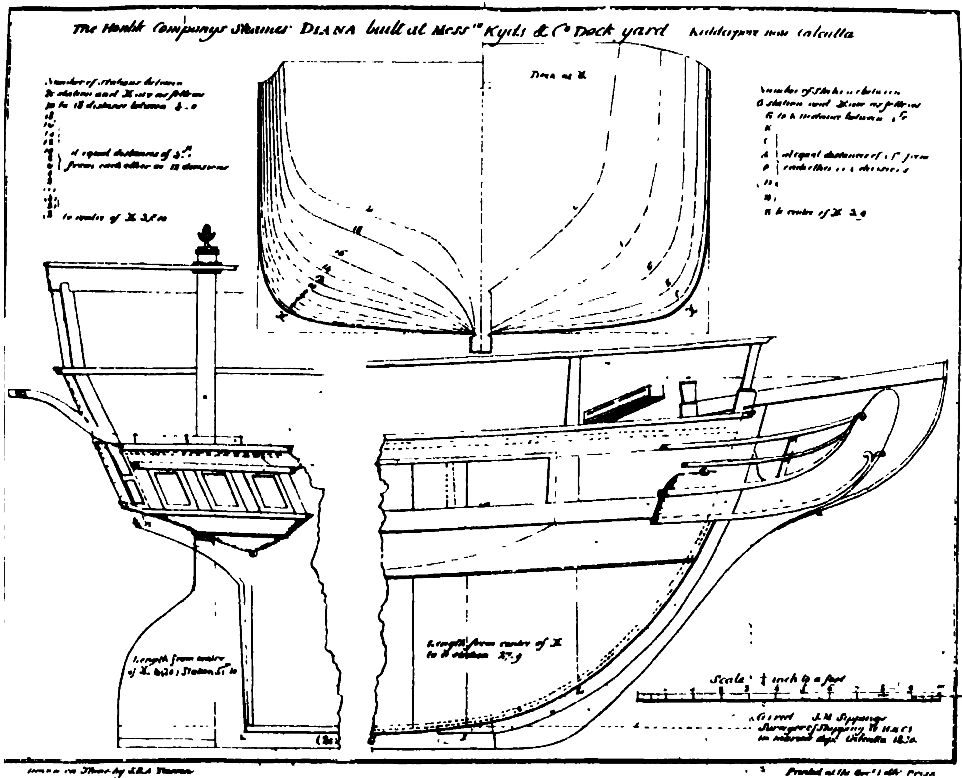
Plan of the Hull of the K g o Oude s steame f om P sep G A An account of stean vessels

গাজি উদ্দীন হায়দাব-এব স্টিমাবেব নকশা

খেযালখুশিব খেলনা হলেও নবাবেব এই স্টিমাব যখন তৈবি হয পুবো ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে মাত্র বত্রিশটি বাষ্পীয জলযান ছিল।[৭]

গঙ্গায বাষ্পীয নৌকা প্রবর্তনেব প্রথম পবিকল্পনা পেশ কবেছিলেন স্বযং ববার্ট ফুলটন। কুইজ প্রতিযোগিতাব দৌলতে যিনি স্টিমাবেব আবিষ্কর্তাব সিংহাসনটি লাভ কবেছেন। ১৮১২-ব ১৬ এপ্রিল তিনি টমাস ল-কে লেখা একটি চিঠিতে জানান যে, বছব কুডিব মতো একটি মৌরুসিপাট্টা পেলে ও টাকাপযসাব ব্যবস্থা হলে, টমাসেব সঙ্গে যৌথভাবে তিনি ব্যবসাযে নামতে প্রস্তুত।[৮] ফুলটনেব মতে

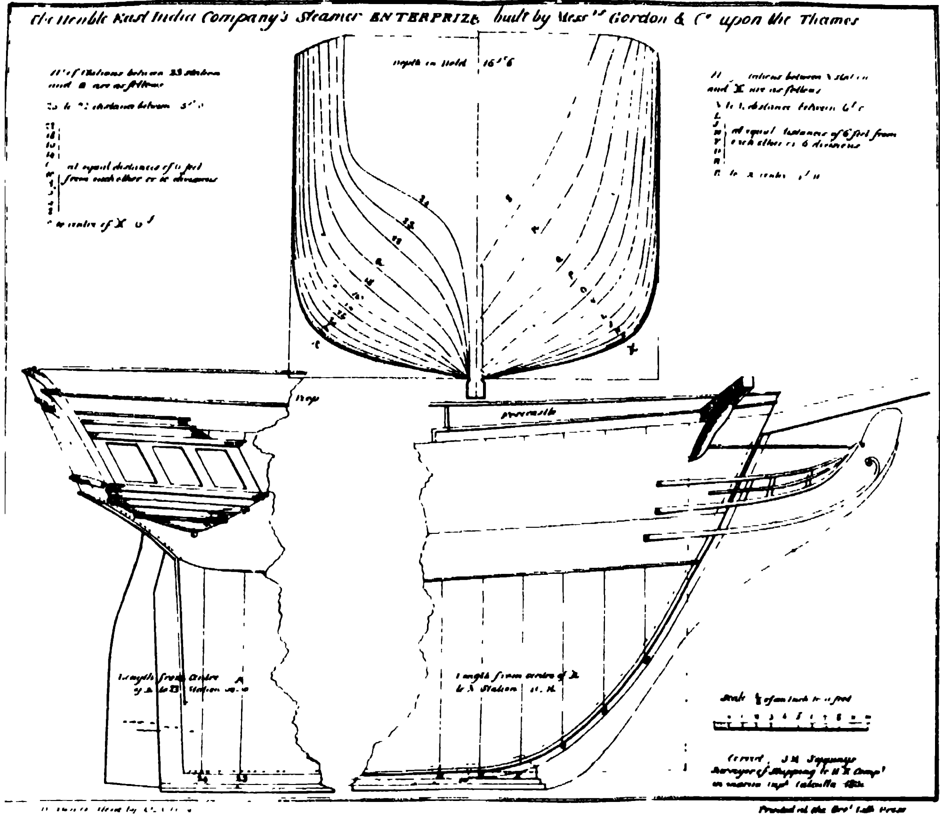
This work is so honourable and important, it is so grand an idea that Americans should establish steam vessels to work in India—that it requires vigor, activity, exertion, industry, attention—and that no time should be lost




ডায়না-র নকশা

এখানেও থামেননি ফুলটন। ১৮১৩-য় এক দূতের হাত দিয়ে লন্ডনের এক ব্যাঙ্ক-মালিকের কাছে চিঠি পাঠালেন। এই ব্যাঙ্ক-মালিক ছিলেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির তদানীন্তন গর্ভনর-জেনারেলের বন্ধু। কলকাতা থেকে পাটনা অবধি মালপত্র ও যাত্রী-পরিবহনের জন্য স্টিমার-লাইন প্রবর্তনের প্রস্তাব পেশ করেছিলেন ফুলটন। তিনি উল্লেখ করেছিলেন, শুধু যাত্রী নয়, সৈন্যসাবুদ ও দেশের উৎপাদন ও কাঁচামাল পরিবহণেও এই ব্যবস্থা হবে অত্যন্ত কার্যকর। তিনি বারবার দাবি করেন, যে-কোম্পানি প্রথম এই স্টিমার-লাইন চালু করবে, সে যেন কুড়ি বছরের জন্য মৌরুসিপাট্টা পায়। তা হলে পরিবহণ কোম্পানির লাভের অঙ্কটাও হবে বিপুল। কিন্তু ফুলটনের পরিকল্পনা শুধু স্বপ্নই রয়ে গিয়েছিল।[৯]

কলকাতার জলপথে প্রথম যে বাষ্পীয় তরী দেখা দেয়, সেটি যাত্রী বহনের কাজে ব্যবহার হয়নি, হয়েছিল গঙ্গাবক্ষের পলিমাটি অপসারণের জন্য—ড্রেজিঙের কাজে। বার্মিংহামের ঈগল ফাউন্ড্রিতে উইলিয়াম ব্রান্টনের তৈরি একটি আট অশ্বশক্তির ইঞ্জিন কলকাতায় আমদানি করেন বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ার্সের ক্যাপ্টেন ডেভিডসন। ১৮১৭ বা ১৮১৮ থেকে দীর্ঘকাল গুদামজাত হয়ে পড়ে থাকার

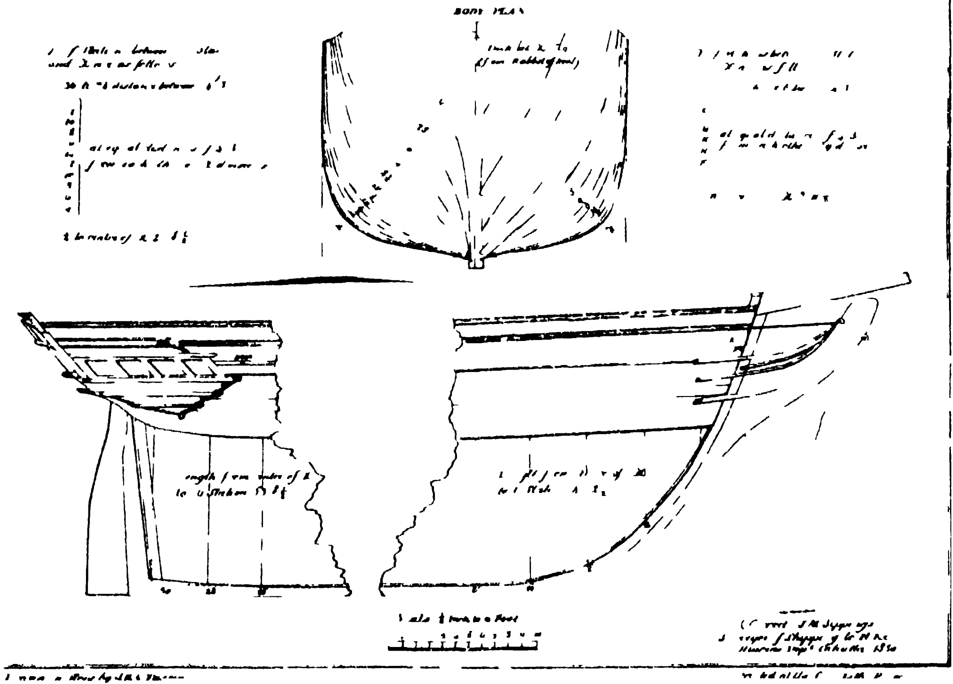


এন্টারপ্রাইজ-এর নকশা

পর কীড অ্যান্ড কোম্পানি এই ইঞ্জিন সংযুক্ত একটি ড্রেজিং স্টিমার তৈরি করে ১৮২২-এ। পরে যেটি 'প্লুটো' নামে পরিচিত হয়।[১০]

তবে কীড কোম্পানির আরও বড় অবদান, কলকাতা তথা ভারতের প্রথম সার্থক স্টিমার 'ডায়না' কে জলে ভাসানো।

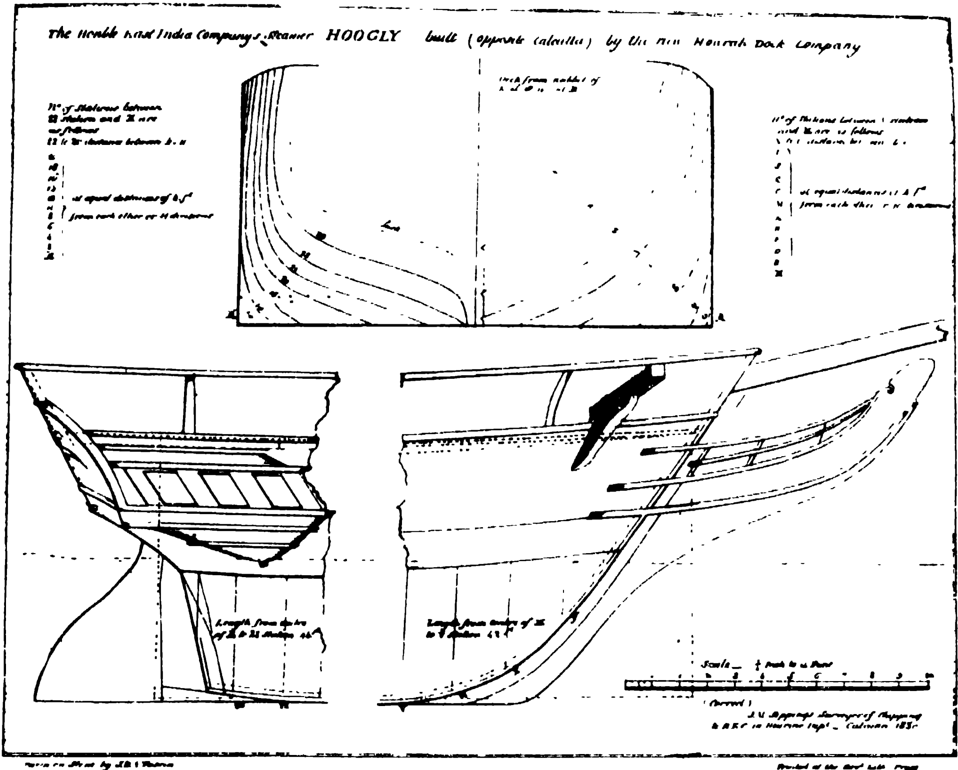
জে· টি· রবার্টস নামে ক্যান্টনের কারখানার এক পরিচালক ১৮২২ খ্রীস্টাব্দে ইংলন্ড থেকে মড্‌সলি অ্যান্ড কোম্পানির তৈরি দুটি ষোল অশ্বশক্তির ইঞ্জিন, একটি তামার বয়লার ও অন্যান্য যন্ত্রাংশ চীনে আমদানি করেন। উদ্দেশ্য ১১০ টনের একটি বাষ্পীয় তরী নির্মাণ। কিন্তু হঠাৎ শারীরিক বিপত্তি ঘটায় সব যন্ত্রাংশ তিনি কলকাতায় পাঠিয়ে দেন। প্রথমে পঁয়ষট্টি হাজার টাকা দামে হেস্টিংস-সরকারকে সেগুলি কিনে নেওয়ার জন্য আবেদন জানানো হয়। কিন্তু কোনো সাড়া পাওয়া যায় না। কলকাতার ব্যবসাদাররা তখন অগ্রণী হন এবং এক হাজার টাকা দামের পঁয়ষট্টিটি শেয়ার বিভিন্ন এজেন্সি হাউস কিনে নেয়। এর মধ্যে স্টিমারের নতুন খোল বানানোর জন্য ধার্য হয় পনের




ফোর্বস-এর নকশা

হাজার টাকা। কারণ, ওক কাঠের তৈরি মূল খোলটি ততদিনে ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে গিয়েছে। এরপরেও আরও পাঁচ হাজার টাকা তুলতে হয় শেয়ারহোল্ডারদের কাছ থেকে। ১৮২৩-এর ১২ জুলাই খিদিরপুরে কীড অ্যান্ড কোম্পানির জাহাজঘাটা থেকে 'ডায়না' জলস্পর্শ করে। মূল জাহাজের খোলে দেবী ডায়না-র যে ফিগার হেড ছিল, তারই খাতিরে স্টিমারটির নামকরণ। ডায়না-র পরিচালক (কম্যান্ডার) নিযুক্ত হন ক্যাপ্টেন জে অ্যান্ডারসন। ইংলন্ড থেকে চীনে মেশিনপত্র আমদানি এবং তারপরে কলকাতাতেও নির্মাণপর্বে তদারকি—প্রথম থেকেই এই কাজে নিযুক্ত ছিলেন অ্যান্ডারসন।[১১]

ডায়না-র দু'ধারে স্টিম ইঞ্জিন চালিত প্যাডেল হুইল লাগানো থাকলেও, পাল খাটানোর ব্যবস্থাও ছিল। পালের বিন্যাস অনুসারে এটি 'কাটার' গোত্রে পড়ে। ডায়না-র চিমনি ছিল প্রায় পঁয়তাল্লিশ ফিট উঁচু। ডেকের ওপর তেত্রিশ ফিট লম্বা বসার কেবিন ছিল যার আগাগোড়া খড়খড়ি বসানো। ডেকের নীচে বসার জায়গাটা দুটি কেবিনে বিভক্ত করা হয়। প্রধানত মহিলা যাত্রীদের জন্য।[১২]



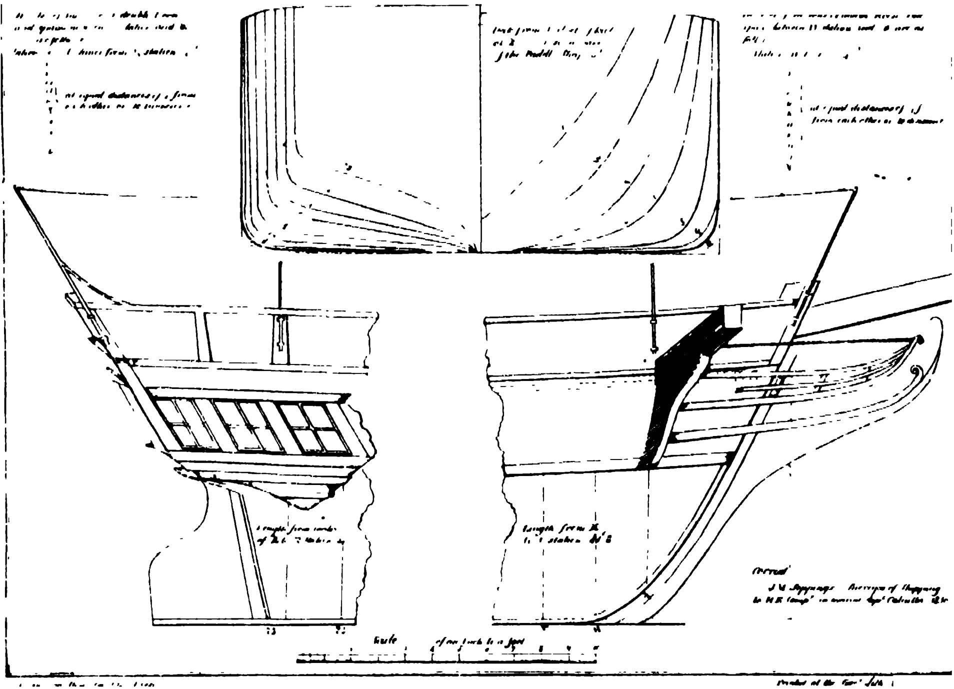

হুগলি-র নকশা

জলে ভাসার সপ্তাহখানেক পরে কলকাতার সংবাদপত্র 'জন বুল' লিখেছিল, "বাষ্পীয় তরীটিকে এখন প্রতিদিন হুগলীতে চলাফেরা করতে দেখা যায় এবং নেটিভরা দলে দলে দু' পাড়ে এসে ভিড় জমায় এই তাজ্জব কান্ড, নৌকাটির বিস্ময়কর হালচাল দেখার জন্য।"

এই পত্রিকা ডায়না-কে স্বাগত জানিয়ে লিখেছিল, "(ডায়না) নদীর একটি অলংকার স্বরূপ। এই জাতীয় ভবিষ্যৎ পরিবহণের পথিকৃৎ হিসাবে আমরা তাকে বরণ করছি।"[১৩]

শুধু প্রমোদ উপকরণ বা অভিনবত্ব নয়, তার গতির কথা, জোয়ার-ভাঁটার বিরুদ্ধে অনায়াসে চলাচলের সামর্থ্যের কথাও সেকালের পত্রিকায় বারবার উল্লেখ করা হয়েছে।

স্বচ্ছন্দগতি ডায়না খেজুরি, সাগর রোড থেকে কলকাতা অবধি যাত্রী-পরিবহণে তার যোগ্যতা প্রমাণ করলেও শুধু যাত্রী-ভাড়া থেকে খরচ-খরচা উঠত না। পরবর্তী অধ্যায়ে গঙ্গায় নিযুক্ত যাবতীয় স্টিমার সমুদ্রের মোহনা থেকে ভারী জাহাজ টেনে আনার কাজেই ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু জাহাজ টেনে আনার মতো ক্ষমতা ছোট্ট ডায়না-র ছিল না। ডায়না-র মালিকরা ক্রমেই লোকসান দিতে-দিতে যখন অতিষ্ঠ, হঠাৎ নৌকা বেচার একটা সুযোগ এসে গেল। প্রথম বর্মীয় যুদ্ধ বাধার পর, ১৮২৫-এর



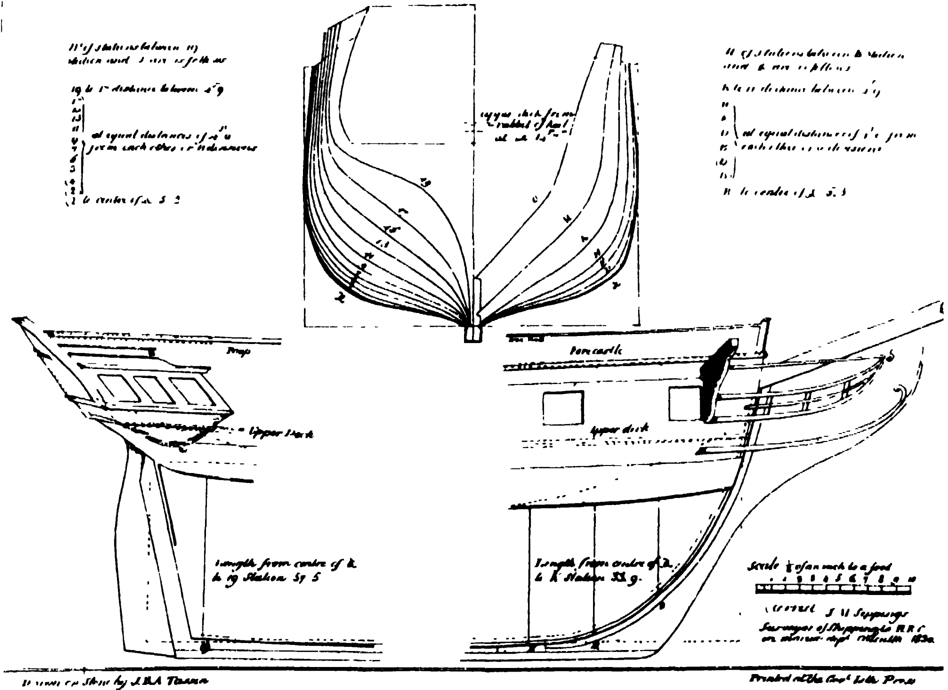

বারহামপুত্‌র-এর নকশা

এপ্রিলে আশি হাজার টাকায় সেটিকে কিনে নিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি।[১৪]

ডায়না বিক্রি হয়ে যাওয়ার পর তার পরিচালক অ্যান্ডারসনের ধারণা হয় যে, আরও ছোট আকারের স্টিমার তৈরি করতে পারলে শুধু যাত্রী-পরিহবণের কাজেও তা লাভজনক হতে পারে। কারণ, জ্বালানি-খরচা পড়বে কম। অ্যান্ডারসন দেশী সূত্রধরদের সাহায্যে এরকম দুটি স্টিমার তৈরি করেন—'কমেট' ও 'ফায়ারফ্লাই'। ১৮২৬-এর সেপ্টেম্বরে তারা জলস্পর্শ করে।[১৫]

ডায়না-র বিক্রম টের পাওয়া গেল প্রথম বর্মীয় যুদ্ধে। কলকাতার প্রথম সার্থকনামা কলের নৌকা ডায়না শুধু ভারতের নয়, ব্রিটিশ নৌ-শক্তির মধ্যেও প্রথম বাষ্পচালিত গান-বোট বা রণতরী।[১৬]

১৮২৪-এ সার আর্কিব্যাল্ড ক্যাম্পবেল-এর নেতৃত্বে ব্রিটিশ বাহিনী জলপথে বর্মার উদ্দেশে রওনা হয়। উল্লেখযোগ্য, এই বাহিনীতে ছিলেন ঔপন্যাসিক ক্যাপ্টেন ফ্রেডেরিক মেরিয়াট। আন্দামানের পোর্ট কর্নওয়ালিসে সম্মিলিত হওয়ার পর ১৮২৪-এর ৫ মে নৌবাহিনী রওনা হয় রেঙ্গুন অভিমুখে। ১১ মে, মাত্র কুড়ি মিনিটের মধ্যে রেঙ্গুন দখলে রকেট নিক্ষেপকারী ডায়না একটি

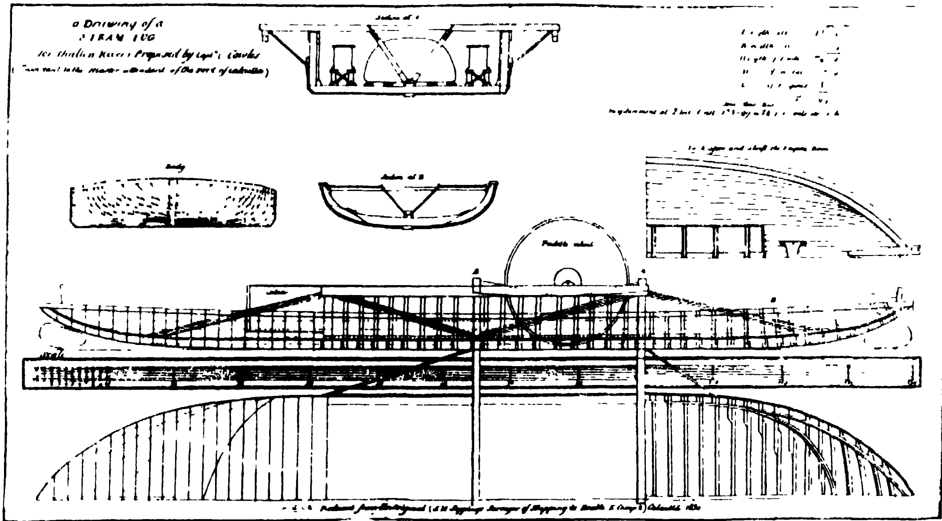


ইরাবদ্দি ও গ্যাঞ্জেস-এর নকশা

অভূতপূর্ব ভূমিকা নিয়েছিল। স্বয়ং আর্কিব্যাল্ড ক্যাম্পবেলের ডেসপ্যাচ থেকে জানা যায়, স্রোতের বিপক্ষেও ডায়না-র আকস্মিক গতিবিধি, দাঁড়-টানায় যতই সুদক্ষ হোক, বর্মীয়দের বিভ্রান্ত করে দিয়েছিল।[১৭]

ডায়না বর্মীয়দের মধ্যে কিরকম আতঙ্ক সৃষ্টি করেছিল তার একটি বর্ণনা আছে 'এন্টারপ্রাইজ' নামে বাষ্পীয় জাহাজের প্রধান ইঞ্জিনিয়ার উইলিয়াম অ্যাশ-এর একটি চিঠিতে। এই চিঠিটি দুটি কারণে ঐতিহাসিক মূল্যসমৃদ্ধ। এক, এন্টারপ্রাইজ-ই প্রথম বাষ্পীয় জাহাজ, যা ইংলন্ড থেকে ভারতে এসে পৌঁছয়। দুই, অ্যাশ-এর চিঠিটি, সমুদ্রগামী বাষ্পীয় ইঞ্জিনিয়ারদের লেখা যাবতীয় চিঠির মধ্যে প্রাচীনতম সংরক্ষিত নিদর্শন।[১৮]

কলকাতা থেকে অ্যাশ-এর চিঠিটি লন্ডনে তাঁর মালিক মড্‌সলি-র কাছে পৌঁছয় ১৮২৮-এর ২৩ জুলাই। হেনরি মড্‌সলি কোম্পানি শুধু এন্টারপ্রাইজ নয়, ডায়নারও ইঞ্জিন-নির্মাতা। স্বাভাবিক ভাবেই অ্যাশ-এর চিঠিতে ডায়না-প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে। অ্যাশ লিখছেন, "বার্মিজদের সাম্রাজ্যে একটা বিশাল ঘণ্টা আছে·····কয়েক বছর আগে তারা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল যে, যতদিন না কেউ ওই




ক্যাপ্টেন কাউল্‌স-এর স্টিম টাগ-এর নকশা

ঘণ্টাটা সরিয়ে নিয়ে যেতে পারছে আর যতদিন না দাঁড় ও পাল ছাড়াও কোনো বিরাট নৌকা নদীতে চলাচল শুরু করছে, তাদের দেশকে কেউ পরাজিত করতে পারবে না। ডায়না এই কাজটাই করেছে এবং তাকে ওরা 'মেরটেম্‌বো'—অগ্নিদানব নাম দিয়েছে⋯"

অ্যাশ-এর চিঠি থেকে জানা যায়, ডায়না-র ইঞ্জিনিয়ার ডারওয়েল-এর একটি পা কাটা গিয়েছিল স্টিম ইঞ্জিনের মধ্যে আটকে পড়ায়। সেকালের স্টিমারের যান্ত্রিক সমস্যার বর্ণনা, লেদ মেশিন ও ট্যাপ-এর ব্যবহার-বিধি ইত্যাদি সংবলিত অ্যাশ-এর চিঠিটি কারিগরি ইতিহাসের এক অসামান্য দলিল। (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)।

ডায়না-কে ঘিরে একটি চিত্র-দলিল রচনা করেন বর্মীয় যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী জোসেফ মুর। 'দা বার্মান এম্পায়ার—এইট্টিন ভিউজ টেকন অ্যাট অর নিয়ার রেঙ্গুন' নামে ১৮২৫-২৬ খ্রীস্টাব্দে এই সৈনিক চিত্রকরের আঁকা একটি অ্যালবাম প্রকাশিত হয় লণ্ডন থেকে। রঙিন এনগ্রেভিং চিত্র। প্রথম ছবিটিতে পোর্ট অফ কর্নওয়ালিশ-এ সমবেত জাহাজের মধ্যে এক নজরেই ডায়না-কে চিনে নেওয়া যায় লম্বা চিমনি আর গায়ে-আঁটা চাকার দৌলতে। 'কনফ্লাগ্রেশন ডাল্‌লা অন দা রেঙ্গুন রিভার' নামে নবম প্লেটে ডায়নার বহিরঙ্গটির নিপুণ বর্ণনা। দশম প্লেটটি নাটকীয়। ১৮২৪-এর ৮ জুলাই ধোঁয়া ছাড়তে-ছাড়তে ডায়না ছুটে চলেছে আক্রমণে। লক্ষ্য প্যাগোডা পয়েন্ট। ডায়না-র ডেকের ওপর সৈন্যরা দাঁড়িয়ে, রণতরীর পিছনে ফ্ল্যাগপোস্টে পতপত করে উড়ছে ব্রিটিশ পতাকা। ষোল নম্বর ছবিতে দেখা যাচ্ছে ডায়না দুটি পতাকা তুলে এবং সেইসঙ্গে ধোঁয়া উদ্গিরণ করতে-করতে ছুটে চলেছে আর তার সম্মুখভাগ থেকে চারটি কামান অগ্নিবর্ষণ করছে।

যুদ্ধের পরেও ডায়না-কে কলকাতায় ফিরিয়ে আনা হয়নি। আনা হল ১৮৩১-এ, মেরামতির

জন্য। সে-সময়ে 'সমাচার দর্পণ'-ও ডায়নার সামরিক ভূমিকার উল্লেখ করে, "ভারতবর্ষের মধ্যে ঐ ক্ষুদ্র বাষ্পের জাহাজ প্রথম আগত হয়। বাৰ্ম্মারি যুদ্ধারম্ভের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে ঐ জাহাজ নিৰ্ম্মিত হইয়াছে। পরে গবর্নমেন্ট কর্তৃক ক্রীত হইয়া ঐরাবতী নদী দিয়া গমনাগমন করে এবং ঐ জাহাজের দ্বারা বৰ্ম্মারি যুদ্ধে মহোপকার হয় কেবল ইহা নহে কিন্তু ভারতবর্ষে ঐ বাষ্পের জাহাজ প্রথম যুদ্ধ ব্যাপারে নিযুক্ত হয় ইহা বলিয়া লোকসকল তাহার উল্লেখেতে উল্লসিত হয়।"[১৯]

বর্মীয় যুদ্ধে ডায়না ও তারপরে এন্টারপ্রাইজ-এর সাফল্যই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে ভারতের নদীতে স্টিমার প্রচলনে উৎসাহিত করে। বাণিজ্যিক কারণটা তখনও তত গুরুত্বপূর্ণ ছিল না, মূল প্রয়োজনটা ছিল সামরিক। মনে রাখা দরকার, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ডাইরেক্টররা অনেকেই ছিলেন পালতোলা 'ইস্ট ইন্ডিয়াম্যান' জাহাজের মালিক। ব্যবসায়িক স্বার্থহানির আশঙ্কায় বাষ্পীয় জাহাজের প্রচলনকে তাঁরা ভাল চোখে দেখেননি।

'সমাচার দর্পণ' লিখেছিল, "যে বাষ্পীয় জাহাজ কেপ ঘুরিয়া প্রথম ভারতবর্ষে পঁহুছে সে এন্টারপ্রায়িজ জাহাজ।"[২০] বর্মার যুদ্ধ চলার সময়েই, ১৮২৫-এর ১৬ আগস্ট জাহাজটি ফলমাউথ থেকে সতের জন যাত্রী ও কিছু মালপত্র নিয়ে যাত্রা শুরু করে। কলকাতায় পৌঁছয় ৯ ডিসেম্বর। ১৩,৭০০ মাইল দীর্ঘ যাত্রাপথে ৬৪ দিন সেটি বাষ্পীয় শক্তি ব্যবহার করেছিল। অন্য সময়ে হাওয়া অনুকূলে থাকলে পাল তুলে পাড়ি। এটিও ছিল কাঠের খোলের প্যাডেল-হুইল জাহাজ। লম্বায় মাত্র একশো একচল্লিশ ও চওড়ায় সাড়ে সাতাশ ফিট। একজোড়া ষাট অশ্বশক্তি-সম্পন্ন ইঞ্জিনের সঙ্গে যুক্ত ছিল কুড়ি ফিট ব্যাসের জল-কাটার প্যাডেল।[২১]

কলের শহর কলকাতার ইতিহাসে এন্টারপ্রাইজ-এর চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ এই জাহাজের কম্যান্ডার---লেফটেন্যান্ট জেমস হেনরি জনস্টন। উনিশ শতকের কলকাতার সরকারি ইঞ্জিনিয়ারদের মধ্যে সবচেয়ে ডাকসাইটে দু'জনের অন্যতম। দ্বিতীয়জন, ফর্বসের কথা আগেই বলা হয়েছে। এই দু'জনের হাতেই গড়ে উঠেছিল কলকাতা-কেন্দ্রিক পূর্ব ভারতের জলপথে সরকারি বাষ্পীয় পরিবহণ-ব্যবস্থা। জনস্টন তাঁর বাষ্পীয় মেহনতের জন্য 'স্টিম জনস্টন'---এই ডাকনাম অর্জন করেছিলেন।[২২]

কিন্তু জনস্টনের ব্যক্তিগত কেরিয়ারের আলেখ্য যতই উজ্জ্বল হোক, তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাষ্পীয় জাহাজের আগমন কলকাতার শিল্পক্ষেত্রে কী পরিবর্তন সূচিত করল, তার হদিস লাভের চেষ্টা। সেই ডায়না-র আমল থেকে শুরু করে আমরা দেখতে পাই, কলকাতার জাহাজঘাটায় স্টিমার তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। ইঞ্জিনটাই শুধু আমদানি করা হতো বিদেশ থেকে। ১৮৩০ অবধি ব্রিটিশ-ভারতে নিযুক্ত স্টিমারের ফর্দটিই অকথিত কাহিনী পেশ করবে[২৩] :

| স্টিমারের নাম | অশ্বশক্তি | নির্মাতা |
|---|---|---|
| কমেট ও ফায়ারফ্লাই (প্রাইভেট) | ২০ (প্রতিটি) | জে· অ্যান্ডারসন, খিদিরপুর, ১৮২৬ |
| এমিউলাস (প্রাইভেট টাগ বোট) | ১০০ | ইভানস, টেমস নদী, ১৮২৫ |
| ফর্বস (প্রাইভেট) | ১২০ | ডব্লিউ এন ফর্বস, হাওড়া ডক কোম্পানি ১৮২৯ |
| ডায়না | ৩২ | কীড অ্যান্ড কোম্পানি, খিদিরপুর, ১৮২৩ |
| এন্টারপ্রাইজ | ১২০ | গর্ডন, ডেন্টফোর্ড, ১৮২৫ |
| ইরাবর্দী ও গ্যাঞ্জেস | ৮০ (প্রতিটি) | কীড অ্যান্ড কোম্পানি, খিদিরপুর, ১৮২৬-২৭ |
| টেলিকা | ৫০ | হাম্বল অ্যান্ড হারি, লিভারপুর, ১৮২৪ (দক্ষিণ আমেরিকা হয়ে কলকাতায় আসে, পরে বোম্বে চলে যায়) |
| বারহামপুত্র | ৫০ | কীড অ্যান্ড কোম্পানি, খিদিরপুর, ১৮২৮ |
| হুগলী | ৫০ | হাওড়া ডক কোম্পানি, ১৮২৮ |
| হিউ লিন্ডসে | ১৬০ | কোম্পানিজ ডক ইয়ার্ড-এ মাস্টার বিল্ডার নওরোজি জামসেদজি নির্মিত, বোম্বে, ১৮২৯ |

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, দ্বারকানাথ ঠাকুরের ২৯৪ টনের প্রাইভেট স্টিমার 'দ্বারকানাথ' ১৮৩৯-এ খিদিরপুরে এবং মতিলাল শীলের ৬৫ টনের স্টিমার 'বানিয়ান' ১৮৩৬-এ হাওড়ায় তৈরি হয়েছিল। ১৮৩৯ অবধি কলকাতার প্রাইভেট স্টিমারগুলির মধ্যে 'দ্বারকানাথ'ই বৃহত্তম।[২৪]

১৮৩৪ অবধি, স্টিমারের আগমনের পরেও কলকাতার জাহাজ-নির্মাণ শিল্পের কাজে তেমন ভাটা পড়েনি। ভাটার সূচনা করল লোহার তৈরি স্টিমার 'লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক'-এর আগমন। ১৮৩৪-এর আগে অবধি কাঠের খোলের স্টিমার চলছিল, এবার একে-একে 'টেমস', 'মেঘনা', 'যমুনা' ইত্যাদি লৌহ-স্টিমার পুরো তৈরি হয়ে আসতে লাগল ইংলন্ড থেকে।

কলকাতার প্রথম গুরুত্বপূর্ণ শিল্প—জাহাজ কারখানার উৎপাদনের একটি পরিসংখ্যান থেকেই এই ধ্বংসলীলার চেহারা ফুটে উঠবে। ১৭৬৯-এ প্রথম জাহাজ নির্মাণের পর থেকে ১৮২১ অবধি ২৭২টি জাহাজ তৈরি হয় কলকাতায়। এরপর বিলিতি জাহাজের আগমন উৎপাদন ব্যাহত করলেও

উইলিয়াম অ্যাশ-এর চিঠি থেকে

তা পুরোপুরি বন্ধ হয়নি । শুধু তাই নয়, স্টিমার নির্মাণের আদি পর্বেই দেশী কাবিগবদেব দক্ষতার যে পরিচয় মিলেছিল, তাতে আগামী বাষ্পের যুগে, এই শিল্পে কলকাতার পথিকৃতেব ভূমিকাই

স্বাভাবিকভাবে প্রাপ্য ছিল। কিন্তু উপনিবেশের শিল্পায়ন স্বাভাবিক নিয়মের অনুসারী নয়। আধুনিক পদ্ধতিতে লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদন ভারতে ঠেকিয়ে রাখা হয়েছিল বিংশ শতাব্দী অবধি। ফলে জাহাজ-নির্মাণ বন্ধ করে জাহাজ-ঘাঁটিগুলো হয়ে উঠল মেরামতির কারখানা।[২৫]

১৮৩৬-এ মৃত্যু হয় জেমস কীড-এর। সে-বছরেই 'ক্যালকাটা ডকিং কোম্পানি' নামে একটি নতুন সংস্থা গঠিত হয়। অংশীদারদের মধ্যে দু'জন ছিলেন ভারতীয়, পার্শি ব্যবসাদার রুস্তমজী কাওয়াসজি ও দ্বারকানাথ ঠাকুর। এই কোম্পানি খিদিরপুরের ডক ইয়ার্ড ও হাওড়া ডকিং কোম্পানি—দুটিই কিনে নেয়। ১৮৩৭-এ ক্যালকাটা ডকিং কোম্পানি খিদিরপুর ডক ইয়ার্ডের পূর্বাংশ গভর্নমেন্ট স্টিম ডিপার্টমেন্টকে বিক্রি করে দিলেও ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝ অবধি তারা ব্যবসা চালিয়ে যায়। কিন্তু প্রধানত মেরামতির, নির্মাণের নয়। অন্যদিকে আধুনিক কেতায় সজ্জিত কলকাতার প্রধান কয়েকটি কারখানার অন্যতম হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে সরকারি স্টিম ডিপার্টমেন্ট, যা মূলত 'স্টিম' জনস্টন ও উইলিয়াম নেয়ার্ন ফর্বেস পরিচালনা করতেন।[২৬]

কলকাতার শিল্পায়নে প্রতিবন্ধকতা যে বিদেশী শাসকরাই সৃষ্টি করেছিল তার সেরা সাক্ষী কলকাতার কারিগরদের কুশলতা। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, দেশী সূত্রধররাই তৈরি করেছিলেন, 'কমেট' ও 'ফায়ারফ্লাই'। বাষ্পীয় জাহাজ মেরামতির সরকারি কারখানার দিকে তাকালেও কলকাতা তার কারিগরদের নিয়ে গর্ব করতে পারে।

১৮৩৮ অবধি সরকারি বাষ্পীয় প্রচেষ্টাকে চালু রাখার জন্য সুপারিন্টেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ার, অ্যাসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ার, ইঞ্জিন ড্রাইভার, বয়লার নির্মাতা, মেকানিক ইত্যাদি মিলিয়ে যে সাতাত্তর জন সাহেব বা ইওরো-এশিয়ান নিযুক্ত হয়েছিল তাদের প্রায় অর্ধেককেই ছাঁটাই করতে হয়েছিল অলস, অকর্মণ্য বা মদ্যপ বলে। প্রয়োজন পড়েছিল বলেই ভারতীয় কারিগরদের বংশানুক্রমিক কারিগরি দক্ষতার শরণ নিতে হয়েছিল। তখন অবশ্য ঐতিহাসিকরা ভারতীয় সমাজের অনগ্রসরতার জন্য পেশা-নির্ভর জাত-বিভাজনকে দায়ী করেননি। ১৮৩৩-এর ডিসেম্বরে জনস্টন একটি চিঠিতে টমাস লাভ পীকক-কে জানাচ্ছেন, "the native workmen I have trained proceed with their work con amore (with love)."[২৭]

'লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক' যখন কলকাতায় জোড়া হচ্ছিল, দুই বিলিতি বয়লার-নির্মাতা কয়েকজন ভারতীয় মিস্ত্রিকে লোহার চাদর রিভেট করার শিক্ষা দেন। সে কাজ আয়ত্ত করতে তাদের কোনো অসুবিধা হয়নি।[২৮] কিন্তু পরিবর্তে ভারতীয় কারিগর সম্প্রদায়, না বাড়তি শিক্ষার সুযোগ পেয়েছেন, না অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য। একটি উদাহরণ দিয়ে প্রসঙ্গ শেষ করছি।

১৮৪০-র মে মাসে বাংলা সরকারের একটি সমুদ্রগামী স্টিমার সিঙ্গাপুরে পৌঁছবার পর তার চালক, মিস্টার বার্টলেট, ব্যক্তিগত কাজে কলকাতায় ফিরে আসেন। স্টিমারের ইঞ্জিন রুমের স্টোকার (কয়লা যোগদানদার) সাম্সের তখন স্টিমারের পরিচালনভার গ্রহণ করেন। বলা হয়, ইঞ্জিন ড্রাইভারের দায়িত্ব পালনে পূর্ণ যোগ্যতা আছে তাঁর। বার্টলেট-এর মাইনে ছিল মাসে একশো পঁচিশ টাকা, কিন্তু সতের টাকা বেতনের সামসের সাময়িকভাবে এই দায়িত্ব গ্রহণ করার পরেও মাত্র তিরিশ টাকা পেলেন।[২৯]

এটাও বলা দরকার, বার্টলেট ছিলেন ইওরো-এশিয়ান। ১৮৩৩-এ যে বিলিতি ইঞ্জিন ড্রাইভারদের আনা হয়েছিল তারা মাসে প্রায় দু'শো করে টাকা পেত। আর বয়লার-নির্মাতারা প্রায়

দেড়শো টাকা। তুলনামূলক ভাবে ১৮৩৮-এ খিদিরপুর ডক-ইয়ার্ডে ভারতীয় কারিগরদের মাসিক বেতন ছিল[৩০] :

| | | |
|---|---|---|
| জয়নার মিস্ত্রি | : | ১২ টাকা |
| জয়নার মিস্ত্রির সহকারী | : | ৮ টাকা |
| কার্পেন্টার | : | ১০ টাকা |
| কার্পেন্টারের সহকারী | : | ৬ টাকা ৮ আনা |
| ককার মিস্ত্রি | : | ৬ টাকা |
| ককার মিস্ত্রির সহকারী | : | ৫ টাকা |
| পেইন্টার | : | ১০ টাকা |
| পেইন্টারের সহকারী | : | ৭ টাকা |
| ভাইসম্যান | : | ১২ টাকা |
| ব্রেজিয়ার | : | ১৬ টাকা |
| ব্রেজিয়ারের সহকারী | : | ১২ টাকা |

পুরনো কথায় ফিরে আসি। গঙ্গায় স্টিমাররা যখন প্রথম দেখা দিল, যাত্রী পরিহণের কাজে কিন্তু তারা লাভজনক কোনো ব্যবসার পথ তৈরি করতে পারেনি। একমাত্র টাগিং বা স্টিমার দিয়ে জাহাজ টেনে আনার কাজটাই কিঞ্চিৎ অর্থকরী ছিল, মুনাফার অল্পবিস্তর মুখ দেখা যেত।



# ‘টগ সমাজ’, দ্বারকানাথ ঠাকুর ও হানিফ সারেং

“আমাদের ইচ্ছা যে শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকরু উক্ত সমাজের নাম পরিবর্তন করেন। আমরা শুনতেছি সকলে তাহা ‘ঠ’ উচ্চারণ করিয়া ঠগের সমাজ কহিয়া থাকে।”

১৮৩৬-এর ১১ জুন ‘সমাচার দর্পণ’ এই কথা লেখার পর অবশ্য জানাতে ভোলেনি যে এই কোম্পানি ‘ফর্বেস’ নামে একটি স্টিমার কেনার পর, ২১ ফেব্রুয়ারি থেকে ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত “গড়ে ১৮,৮০০ টাকা উৎপন্ন হয় তাহাতে ১২. ১৮৫ টাকা খরচ হইয়াছে অতএব লাভ মাসে ৩০০০ টাকার কিঞ্চিৎ ন্যূন।”

‘ফর্বেস’-এর পূর্বতন অধিকারী ম্যাকিন্টশ কোম্পানিও জাহাজটিকে একইভাবে ভাড়া খাটাত কিন্তু “মাটিন্টশ কোম্পানির হস্তে থাকনসময়ে কখন তাহার খরচা পোষিয়া উঠে নাই।”[১]

‘সমাচার দর্পণ’-এর পাতায় এরপরেও একাধিকবার ‘বাষ্পের দ্বারা জাহাজাকর্ষণীয় সমাজ’-এর খবর ছাপা হয়েছে।

সমকালীন প্রযুক্তিবিদ্যার আধুনিকমত প্রয়োগ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল দ্বারকানাথের ব্যবসায়িক দূরদর্শিতা পুরোপুরি উপলব্ধি করতে হলে ভারত ও ইংলন্ডের মধ্যে যন্ত্রশিল্প বিকাশের দুই ধারার ভিন্নতার কথা একটু বলা দরকার। ইংলন্ডে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে কয়লার ব্যবহার শুরু হওয়ার পরেই কয়লার চাহিদা আকস্মিক বেড়ে যায়। এই বাড়তি চাহিদার দরুন কয়লাখনির সুড়ঙ্গপথের পাতাল-প্রবেশ শুরু হয়। তখন গভীর কয়লাখনি জলমুক্ত করার সমস্যাপূরণ করতে ডাক পড়ে, বাষ্পচালিত পাম্পের। আর এই বাষ্পীয় পাম্পের বিবর্তন থেকেই জন্ম স্টিম ইঞ্জিনের। কয়লার অধিক ব্যবহারের সূত্র ধরে ঠিক এই প্যাটার্নে ভারতে স্টিম ইঞ্জিনের প্রচলন ঘটেনি। বরং তার উল্টোটাই সত্যি। স্টিম ইঞ্জিন, বিশেষ করে, স্টিমারের ব্যবহার শুরু হওয়ার পরেই এদেশের

কয়লাখনির প্রথম শ্রীবৃদ্ধি ।[২]

কার টেগোর অ্যান্ড কোম্পানি নামে ম্যানেজিং এজেন্সির প্রাণপুরুষ দ্বারকানাথ ক্যালকাটা স্টিম টাগঅ্যাসোসিয়েশনপ্রতিষ্ঠা করার মাত্র মাসখানেক আগে কিনেছিলেন রানীগঞ্জের কয়লাখনি । বলাই যেতে পারে যে, ১৮৩৬-এর দিন তিরিশের মধ্যে দ্বারকানাথ তাঁর কয়লা ও বাষ্পীয় উদ্যোগের সাম্রাজ্যের বীজ বপন করেন । রানীগঞ্জের এই কয়লাখনিকে কেন্দ্র করেই ক্রমশ বিস্তৃত হয়েছিল কার টেগোরের খনির জাল, যা শেষ পর্যন্ত ভারতের বৃহত্তম খনি প্রতিষ্ঠান বেঙ্গল কোল-এর জন্ম দেয় । এটাও জানা দরকার যে, সেই জোন্সের আমল থেকে রানীগঞ্জে কয়লা নিয়ে অনেক ধস্তাধস্তি হয়েছে, কিন্তু দ্বারকানাথের হস্তক্ষেপের আগে কয়লা তোলার ব্যবসা মুনাফার মুখ দেখেনি ।[৩]

শুধু তো ক্যালকাটা স্টিম টাগ অ্যাসোসিয়েশন নয়, দ্বারকানাথ আরও কিছু ব্যবসায়ের সঙ্গে জড়িত ছিলেন, অংশীদার হিসাবে, যেখানে কয়লা নিত্য প্রয়োজন, যেমন ক্যালকাটা ডকিং কোম্পানি কি নিউ ফোর্ট গ্লস্টার মিল্‌স কোম্পানি । এই শেষোক্ত প্রতিষ্ঠানের ৯০০ টি শেয়ারের মধ্যে দ্বারকানাথের ছিল ৭৫টি । ১৮৪০-এর মধ্যে প্রতিষ্ঠানটি একটি বৃহৎ বহুমুখী যন্ত্রশিল্প উদ্যোগের চেহারা নেয় । পাঁচটি স্টিম ইঞ্জিন নিযুক্ত হয় সুতো পাকানোর, রাম ডিস্টিলারি, আয়রন ফাইণ্ড্রি, অয়েল ও পেপার মিল ইত্যাদির কাজে ।[৪]

কিন্তু রানীগঞ্জের কয়লার প্রধান ক্রেতা হয়ে দাঁড়াল সরকারি স্টিমারগুলি । কয়লাখনি কেনার মাত্র চার বছর পরে ১৮৪০-এ একটা হিসেব পাওয়া যায় । তখন ন'টি সরকারি স্টিমার চলছে, সবসুদ্ধ ৬০০ অশ্বশক্তি ক্ষমতা তাদের । ঘণ্টায় এক অশ্বশক্তি পেতে দশ পাউন্ড করে রানীগঞ্জের কয়লা পুড়োতে হয় । এক-একটি স্টিমার যদি সপ্তাহে পঞ্চাশ ঘণ্টা করে চলে তাহলে বছরে ৭৫০০ টন কয়লা কেনা প্রয়োজন ।[৫]

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং তারপরে রবীন্দ্রনাথেরও ব্যবসায়ে অনীহা ছিল এবং প্রধানত সেই কারণেই আজও দ্বারকানাথের শুধু 'প্রিন্স' স্বরূপটিই আমাদের চোখে পড়ে । তাঁর বিলাসবৈভবের বাড়াবাড়ি । ঐতিহাসিকরা বারবার লিখেছেন যে, দ্বারকানাথের মৃত্যুর পর তাঁর বিপুল দেনার দায়িত্ব বহন করেছিলেন দেবেন্দ্রনাথ । কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের নিজস্ব কী আয় ছিল—যার সাহায্যে তিনি এই দেনা পরিশোধ করেন, এ-প্রশ্ন কেউ করেননি । আসলে, দেবেন্দ্রনাথ শিল্প ও বাণিজ্যের সঙ্গে সংস্রব ছিন্ন করে ভূসম্পত্তি রক্ষায় মন দিয়েছিলেন । সুমিত সরকার ভিন্ন প্রসঙ্গে হলেও উল্লেখ করেছেন যে, দ্বারকানাথের পর জোড়াসাঁকোর ঠাকুররা শুধু ভাড়ার টাকায় দিন গুজরান করেছেন ।[৬] দ্বারকানাথ আর-একটু সুবিচার পেতেন যদি আমরা তাঁর ডায়েরিটা খেয়াল করে পড়তাম । কিশোরীচাঁদ মিত্রের লেখা জীবনীগ্রন্থে উল্লিখিত এই ডায়েরি থেকে জানা যায়, বিদেশ ভ্রমণকালে দ্বারকানাথ যে উৎসাহে রানী-সংসর্গ করছেন, তেমনই চষে বেড়াচ্ছেন কয়লাখনি অঞ্চল, ইস্পাত ও জাহাজ নির্মাণের কারখানা ।[৭]

দ্বারকানাথের লুপ্ত যন্ত্র উদ্যোগের সেরা সাক্ষী—একটি রাজকীয় মনুমেন্টও বলতে পারি, এখন বিড়লা কারিগরি ও শিল্প সংগ্রহালয়ের প্রাঙ্গণে দর্শকরা প্রবেশ করা মাত্র তাদের অভ্যর্থনা জানায় । একটি অতিকায় বীম্ স্টিম ইঞ্জিন ।[৮] দশ ফুটেরও বেশি ব্যাসবিশিষ্ট তার ফ্লাই-হুইল । আজকের ভাষায় তার বর্ণনা জমবে না । এই যন্ত্রের ফ্লাই-হুইলকে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের মতো 'উড্ডীন যন্ত্র' নামেই ডাকা উচিত এবং বলা দরকার, "ইহা বাষ্পীয় যন্ত্রের অক্ষে সংলগ্ন থাকে এবং তাহার সহযোগে

ভ্রমিত হয়। ...এই চক্রটিই বাষ্পীয় যন্ত্রের ‘বল-ভাণ্ডার’ স্বরূপ...।”[৯]

বর্তমানে স্থবির ইঞ্জিনটিকে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের লেখা ‘প্রাকৃতিক বিজ্ঞান’-এর ভাষা-বলে চালু করার একটা চেষ্টা করা যেতে পারে, “চুল্লীর তাপে হাঁড়ির মধ্যে বাষ্প হইতে থাকিলে, জলনিয়মায়ক ঐ হাঁড়িতে প্রয়োজনরূপ জল যোগাইতে লাগিল, বাষ্প-বাহিনী নলী দ্বারা বাষ্প চুঙ্গীতে প্রবিষ্ট হইল এবং সেই চুঙ্গীর পিচ্ছিল-কবাট এবং ডি-কবাটের দ্বারা বাষ্প একবার চুঙ্গীর উপরের দিকে এবং পরে নিম্নভাগে যাইয়া চাপ প্রদান করিল। তাহাতেই চুঙ্গীর অর্গল উপর-নীচে করিয়া পরিচালিত হইল ও তৎসহযোগে আড়ার একদিকের উর্দ্ধাধোগতি সম্পাদিত হওয়াতে উহার অপরদিকও চালিত হইল, সুতরাং যোজক এবং ঘূর্ণনদণ্ড সহকারে অক্ষের ও তৎসম্বন্ধে চক্রের ভ্রমণ হইতে লাগিল ; আর বাষ্পও চুঙ্গী হইতে বাহির হইয়া সংঘাত-যন্ত্রে গিয়া পুনর্ব্বার জলরূপ-এ পরিণত হইয়া বোমাযন্ত্র দ্বারা উত্তোলিত হইলেই পুনর্ব্বার জলযোজক প্রণালী দ্বারা বাষ্পের হাঁড়িতে আগমন করিল।”

‘রামধনদাস স্বর্ণকার খোদিত’ বাষ্পীয় যন্ত্রের ছবিটিও ‘প্রাকৃতিক বিজ্ঞান’ গ্রন্থের অন্যতম আকর্ষণ।

ভূদেব মুখোপাধ্যায় ইংরেজি Beam-এর বাংলা করেছেন ‘আড়া’। প্রযুক্তির ইতিহাস আলোচিত ইঞ্জিনটি ‘বীম ইঞ্জিন’-এর গোত্রভুক্ত। কাজেই বাংলায় তাকে আড়া-ইঞ্জিন বলা যেতে পারে।

১৮৯৭ সালে ইঞ্জিনটিকে নতুন করে আবিষ্কার করা হয় রাজাবাগানে সেন্ট্রাল ইনল্যান্ড ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট কোম্পানির প্রাঙ্গণে। তারপরেই তোড়জোড় শুরু হয় সেটিকে ভালভাবে রক্ষা ও প্রদর্শন করার। রাজাবাগানে ইঞ্জিনটির সামনে একটি পেতলের ফলকে খোদাই করা ছিল তার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস : “আই· জি· এস· এন কোম্পানি লিমিটেডের কারখানার মূল ইঞ্জিন। ১৮৪৬ থেকে ১৮৮০ অবধি ৬ নম্বর গার্ডেনরীচে এটি মেশিন শপ-এর চাকা ঘোরাত। তারপর এটিকে রাজাবাগানে আনা হয় এবং ১৮৯৭ অবধি সেখানে চালু ছিল।[১০]

আই· জি· এস· এন·—অর্থাৎ ইন্ডিয়া জেনারেল স্টিম নেভিগেশন কোম্পানিরই প্রত্যক্ষ উত্তরসুরি বর্তমান সেন্ট্রাল ইনল্যান্ড কোম্পানি। কিন্তু এইটুকু বললেও স্পষ্ট হয় না, কেন বীম ইঞ্জিনটিকে আমরা দ্বারকানাথের ইঞ্জিন বলছি। সে কাহিনী বিবৃত করেছেন ইন্ডিয়া জেনারেল কোম্পানির ইতিহাস-রচয়িতা অ্যালফ্রেড ব্রেম। আই· জি· এস· এন· যখন ক্যালকাটা স্টিম টাগ অ্যাসোসিয়েশনের যন্ত্রপাতি-সমেত কারখানাটি কিনে নেন (১৮৪৪-এ) তখনই তার অর্ন্তভুক্ত ছিল এই ইঞ্জিনটি।[১১]

এই বীম ইঞ্জিনের প্রসঙ্গক্রমেই দ্বারকানাথের আমলে রানীগঞ্জ কয়লাখনিতে প্রথম বাষ্পশক্তি ব্যবহার সম্বন্ধে কয়েকটি কথা জানিয়ে রাখা দরকার। দ্বারকানাথ রানীগঞ্জ খনি কেনার পর সি· বি· টেলর নিযুক্ত হন তার ম্যানেজার। স্ব-শিক্ষিত ইঞ্জিনিয়ার টেলর রানীগঞ্জ খনিতে মিস্টার সিয়ার্নস্ (Cearns) নামে একজন সারাক্ষণের ইঞ্জিনিয়ার নিযুক্ত করেন। সিয়ার্নস-এর কাজ ছিল খনির অভ্যন্তরের সঞ্চিত জল পাম্প করে বের করার জন্য যে অতিকায় ও অতি প্রাচীন স্টিম ইঞ্জিনটি ছিল, তার তদারকি করা। চার বা পাঁচ হর্স পাওয়ার-এর ইঞ্জিনটি পুরনো হওয়ায় প্রায়ই মেরামত বা যন্ত্রাংশ বদল করা প্রয়োজন হতো। সিয়ার্নস চিনাকুড়ি খনির ইঞ্জিনটিও রক্ষণাবেক্ষণ করতেন।[১২] রানীগঞ্জ ও চিনাকুড়ি ভারতের প্রথম দুই গভীর-প্রসারী কয়লা খনি। ১৮৪২-এ সি· বি· টেলরের একটি স্কেচ

থেকে রানীগঞ্জের ইঞ্জিনটিকে সরিয়ে বসানোর প্রস্তাবের কথা জানা যায়।[১৩] রানীগঞ্জের পুরনো বীম ইঞ্জিনটি উইলিয়াম জোন্‌সই যে প্রথম বসিয়ে ছিলেন তাতে বিশেষ সন্দেহ নেই। সেটা শুধু ইঞ্জিনের প্রাচীনত্বের উল্লেখ থেকে অনুমান করতে হয় না। রানীগঞ্জের খনিগর্ভ থেকে জল নিষ্কাষণের ব্যবস্থা করতে না পারলে জোন্‌সের পক্ষে সেখানে কাজ চালানোই সম্ভব হতো না। এবং রানীগঞ্জের পিট থেকে কয়লা তোলার কাজে সাফল্যের জন্যেই জোন্‌স-কে 'ভারতের কয়লাখনির পিতা' বলে অভিহিত করা হয়েছিল।[১৪] আরও একটি পরোক্ষ প্রমাণের উল্লেখ আগেই করা হয়েছে। শ্রীরামপুরের কাগজের কলে স্টিম ইঞ্জিন বসানোর আগে জোন্‌সের পরামর্শ নেওয়া হয়, কারণ তিনি তার আগেই কয়লাখনির কাজে স্টিম ইঞ্জিনের ব্যবহার সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন। ১৮৪৭-এ পুরনো ইঞ্জিনটি অপসারিত করে একটি কুড়ি অশ্বশক্তির ফসেট প্রেস্টন ইঞ্জিন বসানো হয়।[১৫]

চিকিৎসাবিদ্যার প্রসারে দ্বারকানাথের অবদানের কথা সুবিদিত হলেও ইঞ্জিনিয়ারিং পাঠক্রম প্রবর্তনের ব্যাপারে তাঁর উদ্যোগের কথা আজ অবধি কেউ উল্লেখ করেননি। ১৮৪৪-এর ২১ ফেব্রুয়ারি কাউন্সিল অফ এডুকেশনের সেক্রেটারিকে তিনি চিঠি লিখে জানান যে, হিন্দু কলেজে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিঙের 'চেয়ার' সৃষ্টি হলে তিনি প্রতি মাসে সেই বাবদ ১৫০ টাকা করে অনুদান দান দিতে আগ্রহী।[১৬] তাঁর চিঠির ছত্রে-ছত্রে ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাদান শুরু হওয়ার ব্যাপারে আগ্রহ ও আবেগ ছড়িয়ে আছে। (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)।দ্বারকানাথের মৃত্যুর প্রায় দশ বছর পরে তাঁর এই ইচ্ছা আংশিকভাবে পূর্ণ হয়।

কলের নৌকার প্রসঙ্গে এবং আই· জি· এস· এন· কোম্পানির সূত্র ধরেই আমরা হানিফ সারেঙের খোঁজ নিতে পারি। ১৮৩০ সালে 'বারহামপুত্র' (ব্রহ্মপুত্র) স্টিমারের ইঞ্জিনিয়ার মিস্টার হেন্ডারসন প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে, অনুমতি পেলে তিনি দুটি ভারতীয় ছেলেকে ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে গড়ে নিতে পারেন। অনুমতি পেয়েছিলেন কিনা জানা নেই, তবে এর আট বছর পরে দেখা যায়, মাত্র দু'জন মুসলিম ইঞ্জিন-চালকের পদ লাভ করেছেন।[১৭] অগ্রগতি বলতে এই। আই· জি· এস· এন·-এর হানিফ সারেং প্রথম ভারতীয়, যিনি ১৮৭৬ সালে একটি স্টিমারের কম্যান্ডার নিযুক্ত হন। কুড়ি টনের ছোট্ট স্টিমার 'নাজিরা' ছিল তাঁর অধীনে। ১৮৮২-এ তিনি লাভ করেন 'সুলতান' নামে অনেক বড় একটি স্টিমারের দায়িত্ব। হানিফ সারেঙের আগে পূর্ব ভারতের অভ্যন্তরীণ জলপথে আর কোনো ভারতীয় এই গৌরব অর্জন করতে পারেননি। সে-সময়ে ইন্ডিয়া জেনারেলের একুশটি স্টিমারের পঞ্চাশ জন পরিচালক, সহ-পরিচালক ও ইঞ্জিনিয়ারদের মধ্যে তিনি ছিলেন একমাত্র দিশী মানুষ। 'সুলতান'-এর পর তিনি ভার নিয়েছিলেন, 'বরিশাল' স্টিমারের। চিরকাল তিনি কলকাতা-কাছাড় লাইনেই চলাফেরা করেছেন। হানিফ সারেঙের অদ্ভুত কীর্তির সাক্ষ্য বহন করে ইন্ডিয়া জেনারেল-এর পুরনো খাতাপত্র এবং মুদ্রিত হরফে তাঁর নাম প্রথম উল্লিখিত হয় ওই কোম্পানিরই ইতিহাস রচয়িতা পূর্বোক্ত অ্যালফ্রেড ব্রেমের লেখায়। ১৯০০ খ্রীস্টাব্দে লেখা এই বইটিতে ব্রেম অকপটে স্বীকার করেছেন, তখন যত সারেংদের কোম্পানির চাকরিতে দেখা যেত, তাদের সবার পিতৃস্থানীয় হানিফ।[১৮] জাহাজের পরিচালককে আমরা ক্যাপ্টেন বা কম্যান্ডার নামে অভিহিত করি, কিন্তু অভ্যন্তরীণ জলপথে স্টিমারের পরিচালকরা যে আজও সারেং সম্বোধিত হন—সেও কি ওই আদিপুরুষ হানিফ সারেঙের সুবাদেই নয়? হানিফের পদবী ছিল সারেং। কিন্তু

তাঁর অনুগামী সকলের নিশ্চয় তা নয় !

হানিফের গৌরবের কথা আর-একটু ফুটে ওঠে ১৮৭৫ সালে প্রকাশিত দৈনিকপত্রের একটি সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে। রেল ইঞ্জিন চালক হিসেবে ভারতীয়দের নিয়োগ করার প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করে জনৈক পত্রলেখক জানিয়েছিলেন[১৯] :

... in the case of a political struggle or the repetition of the outbreak of 1857, will the Govt. fully depend for the transhipment of its troops and ammunition in the native staff ?

১৮৯০-এ প্রকাশিত একটি রিপোর্ট থেকে জানা যায়, আইন অনুসারে তখন ৮০ টনের চেয়ে বড় স্টিমারের দায়িত্ব ভারতীয়দের দেওয়া যেত না। এবং সারেং পদে পৌঁছনোর রাস্তাটিও দিল দীর্ঘ। কুলি, ফায়ারম্যান ও অয়েলম্যান ইত্যাদির সোপান বেয়ে শেষ পর্যন্ত ইঞ্জিন-ড্রাইভার হিসেবে মাসে তিরিশ কি পঞ্চাশ টাকা মাইনে জুটত। ইন্ডিয়া জেনারেল ছাড়া শুধু হোর, মিলার অ্যান্ড কোম্পানিই ভারতীয় চালক নিযুক্ত করতেন।[২০]

কলিন নামে যে সর্বজ্ঞের রিপোর্ট থেকে পূর্বোক্ত পরিচ্ছেদের তথ্যগুলি নেওয়া হয়েছে, তিনি লিখেছেন, মুসলমানদেরই শুধু স্টিমার চালক হিসেবে নেওয়া হয় কারণ তারা রান্নাবান্নার জন্য বাসনকোসনের লটবহর বয়ে বেড়ায় না।[২২] পড়ে, মনে হওয়ার কথা, হানিফ বা তাঁর সতীর্থদের দক্ষতার যেন কোনো ব্যাপারই ছিল না। শুধু শ্বেতকর্তাদের ইচ্ছায় তাঁরা কর্ম করেছেন।

কিন্তু হানিফের কুশলতাকে নিতান্তই ব্যক্তিগত প্রতিভার অভিব্যক্তি বলে চিহ্নিত করার উপায় নেই। উপায় নেই, সেটিকে বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবে গণ্য করার। শতাব্দীর পর শতাব্দী জুড়ে চট্টগ্রামে জাহাজে নির্মাণ ও পরিচালনায় দক্ষ মুসলিম নাবিক ও কারিগরদের বাস। তাঁদেরই ঐতিহ্য-ছায়ায় লালিত হানিফ-প্রতিভা। এই সিদ্ধান্ত কাল্পনিক ইচ্ছাপূরণ নয়।

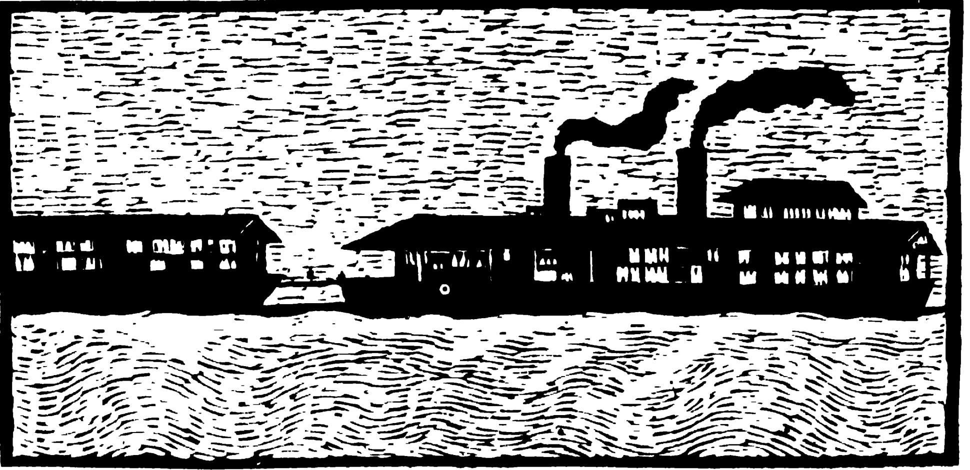
১৯০৭-০৮ খ্রীস্টাব্দে বাংলা ও আসামের শিল্প ও সম্পদ সম্বন্ধে একটি সরকারি রিপোর্ট পেশ করেন জি· এন· গুপ্ত, এম· এ· (আই· সি· এস)। তিনি জোরালো ভাষায় জানিয়েছিলেন যে, চট্টগ্রামে একটি নটিকাল স্কুল বা কলেজ স্থাপন অত্যন্ত ফলপ্রসূ হতে পারে। সেখানে বাষ্পীয় জাহাজ পরিচালনা, তার নির্মাণ ও মেরামতি ইত্যাদি পাঠক্রম থাকবে। শুধু বন্দর হিসেবে চট্টগ্রামের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের খাতিরেই এই প্রস্তাব আসেনি। গুপ্ত-র ভাষাতেই প্রধান কারণটি হলো[২২] :

Chittagong is the home of a sturdy race of Muhammadans, who have inherited the seafaring instinct of their forefathers, and who are now largely employed, not only in the subordinate capacity of 'lascars' in sea-going vessels, but also as 'serangs' or captains, of most of the steamers of the Assam and Bengal.

এই ঐতিহ্যই হানিফের প্রতিভাকে সামাজিক ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ উপাদানে পরিণত করেছে।

হানিফ ও তার অন্তর্বর্তীদের কাছে বাংলা ভাষাও কিছু নতুন শব্দের জন্য ঋণী। যদিও কোনো অভিধানে সেগুলি ঠাঁই পায়নি। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর 'মনের মানুষ' উপন্যাসে কয়েকটি ইংরেজি-ভাঙা শব্দ ব্যবহার করেছিলেন। অন্য একটি নৌকার সঙ্গে সংঘর্ষ এড়াবার জন্য সারেঙ

চেঁচিয়ে উঠেছিল, টপার ! টপার ! (স্টপ হার্) । তারপর স্টিমারের মুখ বাঁ দিকে ফেরাবার জন্য তার নির্দেশ, বাঁ বর্দ্দু টপার ক'রে যমনা বর্দ্দু ইজেড চালাও । অর্থাৎ,বাঁ দিকের চাকা (বর্দ্দু) থামিয়ে ডান দিকের (যমুনা) চাকা 'ইজি এহেড' চালাবার নির্দেশ । যমুনা শব্দটির উৎপত্তি 'জিম্না' থেকে । জিম্না অর্থে ভোজন করা, অর্থাৎ যে-হাতে খাওয়া হয়—ডান হাত ।



# জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পাঁচ কল-কন্যা

দ্বারকানাথের সঙ্গে তুলনা করা চলে না, তবু বাষ্পীয় জাহাজের প্রসঙ্গে মতিলাল শীলের উদ্যোগের কথা মনে পড়ে যায়। চীন ও ইওরোপের সঙ্গে পাটোয়ারি ব্যবসায় মতিলাল শীলের কম করে বারটি জাহাজ চলাফেরা করত। তার মধ্যে বাষ্পীয় তরী 'বানিয়ান'-এর কথা আগেই বলা হয়েছে। ১৮৪০-এ 'দার্জিলিং ব্রিজ' নামে অভিহিত, ভগবানগোলা ও বড়গাছির মধ্যে যাতায়াতের জন্য স্টিম ফেরি ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য মতিলাল দুটি স্টিম ইঞ্জিন দান করতে রাজি হয়েছিলেন। 'স্টিম' জনস্টন যখন ইঞ্জিন দুটি পর্যবেক্ষণ করে 'কাজের উপযুক্ত নয়' মন্তব্য করেন, মতিলাল অবিলম্বে ইংলন্ড থেকে উপযুক্ত ইঞ্জিন আনিয়ে দেবেন, এই প্রতিশ্রুতি দেন।[১]

ঠাকুর পরিবারে দ্বারকানাথের উদ্যোগী মনোভাবের একমাত্র উত্তরাধিকারী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। নীল ও পাট চাষে কিছু লাভের পর তিনি স্টিমারের ব্যবসায়ে নামেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের এই ব্যবসার সাফল্য নয়, অকালমৃত্যুকে সাহিত্যে গৌরবান্বিত করেছেন রবীন্দ্রনাথ। প্রখর ব্যবসাবুদ্ধি-সম্পন্ন মানুষকে, সে তাঁর স্বয়ং পিতামহ হলেও, বরদাস্ত করতে পারতেন না রবীন্দ্রনাথ। ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর জানিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ নিজের হাতে দ্বারকানাথের ব্যবসা-সংক্রান্ত অমূল্য নথিপত্র ধ্বংস করেছিলেন।[২] জ্যোতিদাদার অপরিণত বৈষয়িক বুদ্ধির সুবাদেই রবীন্দ্রনাথের কলম অনুপ্রাণিত হয়েছিল। কয়েকটি সুবর্ণ আঁচড়ে, সেকালের স্টিমার ভ্রমণের যে সরস বর্ণনা রবীন্দ্রনাথ দিয়েছিলেন, তা কিন্তু অদ্বিতীয়। এক্সচেঞ্জ গেজেটে জাহাজের খোল নিলামের বিজ্ঞাপন দেখে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সাত হাজার টাকায় রয়াল এক্সচেঞ্জ থেকে সেটি কিনে আনেন। এই জাহাজের খোল, ইঞ্জিন ও কামরার সঙ্গে সঙ্গে ঋণেও পূর্ণ হয়ে ওঠার বিবরণ আছে 'জীবনস্মৃতি'-তে। কেলসো স্টুয়ার্ট নামে এক কোম্পানি জাহাজটি তৈরি করার পরে এক ফরাসী ইঞ্জিনিয়ার নিযুক্ত হলেন পরিচালক-রূপে। জাহাজের নাম 'সরোজিনী'। তখন কলকাতা থেকে খুলনা অবধি রেললাইন স্থাপনের কথা হচ্ছে।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ স্থির করলেন খুলনা থেকে বরিশাল অবধি এই জাহাজ চালাবেন। অবশ্য 'সরোজিনী' ও তারপরে তাঁর আরও চারটি জাহাজ কলকাতা ও খুলনার মধ্যেও রসদ পরিবহণ করত।[৩]

সরোজিনীর প্রথম যাত্রার বিবরণ দিচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ, "ইংরাজি ২৩শে মে ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দ। আজ শুভলগ্নে 'সরোজিনী' বাষ্পীয় পোত তাহার দুই সহচরী লৌহতরী দুই পার্শ্বে লইয়া বরিশালে তাহার কর্মস্থানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিবে।" জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, ও সন্তানসহ তাঁদের ভ্রাতৃবধূ কয়লাঘাট থেকে জাহাজে উঠলেন। চল্লিশ হর্স পাওয়ার বিশিষ্ট ইঞ্জিনেরও উল্লেখ করেছেন রবীন্দ্রনাথ, "যদিও স্রোত ও বাতাস প্রতিকূল ছিল, তথাপি আমাদের এই গজবর ঊর্ধ্বশুন্ডে বৃংহিতধ্বনি করিতে-করিতে গজেন্দ্রগমনের মনোহারিতা উপেক্ষা করিয়া চত্বারিংশৎ-তুরঙ্গ-বেগে ছুটিতে লাগিল।"[৪]

প্রথম যাত্রাতেই নানা বিঘ্ন। প্রথমত, জাহাজ ছাড়ার আগের রাতেই ক্যাপ্টেন সাহেব গা-ঢাকা দেন। তারপর, ইঞ্জিনের গোলযোগের জন্য নোঙর ফেলে মেরামতির জন্য দেড় ঘণ্টা নষ্ট। মুচিখোলার নবাবের 'খাঁচা' ও বটানিকেল গার্ডেন পেরিয়ে আরও কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পরে হঠাৎ একটা লোহার বয়ার সঙ্গে লাগে প্রবল ধাক্কা। জাহাজডুবি হয়নি, তবে সেদিনের মতো অচল। "তাহার পরদিন অনুসন্ধান করিয়া অবগত হওয়া গেল, জাহাজের এটা-ওটা-সেটা অনেক জিনিসেরই অভাব। সেগুলি না থাকিলেও জাহাজ চলে বটে, কিন্তু যাত্রীদের আবশ্যক বুঝিয়া চলে না, নিজের খেয়ালেই চলে।"[৫]

প্রবল পরাক্রান্ত স্টিমারে চড়ে গঙ্গার মাধুরী উপভোগ করা যায় না বলেই মনে হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের, "... জাহাজের হাঁস্‌ফাসানি, আগুনের তাপ, খালাসিদের গোলমাল, মায়াবদ্ধ দানবের মতো দীপ্তনেত্র এঞ্জিনের গোঁ-ভরে সনিশ্বাস খাটুনি, দুই পাশে অবিশ্রাম আবর্তিত দুই সহস্রবাহু চাকার সরোষ ফেন-উদ্‌গার—এ-সকল গঙ্গার প্রতি অত্যন্ত অত্যাচার বলিয়া বোধ হয়। তাহা ছাড়া গঙ্গার সৌন্দর্য্য উপেক্ষা করিয়া ছুটিয়া চলা...এ যে আপিসে যাইবার সময় নাকেমুখে ভাত গোঁজা। অন্নের অপমান।"[৬]

সরোজিনী কাজ শুরু করার ঠিক আগেই 'ফ্লোটিলা' নামে এক বিদেশী কোম্পানি একই লাইনে স্টিমার চালু করে। এই প্রতিযোগিতায় সামাল দেওয়ার জন্য জ্যোতিরিন্দ্রনাথ আরও চারটি জাহাজ কিনলেন—'বঙ্গলক্ষ্মী', 'স্বদেশী', 'ভারত' ও 'লর্ড রিপন'।[৭]

দেশী ও বিদেশী জাহাজ কোম্পানির মধ্যে এই প্রতিযোগিতার কথা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ স্বয়ং লিখেছেন 'বরিশালের পত্র' নামে প্রবন্ধে। 'বালক' পত্রিকায় প্রকাশিত রচনাটির সঙ্গে বিখ্যাত হ· চ· হ-র আঁকা একটি লিথোচিত্রে 'ফ্লোটিলা'-কে উপেক্ষা করে যাত্রীরা দেখা যায় 'ভারত'-এ এসে উঠছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ লিখছেন, "প্রত্যহ খুব ভোরে আমাদের জাহাজ এখান থেকে যাত্রী নিয়ে খুলনা যায়। ফ্লোটিলা কোম্পানীর জাহাজও সেই সময় যায়। পাছে আমাদের জাহাজে লোক না গিয়ে প্রতিপক্ষের জাহাজে যায় এই জন্য কতকগুলি ভদ্রলোক ও স্কুলের ছাত্র রাত্রি ৪টার সময় উঠে দলবদ্ধ হয়ে উৎসাহের সহিত জাহাজের ঘাটে উপস্থিত হন ও যদি কোন যাত্রী প্রতিপক্ষের জাহাজে যেতে চায়, তাকে অনেক প্রকার বুঝিয়ে এমনকি পায়ে ধরে ফিরিয়ে আনেন। ...তাঁহারা বলেন আমাদের জাহাজের সিটি (বাঁশির ডাক) তাঁহাদের এমন মিষ্টি লাগে ও তাহা শুনতে পেলে তাঁদের এমন আহ্লাদ হয় যে তাহা বলবার নয়। বন্ধুদের সুপরিচিত গলার স্বর শুনলে যেমন বুঝা যায় কে আসছে তেমনি

সিটি শুনলেই কোন্ জাহাজ আসচে তাঁরা বুঝতে পারেন। ঐ আজ 'ভারত' আসছে, ঐ আজ 'লর্ড রিপন' আসছে..."[৮]

স্বাদেশিকতা দমনে বিদেশী বণিকরা স্বীকৃত পন্থার আশ্রয় নিল। ভাড়া কমানো। ফলে, বাণিজ্য-নৌযুদ্ধের পরিণতি হিসেবে, "বরিশাল-খুলনার স্টীমার লাইনে সত্যযুগ আবির্ভাবের উপক্রম হইল। যাত্রীরা যে কেবল বিনা ভাড়ায় যাতায়াত শুরু করিল তাহা নহে, তাহারা বিনামূল্যে খাইতে আরম্ভ করিল। ইহার উপরে বরিশালের ভলান্টিয়ার দল স্বদেশী কীর্তন গাহিয়া কোমর বাঁধিয়া যাত্রীসংগ্রহে লাগিয়া গেল, সুতরাং জাহাজে যাত্রীর অভাব হইল না কিন্তু আর সকলপ্রকার অভাব বাড়িল বই কমিল না। অঙ্কশাস্ত্রের মধ্যে স্বদেশহিতৈষিতার উৎসাহ প্রবেশ করিবার পথ পায় না; কীর্তন যতই জমুক, উত্তেজনা যতই বাড়ুক, গণিত আপনার নামতা ভুলিতে পারিল না—সুতরাং তিন-ত্রিক্কে নয় ঠিক তালে তালে ফড়িঙের মতো লাফ দিতে দিতে ঋণের পথে অগ্রসর হইতে লাগিল।"[৯]

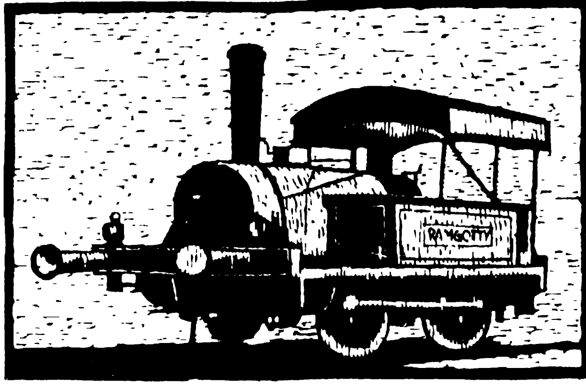
যাবতীয় ক্ষতি স্বীকার করেও রণে ভঙ্গ দেননি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। এ-সময়ে জাহাজই ছিল তাঁর ঘরবাড়ি। কিন্তু চরম আঘাত এল 'স্বদেশী' ডুবি হাওয়ায়। খুলনা থেকে মাল বোঝাই করে কলকাতা আসছিল। "সারা পথ বেশ নির্ব্বিঘ্নে কাটিয়া গেল—আলোক-মালা সমুদ্ভাসিত কলিকাতা বন্দরেও প্রবেশ করিল। কিন্তু শেষে হাওড়ার পুলের নীচ দিয়া যাইবার সময় একখানা জেটিতে না কিসে ধাক্কা লাগিয়া ষ্টীমারখানা নিমেষমধ্যে গঙ্গাগর্ভে নিমগ্ন হইল।"[১০]

শেষ পর্যন্ত ফ্লোটিলা কোম্পানির পক্ষ থেকে রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় একটি সম্মানজনক সন্ধি-প্রস্তাব নিয়ে আসেন। ফ্লোটিলা কোম্পানি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ব্যবসা কিনে নেয়।[১১]

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের এই স্টিমার উদ্যোগ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের আর একটি প্রাপ্তি ঘটেছে বাঙালি সংস্কৃতির। উনিশ শতকের কলকাতার জাহাজের ক্যাপ্টেন, ইঞ্জিনিয়ার, মিস্ত্রি প্রমুখের একমাত্র প্রতিকৃতিকার জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। ১৮৮৩-তে তিনি ক্যাপ্টেন রাসেল, মিস্টার লো (স্টিমারের ইঞ্জিনিয়ার), ক্যাপ্টেন বরকার, মিস্টার লাইং, মিস্টার সি· আই· গিবসন ও মিস্টার রক্স বোরো (স্টিমারের অফিসার) এবং ১৮৮৪-তে জনৈক মিস্ত্রি ও সরোজিনী স্টিমারের করণিক শশীর রেখা-চিত্র রচনা করেন। এমন জাহাজী পোর্ট্রেট অ্যালবাম দুর্লভ।[১২]

১৮৮৯-এ হরিচরণ নামে এক ইঞ্জিনিয়ারের ছবি আঁকেন তিনি, কিন্তু বলা কঠিন জাহাজী ব্যবসায়ের সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল কিনা!

অনেককাল পরে ১৯১৬-য় তিনি বিজিরাম নামে মোটর চালকের ছবি আঁকেন। সম্ভবত এদেশে এর আগে তো নয়ই, পরেও কোনো চাকরিজীবী ড্রাইভার শিল্পীর আঁচড়ে চিরজীবী হওয়ার সুযোগ পাননি।




# বাষ্পীয় রথ ও ‘রেলওয়ে চরিত’

কলকাতা থেকে লৌহময় পথে কলের গাড়ি চলাচল শুরু হয় ১৮৫৫-য় । কু-ঝিক-ঝিক দর্শন দেওয়ার আগেই তার চাল-চলন নিয়ে বাঙালি সংবাদদাতা লিখছেন[১] :

“লোহার রাস্তা শব্দে শকট চলনার্থ লৌহনির্ম্মিত পদবীকে বুঝায় । সেই পদবীতে এমত খাঁজ থেকে যে শকট চক্র তদ্বহির্ভূত হইতে পারে না, এবং শকট চলনেও কোন ব্যাঘাত হয় না ।

“প্রথমতঃ বাস্পযন্ত্র সম্বলিত এক গাড়ি, বাস্পের তেজে সেই গাড়ির চক্র মহা বেগে ঘূর্ণায়মান হওয়াতে শকট অতিশয় দ্রুতগামী হয় । বাস্পযন্ত্র সম্বলিত শকটের পশ্চাৎ অন্যান্য কএক শকট সংলগ্ন হয়, তন্মধ্যে যাত্রিলোক এবং নানা প্রকার দ্রব্যাদি থাকে । বাস্পযন্ত্র সম্বলিত শকট মহাবেগে গমন করিলে তদ্বারা পশ্চাদ্বর্ত্তি অন্যান্য শকট আকর্ষিত হইয়া চলে ।

“বাস্পীয় শকট এ পর্য্যন্ত আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় নাই । বাহন ব্যতীত শকটের গমন আমরা কখন দেখি নাই । যে প্রকার শুনিয়াছি তাহাতে চমৎকার বোধ হয় বটে । বিশ্বাস্য লোকের মুখে না শুনিলে এ বিষয়ে আমাদের প্রত্যয় হইত না, কেন না আপাততঃ ইহা অলীক বোধ হয় । কালিদাসের মেঘদূতের মধ্যে যদ্রূপ বিস্ময় প্রকাশ করেন যে ধূম জ্যোতি জল মরুতের সন্নিপাতে উৎপন্ন মেঘদ্বারা কি রূপে বার্তা প্রেরণ হইবে, আমাদেরও তদ্রূপ বিস্ময় বোধ হইত যে জল বিকারে উৎপন্ন বাস্প দ্বারা কি প্রকারে শকট চালন হইতে পারে ।”

হাওড়া থেকে রানীগঞ্জ পর্যন্ত রেল স্থাপিত হওয়ার কয়েক মাসের মধ্যেই অক্ষয়কুমার দত্ত, ‘বাষ্পীয় রথরোহীদের প্রতি উপদেশ’ নামে কুড়ি পাতার একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন, যার পরিশিষ্টে ছিল কলকাতা-রানীগঞ্জ পথের টাইম টেবিল ও ভাড়াব বিবরণ । ‘যাঁহারা কলের গাড়ী আরোহণ করিয়া গমন করিবেন, তাঁহাদের তৎ-সংক্রান্ত বিঘ্ন নিবারণের উপায় প্রদর্শন’ করতে গিয়ে স্বাভাবিক ভাবেই অক্ষয়কুমারকে সেকালের রেলগাড়ির অদ্ভুত চেহারা ও চালচলনের কথা উল্লেখ করতে হয়েছিল । বাষ্পীয় রথ শ্রেণীর পিছনের দিকে আবরণশূন্য শকট থেকে যাত্রীদের পতনের এবং ছাতের উপরের আসনে উপবিষ্টদের হত ও আহত হওয়ার আশঙ্কার কথা ।

অক্ষয়কুমারের বইটির মুখপাতে 'হাওড়ার ইস্টিশনের' একটি ছবি ছিল। ইস্টিশন হাওড়ায় হলেও, টিকিট-আড্ডা ছিল নদীর এপারে, কলকাতায়, বর্তমান হাওড়া ব্রিজের কাছে মিন্টের বাড়ির বিপরীতে। 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'-র কমফর্টার মাথায় জড়ানো কাঠের বেড়া-ঘেরা বুকিং ক্লার্ক "ঝড়াক ঝড়াক কেবল টিকিটে নম্বর দেবার কল নাড়চেন, শিস দিচ্ছেন ও উপরি পয়সা পকেটে ফেলচেন, পাইখানার কাটা দরজার মতো ক্ষুদে জানলাটুকুতে অনেকে হুজুরের মুখ দেখতে পাচ্ছে না যে কথা কয়ে আপনার কাজ লয়"—এই কান্ড কিন্তু কলকাতার প্রান্তের টিকিট ঘরেই ঘটছে কারণ যাত্রীদের তাড়াহুড়ার কারণ, নদী পার করার জন্য "টুনুনান্টাং, টুননান্টাং করে রেলওয়ে ইস্টিম-ফেরী ময়ূরপঙ্খী ছাড়বার সংকেত ঘণ্টা" বেজে উঠেছে।

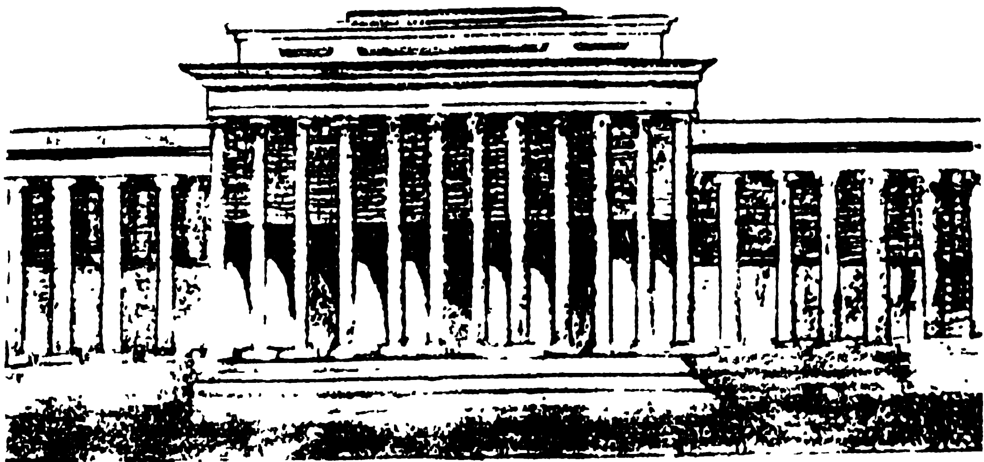
সেকালের রেল-যন্ত্রণার হুতোমের চেয়ে রসোত্তীর্ণ বিবরণ আর কোনো ভাষায় আছে কিনা সন্দেহ।

লোহার চাকা ভারতের বুকে কিভাবে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সামরিক ক্ষত সৃষ্টি করেছিল তার বহু প্রামাণ্য বিবরণ ও ব্যাখ্যা আছে। ভারতের ধন-হরণের এই কলটির জন্য লাইন পাততে গিয়ে বাঁধ নির্মাণের সূত্রে অভ্যন্তরীণ জলপথব্যবস্থার বিনাশ ও মহামারী রূপে ম্যালেরিয়ার আবির্ভাব নিয়েও আলোচনা হয়েছে অনেক। তার পুনরাবৃত্তি বা রেলওয়ে প্রবর্তনের কারিগরি ইতিহাসের বিবরণের মধ্যে যেতে চাই না।

বাঙালিদের মধ্যে কে প্রথম বাষ্পীয় রথে আরোহণ করেন ? ক' বছর আগে একটি বইয়ের সমালোচনা সূত্রে শ্রীরাধাপ্রসাদ গুপ্ত লিখেছিলেন যে, তাঁর সাহেব-বন্ধু ইয়ান জ্যাকের একটি চিঠির সূত্রে তিনি জানতে পেরেছেন, রামমোহন রায় বাঙালিদের মধ্যে প্রথম রেলগাড়ি চড়েন।[২] এবং এই কাণ্ড ভারতে বাষ্পীয় শকট ধোঁয়া ছাড়তে শুরু করার প্রায় বাইশ বছর আগের কথা। কিন্তু এর জন্য দেশী খবরের কাগজ ছেড়ে বিদেশী গবেষকের দ্বারস্থ হওয়ার প্রয়োজন ছিল না। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' নামে সংলকন গ্রন্থ থেকেই ১৮৩১-এর ১৭ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত খবরটি উদ্ধৃত করছি[৩] :

"লিভারপুলে অবস্থানের সময় মাঞ্চিষ্টর নগরের লৌহঘটিত রাস্তা দৃষ্টি করিয়া তাঁহার বিশেষ চমৎকার হয়, তিনি পরীক্ষার দ্বারা ঐ অদ্ভুত ব্যাপারের প্রকার সকলের বিষয় বিবেচনা করিতে সক্ষম হন এতদর্থ তৎকর্ম্মাধ্যক্ষেরা রাস্তার উপরি তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে প্রস্তাব করিলেন অতএব তাঁহারা পূর্ব্বাহ্নে সাত ঘণ্টার সময়ে যাত্রা করিয়া বাষ্পের গাড়ীতে এক ঘণ্টা বিংশতি মিনিটে পনের ক্রোশ গমন করিয়া মাঞ্চিষ্টর নগরে পঁহুছিলেন। যাত্রাকালীন গাড়ী কোন কোন সময়ে ঘণ্টার পনের ক্রোশের হিসাবে চলিল তাহাতে রামমোহন রায় যে পর্য্যন্ত চমৎকৃত হইলেন তাহা তিনি কহিতে অসমর্থক।"

ভারতীয়দের মধ্যে দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রথম রেলপথ স্থাপনের জন্য সক্রিয় হয়েছিলেন। ১৮৪৩-এ একটি চিঠিতে তিনি লিখছেন যে, স্টিমারে করে এলাহাবাদের পথে যাত্রা করেছিলেন, কিন্তু পৌঁছেছিলেন ভাগলপুর পর্যন্ত। কারণ, "আমাদের মহান পবিত্র গঙ্গা তো আর তোমাদের দেশের ছোট্ট রাইন নদী নয়—স্রোত এত তীব্র ছিল যে আমায় কলকাতায় ফিরে আসতে হয়।" এই চিঠিরই শেষে দ্বারকানাথ জানিয়েছিলেন, "দুর্ভাগ্যবশত ভারতে আমাদের রেলপথ নেই এবং এখানে ভ্রমণ করা সামান্য ব্যাপার নয়, সহজসাধ্যও নয়…"।[৪] স্টিমার যাত্রার অনিশ্চয়তা নিয়ে দ্বারকানাথের




হাওড়া স্টেশন · অক্ষয়কুমার দত্ত-র বই থেকে

দুশ্চিন্তা ব্যক্ত হয়েছে একাধিক চিঠিতে। তাব মধ্যে জিও (জর্জ) থম্পসনকে লেখা চিঠির কয়েকটি সরস ছত্র তাঁর সংস্কারমুক্ত মনেরও পরিচয় বহন করে। দ্বারকানাথ লিখছেন যে ঠিক দূর্গা পূজার পর যাত্রা শুরু করবেন কারণ, "আমার মতো খাঁটি হিন্দুর পক্ষে দূর্গার আরাধনা এবং বৃষকুলের যাবতীয় ভূতপ্রেতদের অর্ঘ্য প্রদান না করে কলকাতা ত্যাগ করা খুবই অনুচিত হবে...." :[৫]

It would be very wrong for a good Hindoo like me leaving Calcutta before performing the worship of the Doorgah and making sacrifice to all the Ghosts of Buffaloes etc.—So that I think my next journey is sure to be prosperous.

রোন্যাল্ড ম্যাকডোনাল্ড স্টিফেনসন যখন 'ইস্ট ইন্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানি' প্রতিষ্ঠার জন্য প্রথম রিপোর্টটি পেশ করেন, দ্বারকানাথ জানিয়েছিলেন কলকাতা থেকে কয়লাখনি অঞ্চল অবধি রেলপথ স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধনের এক-তৃতীয়াংশ তিনি সংগ্রহ করে দেবেন। শেষ পর্যন্ত কিন্তু দ্বারকানাথ স্টিফেনসন ও প্রস্তাবিত ইস্ট ইন্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানির প্রতি তাঁর সমর্থন প্রত্যাহার করে নেন। প্রধানত তাঁরই উদ্যোগে 'ইস্ট ইন্ডিয়া'ব প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে আত্মপ্রকাশ করে 'বেঙ্গল গ্রেট ওয়েস্টার্ন রেলওয়ে'। দুটি কোম্পানিই ১৮৪৪ খ্রীস্টাব্দে লন্ডনে রেজিস্ট্রি করা হয়। দ্বারকানাথের মত পরিবর্তনের পিছনের কারণগুলি খুব অস্পষ্ট নয়।[৬]

**প্রথমত,** স্টিফেনসনের কোম্পানির পরিচালকবর্গ ছিল পুরোপরি লন্ডন কেন্দ্রিক। দ্বারকানাথ

DIRECTIONS
for
A RAILWAY-TRAVELLER

বাষ্পীয় রথারোহীদিগের
প্রতি উপদেশ

অর্থাৎ

যাঁহারা কলের গাড়ী আরোহণ করিয়া গমন ক-
রেন, তাঁহাদের তৎ-সংক্রান্ত বিঘ্ন নিবারণের
উপায় প্রদর্শন

শ্রী অক্ষয়কুমার দত্ত প্রণীত

কলিকাতা
তত্ত্ববোধিনী সভার যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত

১৭৭৬ শকাব্দ মাঘ মাস

আখ্যাপত্র

সমর্থিত কোম্পানিটির উদ্দেশ্য বিদেশী শাসকদের স্বার্থহানি না হলেও তা থাকতো কলকাতার ব্যবসায়িক সম্প্রদায়ের নিয়ন্ত্রণাধীনে। দ্বিতীয়ত, স্টিফেনসন চেয়েছিলেন প্রথমেই কলকাতা থেকে বর্ধমান (কয়লাখনি) অবধি রেলপথ স্থাপন করতে। দ্বিতীয় বিচারে, দ্বারকানাথ স্থির করেন প্রথম রেলপথ স্থাপিত হওয়া উচিত কলকাতা থেকে রাজমহল, ইন্ডিয়া জেনারেল স্টিম নেভিগেশন কোম্পানির বন্দর অবধি। আসলে কলকাতা-কেন্দ্রিক ব্যবসায়ী সম্প্রদায় স্টিমার ব্যবস্থার পরিপূরক

[illegible] অভিমুখে আগমনের সময় নিরূপণ ও ভাড়ার বিবরণ।

টাইম টেবল : অক্ষয়কুমার দত্ত-র বই থেকে

হিসাবেই রেলপথ বিস্তারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত স্টিফেনসনের প্রস্তাবই কার্যকর হলো। অবশ্য তার মধ্যে গ্রেট ওয়েস্টার্নের সবচেয়ে প্রভাবশালী প্রবক্তা দ্বারকানাথের মৃত্যু হয়েছে। দ্বারকানাথ জীবিত থাকলে কি হতো, এ-জাতীয় কল্পনার কোনো সার্থকতা নেই কিন্তু এ-কথা অনস্বীকার্য যে শেষ পর্যন্ত ইস্ট ইন্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানির সুপরিকল্পিত রেলপথের জাল ভারতের আভ্যন্তরীন জলপথ ব্যবস্থার শ্বাসরোধ করেছিল। হয়তো, গ্রেট ওয়েস্টার্ন এই ক্ষতিটুকু রোধ করতে পারতো।

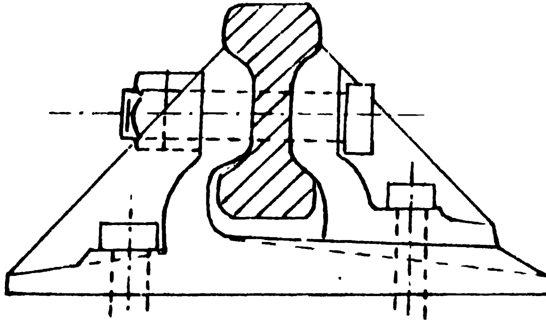
রেল ব্যবস্থার সঙ্গে রামমোহন, দ্বারকানাথ প্রমুখ নক্ষত্রদের যতই সংস্পর্শ থাক, আজ অবধি একটি মাত্র রেল ইঞ্জিনের বাঙালি নামকরণ হয়েছে। এবং যাঁর সম্মানার্থে এই নামকরণ সেই মানুষটি স্বল্প পরিচিত। দিল্লীর রেল ট্র্যান্সপোর্ট মিউজিয়মে হাওড়া-রানীগঞ্জ শাখার প্রথম প্রজন্মের যাত্রীবাহী ইঞ্জিন 'ফেয়ারি কুইন'-এর সঙ্গেই এখন 'রামগতি'র সহাবস্থান।[৭]

রামগতি মুখোপাধ্যায় ছিলেন তিরহুত স্টেট রেলওয়ে-র ইঞ্জিনিয়ার। আর 'রামগতি' ইঞ্জিনটি প্রথম এসেছিল ১৮৬২-৩ নাগাদ নলহাটি-আজিমগঞ্জ শাখার চার ফিট গেজের লাইনে চলার জন্য।

প্যারিসে Anjubault সংস্থা তার নির্মাতা। পরে সেটি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি অধিগ্রহণ করে। কলকাতা কর্পোরেশনের মাল-টানা ইঞ্জিন হিসাবে তার কর্মজীবন শেষ হয়। বলা কঠিন, এই দীর্ঘ জীবনের মধ্যে কখন ও কি সুবাদে ইঞ্জিনটি 'রামগতি' নামে পরিচিত হয়।

রামগতি মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে পুরোপুরি দেশীয় মূলধন ও পরিচালনায় প্রতিষ্ঠিত ভারতের প্রথম রেল কোম্পানিরও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। 'হোপ' পত্রিকার সম্পাদক অমৃতলাল রায়ের উদ্যোগে ১৮৯০-এ প্রতিষ্ঠিত হয় 'বেঙ্গল' প্রভিন্সিয়াল' রেলওয়ে কোম্পানি।' ১৮৯৪-এর ৭ নভেম্বর এই কোম্পানির প্রথম রেলগাড়ি চলাচল শুরু হয় তারকেশ্বর ও রুদ্রাণীর মধ্যে। ১৯০৪-এর মধ্যে ন্যারো গেজ লাইনটি ত্রিবেণী অবধি সম্প্রসারিত হয়। ১৭টি স্টেশন বিশিষ্ট রেলপথে তিনটি ইঞ্জিন ও ষাট খানি বগি দিনে ছ'বার করে চলতো।

বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল রেলওয়ে-র পরিচালক বর্গের অন্যতম ছিলেন রামগতি মুখোপাধ্যায়। তাঁর কারিগরি অভিজ্ঞতা বিশেষ সহায়কও হয়েছিল রেলপথ স্থাপনের কাজে। কিন্তু এই রেলপথের মুখ্য নির্মাতা বাঙালি ইঞ্জিনিয়ার অন্নদাপ্রসাদ রায়। ১৮৫৫ সালে জন্ম তাঁর। রুরকি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ডিগ্রিধারী। তেত্রিশ মাইল বিস্তৃত রেলপথ ও তার জন্য চারটি সেতু-নির্মাণের কাজ তাঁরই তদারকিতে সম্পন্ন হয়েছিল। সহকারী ইঞ্জিনিয়ার ও ওভারসিয়ার হিসাবে ছিলেন রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও নলিনবিহারী ঘোষ। অন্নদাপ্রসাদের পরে ধনকৃষ্ণ বসু তাঁর পদটি গ্রহণ করেন। ১৯৫৬-য় কোম্পানিটি লিকুইডেশনে চলে যায়।[৮]



ব্রুনেল-এর বুল-হেড রেল

কারিগরি ইতিহাসের খাতিরে, একটু প্রসঙ্গান্তর ঘটলেও, কলকাতার দ্বিতীয় রেলঘাঁটি শেয়ালদা ও শেয়ালদা-কেন্দ্রিক 'ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ে' সম্বন্ধে একটি খবর জানিয়ে রাখতে চাইছি। উনিশ শতকের ইওরোপে জাঁদরেল ইঞ্জিনিয়ারদের অন্যতম ইসমবার্ড কিংডম ব্রুনেল ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ে-র পরামর্শদাতা হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলেন। তিনি নিজে কলকাতায় না এলেও, শেয়ালদা স্টেশনের আদি প্ল্যানটি তাঁরই রচনা। ইউনিভার্সিটি অফ ব্রিস্টলের লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত ব্রুনেলের স্কেচ-খাতায় তার খসড়া চিত্রও রয়েছে। এরচেয়েও আকর্ষণীয়, ব্রুনেল চেয়েছিলেন এক নতুন ধরনের রেল পাততে। সেই রেল-এর প্রস্থচ্ছেদের ও তা আটকাবার ব্যবস্থার ছবি দেওয়া হলো। কিছু দিন

ব্যবহারের পর রেলটিকে খুলে উলটোভাবে বসিয়ে আবার কাজে লাগানোর কথা চিন্তা করেছিলেন তিনি। কিন্তু শেষ অবধি ব্রুনেল প্রস্তাবিত এই 'বুল হেড' রেল সত্যিই বসানো হয়েছিল কিনা জানা যায় না।[৯]

ভারত লুণ্ঠনের কারিগরি হাতিয়ার হিসেবে রেলওয়ে নিয়ে বহু আলোচনা হয়েছে, কিন্তু ব্রিটিশ রেল ইঞ্জিন নির্মাতারা কিভাবে ভারতে তাদের বাজারকে কুক্ষিগত করে রেখেছিল, তার ছবিটা এখনও চোখের আড়ালে। ঘটনাটি তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ তার সঙ্গেই অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ভারতে রেল ইঞ্জিন নির্মাণ-শিল্পের বিকাশের ধারা।

কলকাতার প্রথম রেলপথের উদ্বোধনের দিনটি পিছিয়ে দিতে হয়েছিল রেলের কামরাগুলি সমেত একটি জাহাজডুবির জন্য। শেষ পর্যন্ত কলকাতার দুই বিখ্যাত ঘোড়াগাড়ি নির্মাতা, স্টুয়ার্ট অ্যান্ড কোম্পানি ও সেটন কোম্পানি শূন্যস্থান পূরণ করেন।[১০] তা বলে রেল ইঞ্জিনের মতো কারিগরি জটিলতা হাসিল করার মতো সামর্থ্য কি উনিশ শতকের ভারতে আশা করা যায়?

উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করার আগে, বিদেশী কোম্পানিরা কে কত রেল ইঞ্জিন ভারতে বেচেছিল সেটার পরিসংখ্যান নেওয়া দরকার। আমেরিকা বা জার্মানির তুলনায় ব্রিটেনের রেল ইঞ্জিন নির্মাতাদের কাছেই ভারতীয় বাজার ছিল বিশেষ মূল্যবান। রেল-শিল্পে পথিকৃৎ হলেও ইওরোপ ও আমেরিকার বাজার অল্প অয়েক বছরের মধ্যেই ব্রিটেনের হাতছাড়া হয় জার্মানি ও আমেরিকার এই শিল্পে স্বনির্ভরতা অর্জন করার সঙ্গে-সঙ্গে। কিন্তু এই দুই দেশের ইঞ্জিন-নির্মাতারা মূলত তাদের নিজেদের দেশের প্রয়োজন মেটাতেই ব্যস্ত ছিল। ১৯০৪ থেকে ১৯৩৮-এর মধ্যে নির্মিত জার্মান ইঞ্জিনের মাত্র সিকিভাগ রপ্তানি হয়েছিল। আর আমেরিকার মাত্র একুশ শতাংশ। ব্রিটিশ নির্মাতাদের তরফ থেকে তুলনামূলক পরিসংখ্যান পাওয়া যায় না। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে ব্রিটেনের বৃহত্তর রেল ইঞ্জিন নির্মাণকারী সংস্থা নর্থ ব্রিটিশ-এর উৎপাদনের নব্বই শতাংশই ছিল রপ্তানি করার জন্য চিহ্নিত।[১১]

| কোম্পানি | পর্ব | নির্মিত ইঞ্জিন সংখ্যা | ভারতে রপ্তানি সংখ্যা |
|---|---|---|---|
| নর্থ ব্রিটিশ | ১৯০৩-১৯৪৮ | ১০৫২৯ | ২৬৫০ |
| বেয়ার পিকক | ১৮৫৫-১৯৫৫ | ৭১০০ | ৩২০ |
| ভালকান ফাউন্ড্রি | ১৮৩৩-১৯৪৮ | ৫৬২৭ | ২৬৭৩ |
| নিলসন রিড | ১৮৩৮-১৯০৩ | ৫৯১১ (আনু·) | ১৯৯১ |
| শার্প স্টুয়ার্ট | ১৮৩৪-১৯০৩ | ৫০০০ (আনু·) | ৭৩৯ |
| কিটসন | ১৮৪০-১৯৩৮ | ৫৪৭৩ (আনু·) | ১২৭৭ |
| ডাব্‌স | ১৮৬৫-১৯০৩ | ৪৪৭৮ (আনু·) | ৯৭৬ |
| হথর্ন লেসলি | ১৮১৭-১৯৩৯ | ২৭৮৩ | ১৫৬ |
| অ্যাভনসাইড ইঞ্জিন | ১৮৪১-১৯৩৫ | ২০০০ (অনু·) | ২৬০ (আনু·) |
| ম্যানিং ওয়ার্ডল | ১৮৫৯-১৯২৬ | ২০০৪ (আনু·) | ৭০ |
| নেস্মিথ উইলসন | ১৮৩৯-১৯৩৮ | ১৬০০ (আনু·) | ৬০০ (আনু·) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| আর্মস্ট্রং হুইটওয়ার্থ | ১৯১৯-১৯৩৭ | ১৪৬১ | ২৫০ |
| ইয়র্কশায়ার ইঞ্জিন | ১৮৬৬-১৯৪৬ | ৬৭৮ | ১৩৪ |
| রেলওয়ে ফাউন্ড্রি | ১৮৩৮-১৮৫৮ | ৬৩৫ | ৪৯ (কমপক্ষে) |
| ডব্লু. জি.বাগনাল | ১৯১৩-১৯২৮ | ৩৬৪ | ১৩৭ |
| সেন্টিনেল ওয়াগন | ১৯২৪-১৯৩৪ | ২৫৯ | ৯৫ |

তুলনামূলক ভাবে দুটি প্রধান জার্মান নির্মাতার ক্ষেত্রে পরিসংখ্যানটি এই রকম[১২]

| কোম্পানির নাম | পর্ব | মোট উৎপাদন | রপ্তানির জন্য | ভারতের জন্য |
|---|---|---|---|---|
| হ্যানোম্যাগ | ১৮৪৬-১৯৩১ | ১০৭৬৫ | ২৭২১ | ১৩৫ |
| হেন্‌শেল | ১৮৪৮-১৯৪১ | ২৫০০০ (আনু·) | ৭৫০০ (আনু·) | ৫৭২ |

এই আলোচনা নিছকই পণ্ডশ্রম হতো, যদি ভারত রেল ইঞ্জিন নির্মাতা হিসেবে নিজের দাবি প্রতিষ্ঠা করতে না পারতো।

দক্ষতার দিক থেকে ভারতীয় কারখানায় রেল ইঞ্জিন নির্মাণে কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়নি। ব্রিটিশ শাসনের অবসানের আগে প্রায় সাতশো রেল ইঞ্জিন তৈরি হয়েছিল ভারতে। যেখানে সাতশো ইঞ্জিন তৈরি হয় তবু স্বনির্ভরতা আসে না, তার বিশদ ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

জামালপুরে ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়ের কারখানায় ১৮৮১ থেকে ২-৪-০ ধাঁচের এবং ১৮৮২ থেকে ০-৬-০ ধাঁচের ইঞ্জিন নির্মাণ শুরু। ভারতের প্রথম রেল ইঞ্জিন অবশ্য বোম্বাইয়ের বাইকুল্লা কারখানায় ১৮৬৫-তেই তৈরি হয়েছিল। কিন্তু ওই একটিই, এরপরে আর কারখানাটি কোনো ইঞ্জিন তৈরি করেনি।[১৩]

ব্রিটিশ আমলে জামালপুর কারখানাই ছিল ভারতের রেল ইঞ্জিন তৈরির মূল ঘাঁটি। বিদেশী ইঞ্জিনের তুলনায় তাদের দামও যেমন অনেক কম ছিল, উপযোগিতার দিক থেকেও তা ছিল সন্তোষজনক। কিন্তু ভারত সরকার ১৯০৩-এ একটি আইন প্রণয়ন করে নির্দেশ দিলেন 'BESA' স্ট্যান্ডার্ড অনুসারে নির্মিত ইঞ্জিন ছাড়া আর কিছু ব্যবহার করা চলবে না। ফলে, একদিকে যেমন ব্রিটেনের প্রতিযোগী দেশ থেকে ইঞ্জিন কেনা প্রায় বন্ধ হয়ে গেল, তেমনই ভারতে রেল ইঞ্জিন উৎপাদনও দারুণভাবে ব্যাহত হলো। ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়ের তাদের নিজস্ব সব ইঞ্জিন ভারতেই তৈরি করার পরিকল্পনা আর কার্যকর হলো না। 'স্পেশাল স্যাংশান' নিয়ে তবে নন-স্ট্যান্ডার্ড DT Class 0-6-2T ইঞ্জিন কিছু তৈরি করেছিল তারা। লোকোমোটিভ সুপারিন্টেন্ডেন্ট ডি· ওয়েডারবার্ন লিখেছিলেন, ১৯০৮-এ তাঁকে যে CBT Class 0-8-0T ইঞ্জিন তৈরি করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল সেটা 'ভাগ্যের কথা'।[১৪]

১৮৯৮-৯৯ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ জামালপুরে তৈরি হয় 'লেডি কার্জন' নামে একটি রেল ইঞ্জিন, যার

একটি যন্ত্রাংশও বিদেশ থেকে আমদানি করা হয়নি।[১৫]

জামালপুরের কারখানায় রেল ইঞ্জিন ও রেলওয়ে-সংক্রান্ত যাবতীয় যন্ত্রপাতি তৈরি তো হতোই, তাছাড়া নিজস্ব কারখানার জন্য টুল ও মেশিনারি ইত্যাদিও তারা নিজেরাই বানাত। ১৮৯০ খ্রীস্টাব্দের একটি রিপোর্টে সেখানে লেদ মেশিন তৈরির উল্লেখ আছে।[১৬]

জামালপুর কারখানার পরিচালনাভার বিদেশী ইঞ্জিনিয়ারদের হাত থাকলেও সুদক্ষ কারিগররা ছিলেন সবই ভারতীয়। এবং তাঁরা প্রধানত এসেছিলেন মুঙ্গের থেকে। দেশী লোহা থেকে কামান ও বন্দুক তৈরির শিল্প আজও মুঙ্গের থেকে লুপ্ত হয়নি। কিন্তু মুঙ্গেরের কর্মকারদের স্বর্ণযুগের অবসান ঘটেছে উনিশ শতক শেষ হওয়ার আগেই। ১৮৯০-এ যেখানে বছরে দু' হাজার বন্দুক ও পিস্তল তৈরি হতো, ১৯০৮-এ সেটা মাত্র আটশোয় এসে ঠেকে। বাইশটি দোকানের জায়গায় মাত্র তেরোটি। ১৮৯০-এর আগেই অবশ্য মুঙ্গেরের কর্মকাররা ব্যবসার অবনতি দেখে দলে-দলে চাকরি নিতে শুরু করেছেন এবং ১৮৯০-এই দেখা যায়, দু' হাজার মুঙ্গেরী কারিগর জামালপুরে ঢুকেছেন। এককালের এই বন্দুক-নির্মাতাদের হাতেই তৈরি হয় উনিশ শতকের ভারতে তৈরি রেল ইঞ্জিনের অধিকাংশ।[১৭]

ভারতে তৈরি রেল ইঞ্জিন[১৮]

| কোম্পানি | স্থান | সংখ্যা | কাল |
|---|---|---|---|
| বোম্বে, বরোদা অ্যান্ড সেন্ট্রাল ইন্ডিয়া রেলওয়ে | আজমীর | ৪৪৪ | ১৮৯৬-১৯৪১ |
| ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়ে | জামালপুর | ২১৭ | ১৮৮৫-১৯২৩ |
| নর্থ ওয়েস্টার্ন রেলওয়ে | লাহোর | ২৭ | ১৮৯৫-১৯০৭ |
| দার্জিলিং-হিমালয়ান রেলওয়ে | তিনধরিয়া | ২ | ১৯১৯-১৯২৩ |
| হাওড়া-আমতা লাইট রেলওয়ে | বাঁকড়া | ২ | ১৯২৫-১৯৪১ |
| শাহদারা-সাহারানপুর লাইট রেলওয়ে | সাহারানপুর | ৪ | ১৯৪৬ |
| আউধ অ্যান্ড রোহিলাখন্দ রেলওয়ে | লক্ষ্ণৌ (চারবাগ) | ১ | ১৮৯৫ |
| গ্রেট ইন্ডিয়ান পেনিনসুলার রেলওয়ে | বাইকুল্লা (বোম্বাই) | ১ | ১৮৬৫ |

বাঁকড়ার তৈরি রেল ইঞ্জিনের সম্বন্ধে কয়েকটি তথ্য সংগ্রহ করা যায়। হাওড়া ময়দান থেকে

আমতা ও শিয়াখালা অবধি মার্টিন কোম্পানির ছোট্ট দু' ফুট চওড়া রেল লাইন এখন পরিত্যক্ত। ১৮৯৭-এ এই পথে প্রথম ট্রেন-চলাচল শুরু হয়। ১৯২৫-এ এই কোম্পানির কারখানায় ম্যানিং ওয়ার্ডল মডেলের (ক্লাসজি, ১৫½ টন) ইঞ্জিন (৩৬ নং) তৈরি হয়। এর বয়লারটি শুধু আমদানি করা হয়েছিল বিদেশ থেকে। ১৯২৮-এ বাঁকড়ায় তৈরি হয় হানসলেট (ক্লাস : ই)-এর অনুকরণে আর একটি ইঞ্জিন (১৪ বা ১৪-ই নং)। এছাড়া চার-চাকা বিশি. একটি ডিজেল ইঞ্জিনও বাঁকড়ায় তৈরি হয় ১৯৫১-য়। ৬-সিলিন্ডারের ডজ ইঞ্জিনের বদলে ১৯৫৮ য় সেটিতে আরও শক্তিশালী মার্সিডিজ বেন্জ ইঞ্জিন যুক্ত করা হয়।[১৯]

হ্যারল্ড রবিন্স, আর্থার হেইলি প্রমুখ জনপ্রিয় লেখকরা এয়ারপোর্ট, মোটরকার ইন্ডাস্ট্রি ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে কয়েকটি জার্নালিস্টিক ধাঁচের বেস্ট-সেলার উপন্যাস লিখেছেন। অবশ্য এ ধরনের উপন্যাস আগেও লেখা হয়নি তা নয়। ইলিয়া এরেনবুর্গের 'দা লাইফ অ্যান্ড ডেথ্ অফ অ্যান্ অটোমোবাইল' তার সেরা উদাহরণ। কিন্তু 'রেলওয়ে'কে কেন্দ্র করে ১৮৯৮ সালে রচিত একটি বাংলা উপন্যাসের কথা প্রায় কারুরই মনে নেই।

'কোন বহুদর্শী রেলওয়ে কৰ্ম্মচারী প্রণীত ও প্রকাশিত' এই উপন্যাসটির নাম 'রেলওয়ে চরিত'। উৎসর্গ-পত্র থেকে শুধু লেখকের পিতৃব্যের নামটি জানা যায়—রামযদু বন্দ্যোপাধ্যায়। এর বেশি ব্যক্তিগত পরিচয় দাখিলে তাঁর অভিরুচি ছিল না।

'নতুন বাঙ্গালী দমন রেলওয়ে' লাইনের একটি স্টেশনে রেলওয়ের বিভিন্ন চরিত্রদের সঙ্গে লেখক ও তাঁর বন্ধুর আলাপ-পরিচয়ের সূত্রেই ঘটনার অগ্রগতি। উপন্যাসের পর্ব-বিভাগও হয়েছে বিভিন্ন রেলওয়ে চরিত্রদের অনুসারে—তার-বাবু পর্ব, টিকিট-বাবু পর্ব, লগেজ-বাবু পর্ব, বারান্দা-বাবু (platform) পর্ব, জমাদার-বাবু পর্ব, মাল-বাবু পর্ব, স্টেশন-মাস্টার পর্ব বা বড়-বাবু পর্ব, হিসাবনবিশ-বাবু এবং সবার শেষে রমণী-দরবাব পর্ব।

তার-বাবু অর্থাৎ টেলিগ্রাফ মাস্টারের অধ্যায়েই সবচেয়ে ভালভাবে প্রকাশ পেয়েছে যে, লেখক রেলওয়ের বিভিন্ন কর্মকান্ডের সম্বন্ধে রীতিমতো ওয়াকিবহাল। কথায়-কথায় টেলিগ্রাফের কলকব্জার প্রসঙ্গও অনায়াসে চলে এসেছে। যদিও তার-বাবুর চরিত্রচিত্রণই ছিল তাঁর মূল লক্ষ্য। শুধু তার-বাবু নয়, নানা রঙ চড়িয়ে রেলওয়ের বহু বাঙালি বাবুর ছবি তিনি এঁকেছেন। চেহারা, আদব-কায়দা কি বোলচালে তাঁরা স্বতন্ত্র হলেও, শেষ বিচারে তারা প্রত্যেকেই এক-একটি উপরি-বাবু। বিভিন্ন বাবুদের উপরি-রোজগারের বিভিন্ন পদ্ধতি বর্ণনার ভাষা হুতোমের সঙ্গে তুলনা করা চলে না, কিন্তু পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার তারিফ করতেই হয়।

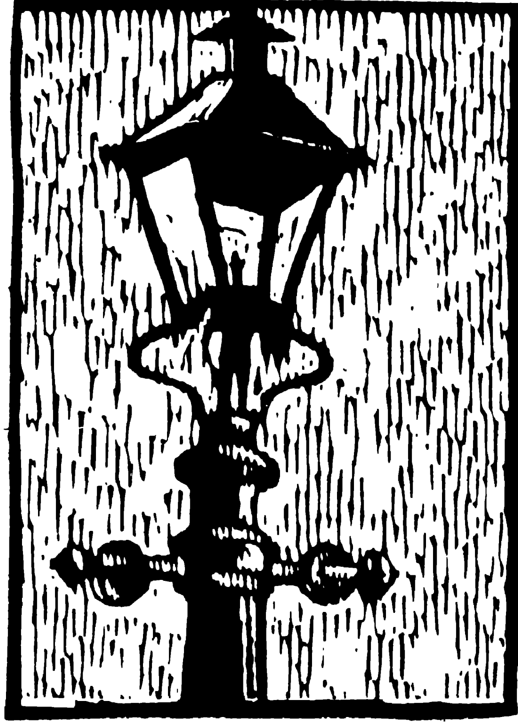
এক জায়গায়, তার-বাবু, কলের সঙ্কেত ভাষায় রূপান্তরিত করে বুঝলেন সংবাদ-প্রেরক কিছু ভুল করেছে। 'সেন্ডিং চিকুই' কথার কোনো মানে হয় না। কিন্তু তিনি যতবার সংবাদ গ্রহণ করেন, সেই 'চিকুই' আর তাকে ছাড়ে না। শেষ পর্যন্ত তাঁর বন্ধু রহস্য ভেদ করে বললেন, ওটার উচ্চারণ 'চিকুই' নয়, ওটা 'চেক'—'টাকার হুন্ডিকে চেক্ কহে'।

যে-টিকিট বাবুটি ভাঙানির হিসেব গণ্ডগোল করে কিঞ্চিৎ ইধার-উধারের ষোলকলা রপ্ত করেছেন তাঁর কামরাটির বর্ণনাও চমৎকার, "আমরা এতক্ষণ পর্য্যন্ত অদূরে দণ্ডায়মান থাকিয়া, টিকিটবাবুর বিক্রম, কৌশল ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব স্থিরভাবে লক্ষ্য করিতেছিলাম। এক্ষণে অবকাশ বুঝিয়া, ও বৃদ্ধের কাতরোক্তিতে ব্যথিত হইয়া, সেই গবাক্ষের নিকট উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম,

টিকিটবাবু একখানি টুলের উপর বসিয়া আছেন। সম্মুখে একখানি শত-ছিদ্র-বিশিষ্ট আম্রকাষ্ঠের টেবিলের উপর একটি ক্ষুদ্র আলমারি। তাহার ভিতর শ্রেণীবদ্ধ করিয়া, টিকিটগুলি স্তরে স্তরে সজ্জিত রহিয়াছে। সর্ব্বনিম্নের টিকিটখানি, কালী ঠাকুরের জিহ্বার মত, কোটর হইতে অর্দ্ধেক বহির্গত হইয়া আছে। অথবা শীঘ্রই গৃহত্যাগ করিতে হইবে ভাবিয়া, যাত্রা করিয়া বসিয়া আছে। আলমারির সর্ব্বনিম্ন কোটরে টাকা পয়সার থাক দেওয়া আছে। এক কোণের দিকে কিছু চাকচিক্য বিশিষ্ট কতকগুলি সিকি দুয়ানি ও টাকা রহিয়াছে। আমরা অনুমানে বুঝিলাম, সেগুলি টিকিট-বাবুর সেদিনকার পাওনা হইবে। টেবিলের চারিদিকে অনেকগুলি বড় বড় কেতাব রহিয়াছে। বাম-পার্শ্বে চৈত্র-পূজার সঙের ন্যায় একটি লৌহ নির্ম্মিত যন্ত্র। সেই যন্ত্র দ্বারা টিকিটে তারিখ দেওয়া হয়।"

বিভিন্ন বাবুদের সাক্ষাৎ লাভের পর একটি রেলওয়ে জার্নির অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করার সময়ে লেখক নিজের কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনের একটি পরিচয় দিয়েছেন। ব্রাহ্ম যুবতীদের 'উন্নত হৃদয়' তাঁকে রীতিমতো বিচলিত করেছিল।

উপন্যাস শেষ হয়েছে 'রমণী-দরবার পর্বে'। "রেলওয়ে বাবুদিগের বাসা, সৈন্যের বারিকের বা কবুতরের গৃহের ন্যায় এক দৌড় চালা গৃহের মধ্যে অপ্রশস্ত দেওয়াল দ্বারা কামরারূপে বিভক্ত করা। তাহারই একটি কি দুইটি লইয়া, এক এক বাবুর বাসা।" মহাতর্ক বেধেছে মহিলা মহলে, 'কার ভাতার বড়'। পাঠকদের বিচারকের আসনে বসিয়ে দিয়ে প্রথম খণ্ডের শেষে বিদায় নিয়েছেন লেখক। দ্বিতীয় খণ্ডটি বেরিয়েছিল কিনা জানা নেই।



# গ্যাসালোকে কলিকাতা যেন আভামাখা

কি বাহার গ্যাসের আলো ।
বিজ্ঞান প্রভাবে বটে ভাল কীর্তি প্রকাশ হ'ল ।
রাজধানী কলকাতা শহর এত দিনে জাঁকাইল ।
পথে ঘাটে আসতে-যেতে, দিবারাতে ভাবনা গেল ।
মরি কি কলকারখানা, তেল সলতে কিছু লাগে না,
ধোঁয়াতে জ্বলছে আলো, বাতির চেয়ে দেখতে ভালো ।
সুচিকণ আলোকছটায় পূর্ণিমার চাঁদ লজ্জা পায় ।
দিন-রাত্রির নাই ভেদাভেদ দেখেশুনে প্রাণ জুড়াল ।

না, কবিতার মতো পড়লে চলবে না । রামপ্রসাদী সুরে গাইতে হবে । গীত রচয়িতা

যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সভাকবি রাধানাথ মিত্র স্বয়ং সেই নির্দেশ দিয়ে গেছেন কলকাতার পথে প্রথম গ্যাসের আলো জ্বলার কিছুদিনের মধ্যেই ।[১]

গ্যাসের আলো আরও কিছু স্রষ্টার কবিত্ব বা গীতিশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করেছিল । দীনবন্ধু মিত্রের বিখ্যাত পঙ্‌ক্তি, 'জ্বলিতেছে দীপপুঞ্জ দুলিতেছে পাখা, গ্যাসালোকে কলিকাতা যেন আভামাখা ।' শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর ১৮৭৭-এ 'ভিক্টোরিয়া গীতিমালা' গ্রন্থে মহারানীর কর্ণকুহরে ভৈরবী সুরে নিবেদন করেন, "এহেন গ্যাসের আলো হেরিনু তব কৃপায় ।"

বৌবাজার ও বেন্টিঙ্ক স্ট্রিটের সংযোগস্থলে একটি বাড়ির বাইরের দেওয়ালে গ্যাসের আলো লাগাবার লোহার ব্র্যাকেটের গায়ে ঢালাই করা হরফে এই শব্দ ক'টা এখনও পড়া যায় :
MESSENGER & COMPANY. BIRMINGHAM. 1856.

ব্যাপারটা বেশ গুরুতর, কারণ ১৮৫৬-র ১৪ জানুয়ারি 'সমাচার সুধাবর্ষণ' লিখেছে, "গ্যাস কোম্পানিরা কলিকাতা রাজধানী মধ্যে কাঙ্গারবেঙ্গির কমিস্যনরদিগের আদেশক্রমে যে প্রকার আলো দিবেন কএক দিবসাবধি তাহার নমুনা দর্শাইতেছেন··· ।"[২] এই নমুনা দর্শিয়েছিল 'দা ওরিয়েন্টাল গ্যাস কোম্পানি' এবং শেষ পর্যন্ত ১৮৫৭-র জুলাই মাস থেকে কলকাতার পথে পাকাপাকি ভাবে গ্যাসের আলো জ্বলতে শুরু করে । বোঝাই যাচ্ছে যে বর্তমানে ওই অকেজো পরিত্যক্ত ব্র্যাকেটটি নিশ্চয় প্রথম দফায় ইংলন্ড থেকে আনানো গ্যাসের আলো-সংক্রান্ত যন্ত্র ও উপকরণের অন্তর্ভুক্ত ছিল । এরকম একটা জিনিস বিলেতে কেউ খুঁজে পেলে হইচই পড়ে যেত । ছবিটবি তুলে লেখালেখি করে শেষ পর্যন্ত 'অ্যান্টিক স্ট্রিট ফার্নিচার' বলে কোনো-না-কোনো মিউজিয়ামে পুরে ফেলত ।

কলকাতায় পথের আলো ১৮৫৭-য় জ্বলেছিল ঠিকই, তা বলে গ্যাসের আলো তার আগে এখানে একেবারেই মুখ দেখায়নি তা নয় । ১৮২২-এর ২৮ মার্চ 'ক্যালকাটা গেজেট'-এ প্রকাশিত খবর থেকে জানা যায়, দু' বছর আগে একটি সম্পূর্ণ গ্যাস লাইট যন্ত্র এসেছিল কলকাতায় এবং "সম্প্রতি চৌরঙ্গী থিয়েটারে গ্যাসের আলো দেওয়ার একটি প্রস্তাব এসেছে । কিন্তু গ্যাস তৈরির খরচ তুলনামূলকভাবে সামান্য হলেও, যন্ত্র নির্মাণের খরচ নেহাত কম নয়, ফলে এদেশের কথা বিচার করলে উপযোগিতার সঙ্গে অর্থনৈতিক দিকটির তুলনায় ফল কি দাঁড়াবে তা নিতান্তই সন্দেহজনক··· ।"[৩]

এই খবর বের হওয়ার ঠিক দু'দিন পরে 'সমাচার দর্পণ'-এর বাঙালি প্রতিবেদক 'ক্যালকাটা গেজেট'-কে টেক্কা দিয়ে নতুন তথ্য ও মাত্রা যোগ করেন, "ইংলন্ড দেশে নলদ্বারা এক কল সৃষ্টি হইয়াছে তাহার দ্বারা বায়ু নির্গত হইয়া অন্ধকার রাত্রিতে আলো হয় । সম্প্রতি শুনা গেল যে মোকাম কলিকাতার ধৰ্ম্মতলাতে শ্রীযুক্ত ডাক্তার টৌম্লিন সাহেব আপন দোকানে ঐ কল সৃষ্টি করিয়াছেন অনুমান হয় যে লাটিরির অধ্যক্ষেরাও লাটিরির উপসত্ত্ব হইতে কলিকাতার রাস্তাতে ঐরূপ আলো করিবেন ।"[৪]

যাই হোক আলোকদাতা হিসেবে নারকোল, সরষে ও রেড়ির তেলকে বিদায় করার প্রথম বড় ষড়যন্ত্রের সূচনা ১৮৫৪-য় । এই বছরেই প্রতিষ্ঠা হয় ওরিয়েন্টাল গ্যাস কোম্পানির । বর্তমান মহম্মদ আলি পার্কের জায়গায় (হ্যালিডে স্ট্রিটে) বসেছিল কোম্পানির প্রথম প্ল্যান্ট—গ্যাস তৈরির কারখানা । তিন লক্ষ কিউবিক ফিট গ্যাস তৈরির ব্যবস্থা । এই কারখানা পরে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে উঠে আসে এবং শেষ পর্যন্ত ১৮৭০ থেকে পাকাপাকিভাবে রয়েছে তার বর্তমান ঠিকানায়—ক্যানাল রোড

(ইস্ট)-এ।

নারকেলডাঙা থেকে গ্যাস সরবরাহ শুরু হওয়ার পরে 'সুলভ সমাচার' (৫ মাঘ ১২৭৭) লিখল, "কলিকাতায় একেবারে আলোর কুরকুট্টি। ময়রারা পর্য্যন্ত গ্যাসের আলো জ্বালিয়া....দু হাত ছুঁড়িয়া মশা মারিতে মারিতে রাত্রি পর্য্যন্ত লুচি, কচুরি, তরকারি, সন্দেশ, মেঠাই, ছানাবড়া কতই ভিয়ান ও বিক্রয় করিতেছে।"

ময়রাদের জন্য গ্যাস কোম্পানি নাকি গভীর রাত অবধি গ্যাস সরবাহের বিশেষ ব্যবস্থা করেছিল। গড়ের মাঠে ২১০, কেল্লায় ৩১০, রাস্তা ও গলিতে ২৭১১, গৌখানায় ১৩ ও গৃহস্থের বাড়িতে ৪৫০০-এর বেশি গ্যাসের আলো জ্বলত তখন। একটা আলো জ্বালালে ৪ টাকা ও দুটো জ্বালালে ৭ টাকা করে দিতে হত। তবে এটাও স্বীকার করেছিলেন প্রতিবেদক যে, "একটা গ্যাসের আলো তেরটা বাতির আলোর সমান। নারিকেলডাঙার বাতিঘরে এই ধোঁয়া করিবার জন্য প্রতিদিন প্রায় দেড় হাজার মোন পাতুরে কয়লা পোড়ান হইয়া থাকে; সেই ধোঁয়া হিরাকশ, করাতের গুঁড়া ও চুণ দিয়া সাফ করিলেই ভাল গ্যাস হয়।"

রাস্তায় গ্যাসের আলো জ্বলার রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে চেয়ে সংবাদপত্রটি জানিয়েছিল, "কলিকাতার রাস্তার দুইধারে যে লোহার ফাঁপা থাম আছে, সেই থামের ভিতর আবার সরু সরু চোঙ্গ আছে, তাহার সঙ্গে বড় চোঙ্গের যোগ থাকাতে বড় চোঙ্গের ভিতরকার গ্যাস ছোট চোঙ্গে আসিয়া পড়ে, এই ছোট চোঙ্গের আগা থামের উপরকার লাণ্টনের ভিতর থাকে, লাণ্টনের দ্বার খুলিয়া সেইখানে আলো ধর, অমনি তাহা দপ করিয়া ফুলের মত হইয়া জ্বলিয়া উঠিবে। সন্ধ্যার সময় একটা সিঁড়ি ঘাড়ে করিয়া কে একটা লোক দৌড়িতে দৌড়িতে এই রূপ ঝাঁ ঝাঁ করিয়া গ্যাসের লাণ্টন সকল জ্বালাইয়া যায় অনেকেই তাহা দেখিয়াছেন।"

গ্যাসের আলো নিয়ে কবিতা আর গান বাঁধা হয়েছিল ঠিকই কিন্তু গ্যাসের আলোর প্রবর্তনকে ঘিরে প্রচণ্ড বিতর্কেরও ঝড় উঠেছিল। রাস্তায় গ্যাসের আলো বসিয়ে সেই অছিলায় বাড়ির ট্যাক্স বাড়িয়ে দেওয়ার অভিসন্ধির বিরুদ্ধে সেকালে সবচেয়ে রুখে দাঁড়িয়েছিল 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' তথা গিরিশচন্দ্র ঘোষ।[৫] 'সর্বশুভকরী পত্রিকা'ও আপত্তি জানিয়েছিল, "...গ্যাস বিষয়ক নূতন আইনের যে পাণ্ডুলিপি প্রকাশ হইয়াছে তাহাতে ব্যক্ত হয় যে সকল রাস্তায় গ্যাস আলোক দেওয়া হইবেক সেই সকল রাস্তার ধারে মাসিক ৫ টাকা ভাড়ার অতিরিক্ত ভাড়ার উপযুক্ত যে সকল বাটী আছে তাহার ভাড়ার টাকার উপর শতকরা ৪ টাকা অতিরিক্ত টাক্‌স দিতে হইবেক।"[৬]

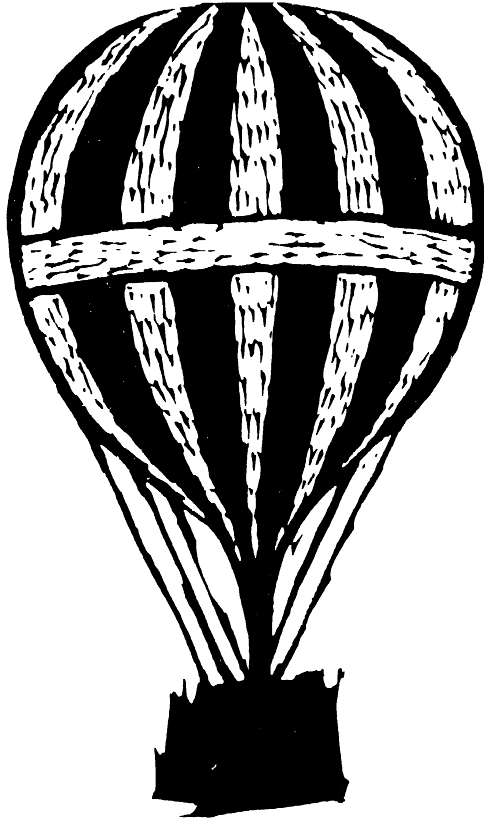
ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিক থেকে তাপদানকারী জ্বালানি হিসেবে প্রথম গ্যাসের ব্যবহার শুরু হয়। ১৯৩৭ থেকে ১৯৪০-এর মধ্যে কলকাতার রাস্তায় গ্যাসের বাতির সংখ্যা সর্বোচ্চ তেইশ হাজারে পৌঁছেছিল। মনে রাখা দরকার বিজলি আলো কিন্তু ১৯০১ থেকেই জ্বলতে শুরু করেছে। ১৯৬৫ থেকে ১৯৬৯-এর মধ্যে কলকাতার পথ থেকে সব গ্যাসের আলো নির্মূল হয়ে যায়। নারকেলডাঙার প্ল্যান্ট থেকে সর্বাধিক সাড়ে চার মিলিয়ন কিউবিক ফিট পর্যন্ত গ্যাস সরবরাহ করা হয়েছে। প্ল্যান্ট এখন বন্ধ, কিন্তু যন্ত্রপাতি সবই সংরক্ষিত। পাশের রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় এখনও তার বিশাল লোহার খাঁচা চোখে পড়ে। এই খাঁচার মধ্যেই উল্টোনো একটা বাটিকে ক্রমশ ওপরে ঠেলে তুলে তার নীচে জমা করা হতো গ্যাস।

গ্যাসের আলোয় বিমুগ্ধ নয়ন মেলে বসে ছিলেন না অবশ্য সবাই। গ্যাসের উৎপাদন ও তার

দহন প্রক্রিয়ার রাসায়নিক ব্যাখ্যা নিয়ে বাংলায় অনেকেই লিখেছেন এবং ১৮৭৫-এর ১১ মে 'স্টেটসম্যান' পত্রিকায় একজন চিঠি লিখে জানান যে, বেথুন সোসাইটিতে বাবু তারাপ্রসন্ন রায় সম্প্রতি, 'কোল্ গ্যাস' নিয়ে যে বক্তৃতা দেন তাতে কলকাতার গ্যাসের আলোর প্রসঙ্গও উত্থাপিত হয়। পত্রলেখক দাবি করেছিলেন, পাবলিক মিটিঙে এর আগে আর কোনো বাঙালি রসায়ন বিষয়ে বক্তৃতা দেননি। এটি অবশ্য ঠিক নয়। মেডিকেল কলেজ থিয়েটার হলে ১৮৬৪-র ৬ মে মহমেডান লিটেরারি সোসাইটির সভায় ডক্টর কানাইলাল দে-র 'দহন' বিষয়ে বক্তৃতা শুনতে হাজির ছিলেন কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের প্রায় আটশো শ্রোতা।[৭] এই মহমেডান লিটেরারি সোসাইটির সভায় তারাপ্রসন্ন রায়ও পরবর্তীকালে বক্তৃতা দিয়েছেন।

কিছু বাঙালি প্রতিষ্ঠান উনিশ শতকেই গ্যাস-সংক্রান্ত কারিগরি কাজকর্মে উদ্যোগী হয়েছিলেন। ১৮৪০ সালে প্রতিষ্ঠিত বি· এল· ঘোষ অ্যান্ড কোম্পানি ১৮৮১-র ৬ ডিসেম্বর 'স্টেটসম্যান'-এ বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন :

Estd. 1840<br>
B. L. GHOSH & Co.<br>
GAS-FITTERS, PLUMBERS, AND CONTRACTORS<br>
no. 145, Cornwallis-street, Calcutta<br>
House Fitted Up With<br>
GAS-FITTINGS<br>
AND<br>
WATER PIPES<br>
Estimates furnished and works<br>
performed at the most reasonable prices



# বেলুনে বিবি, বাঙালি ও সাহেব ভায়া

বেলুন নামে আদিম ব্যোমযানে চড়ে মানুষের গগন-বিহারের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করার ব্যাপারেও নারকেলডাঙার গ্যাস কারখানার একটি অবদান আছে। কোল গ্যাস তৈরি শুরু হওয়ার পরে বেলুনে হাইড্রোজেন পোরার রেওয়াজ কমে আসে। নারকেলডাঙার গ্যাস কোম্পানির মাঠটা তাই এক সময়ে বেলুন-ফিল্ড হিসেবেও নাম করেছিল। এখান থেকেই প্রথম ভারতীয় 'এরোনট' ব্যোমযাত্রী রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর নিজের বেলুন 'সিটি অফ ক্যালকাটা' চড়ে প্রথম একা আকাশে পাড়ি দিয়েছিলেন ১৮৮৯-এর ৪ জুন।

হাজার হাজার কাতার কাতার
লোক চলেছে ভাই।
ছেলে বুড়ো কানা খোঁড়া
কেউ তো বাকী নাই ॥
বেলুনবাজ সাহেব ভায়া,
বেলুনে তুলবে কায়া,
উড়বে খুব লাগিয়ে হাওয়া,
লুটবে টাকা তাই ॥

রাজকৃষ্ণ রায়ের ১৮৯১ সালে লেখা প্রহসনের প্রথম দৃশ্যে বাউলদের গান। গান তো বাঁধতেই হবে, না হলে 'বেলুনে বাঙালী বিবি' প্রহসন জমবে কী করে! টিভলি গার্ডেনে বিকেল পাঁচটার সময়, "পার্সিভাল স্পেন্সার সাহেব বেলুনে চোড়ে, আকাশে চোড়ে, প্যারাসুট ধোরে লাফিয়ে পড়বে"—তাই দেখতেই লোকে চলেছে। দয়ালবাবুর গিন্নি অবশ্য নিজের বাড়ির ছাতে দূরবিন চোখে লাগিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। নব্য বাঙালি বিবির আকাশে ওড়ার সাধকে রাজকৃষ্ণ ব্যঙ্গ করলেও প্রমীলা কণ্ঠের একটি সংলাপ কলকাতার আকাশে উনিশ শতকের বেলুনবাজির মর্মার্থ পেশ করেছে, "বাঙালী পুরুষ বেলুনে উঠলে বাঙালীরা তাকে উৎসাহ দেয়না, বরং নিরুৎসাহ করবার জন্যে ঠাট্টা বটকিরে করে। তার সাক্ষী বাবু রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বেচারী প্রাণের মায়া ভুলে, আত্মীয়স্বজনের মায়া ভুলে, বাঙালী জাতকে উঁচুতে তোলবার জন্যে বেলুনে চোড়ে উঁচুতে উঠলো। কিন্তু কটা বাঙালী বাহবা দিলে, দু-দশ টাকা দিয়ে সাহায্য কোল্লে? আর ও দিকে স্পেন্সার সাহেব এক পলকে বাঙালীর কাছাবাঁধা নুকুনো টাকাও টেনেটুনে লুটে নিয়ে চল্লো।বাহা রে বাঙালী! সাহেবের ফাঁকির কাঙালী।"

বেলুনবাজিতে টাকা কামাবার জন্য সব সাহেবই ফাঁকি দিয়েছিলেন, এ-কথা অবশ্য ঠিক নয়, কলকাতার আকাশে প্রথম বেলুন ওড়ানো থেকেই শুরু করা যায়। দু'শো বছরেরও আগে, ১৭৮৫ সালের ২৯ জুলাই উইনটল সাহেব রাত্তিরবেলা ৬ ফুট ব্যাসওলা একটি বেলুন উড়িয়েছিলেন।[১] তবে নিজে তিনি তাতে চড়েছিলেন, এমন কথা শোনা যায় না। কলকাতার প্রথম সার্থক নভশ্চর ডি· রবার্টসন।

১৬ মার্চ ১৮৩৬। কাশীপুর থেকে গার্ডেনরিচ অবধি কলকাতায় অভূতপূর্ব ট্র্যাফিক জ্যাম। কেরাঞ্চি, জুড়ি, বগি, পালকি আর পথচারীর অবিরাম স্রোত। সবাই চলেছে মুচিখোলার মাঠে, যেখান থেকে রবার্টসন বেলুনে করে আকাশে উঠবেন বলে হ্যান্ডবিল বিতরণ করা হয়েছে, কাগজে খবর বেরিয়েছে। কেল্লা থেকে গার্ডেনরীচ, নদীতেও তিল ঠাঁই নেই। অগুনতি নৌকার সারি, এমনকি দুটো স্টিমারে অবধি দর্শকদের ভিড়। নির্দিষ্ট ক্ষণে রবার্টসন বেলুনের তলায় ঝোলানো ঝুড়িতে গিয়ে উঠলেন, বেলুন তাঁকে নিয়ে ক্রমশই আকাশে উঠতে লাগল। রবার্টসন ফ্ল্যাগ নেড়ে, টুপি নেড়ে, নিজের হাতে চুমু খেয়ে এবং আরও নানাভাবে 'his continued state of convalescence'-এর নিদর্শন ব্যক্ত করে চললেন।[২]

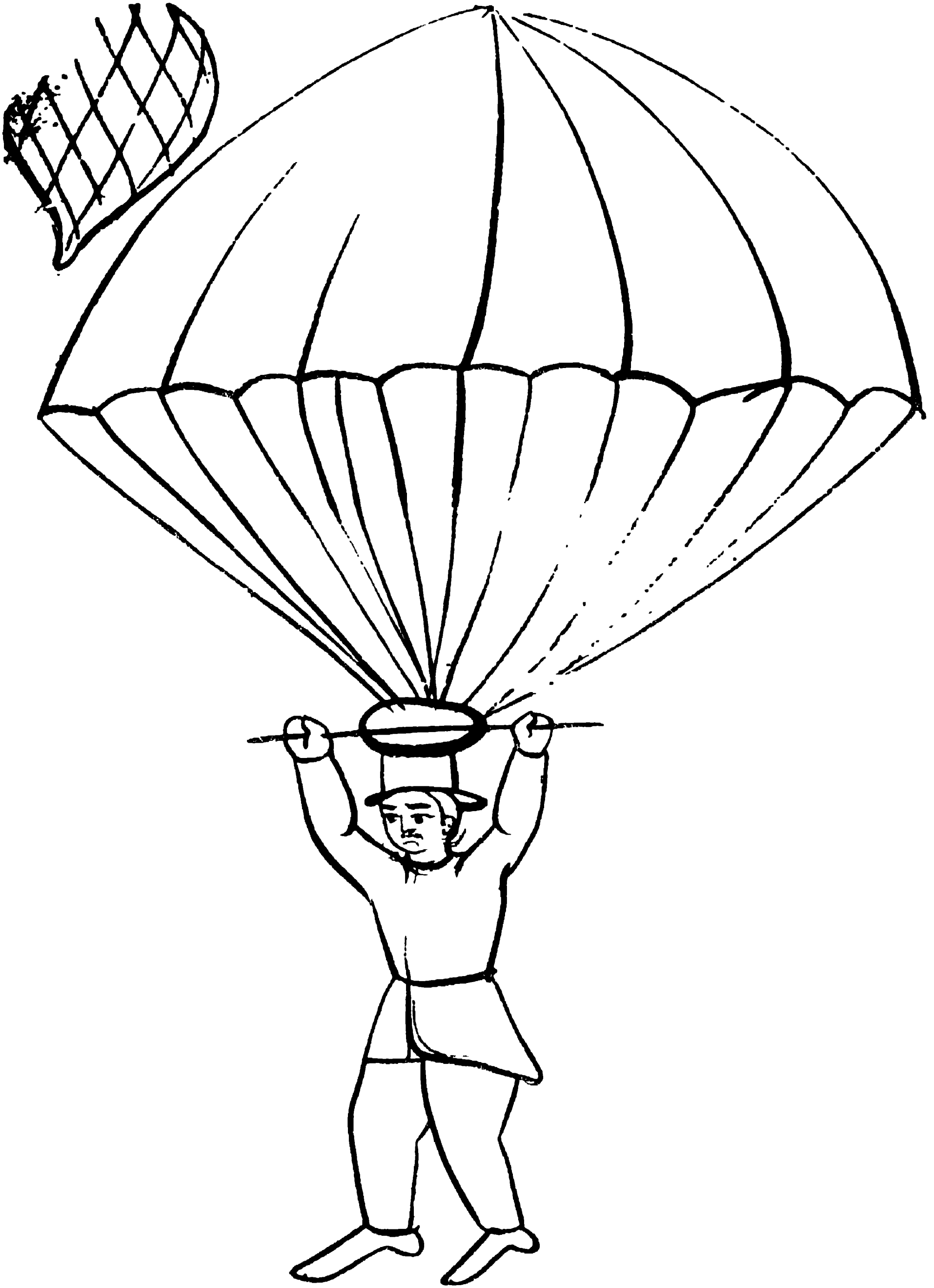
'দা ইংলিশম্যান'-এর রিপোর্ট অনুসারে রবার্টসন দাবি করেছিলেন, এটি তাঁর ষোড়শ গগন-বিহার। ১৮৩৬-র ২৬ মার্চের 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকা মুচিখোলা থেকে রবার্টসনের 'বেলুনারোহণ

রূপাশ্চর্য ব্যাপারে' বিপুল জনসমাবেশের কথা জানিয়েছিল। কিন্তু আকাশে ওড়ার পরেই রবার্টসনের তাড়াতাড়ি নেমে আসার বৈজ্ঞানিক কারণটি নির্দেশ করতে ভোলেননি বাঙালি প্রতিবেদক, "কেহ কেহ বলে বেলুনবিষয়ক চাঁদাতে শ্রীযুক্ত রার্বর্টসন সাহেবের অধিক লভ্য হয় নাই এপ্রযুক্তই তিনি অধিক দূরে উঠিলেন না এবং যাহারা প্রগাঢ় বুদ্ধি অভিমান করেন তাঁহারা বলেন উত্তরীয় বাতাসে বেলুনকে দক্ষিণ দিগে লইয়া গেল একারণ আরোহিসাহেব সাক্ষাতে সমুদ্র দেখিয়া ভয়ে তৎক্ষণাৎ পতিত হইলেন অন্যেরা কহেন এসকলই প্রতারণা কলিকাতার লোকেদের অধিক টাকা আছে তাহা হাত করিবার নিমিত্তই রবার্টসন সাহেব এই কল করিয়াছিলেন কিন্তু এসকল কথা কিছু নয় ফলত বেলুন যন্ত্র একেবারে মেঘের মধ্যে প্রবিষ্ট হইবাতে মেঘের শীত শক্তি দ্বারা বেলুনের মধ্যস্থ বাষ্প জমিয়া গেল এই কারণ সাহেব তৎক্ষণাৎ বেগে নামিয়া পড়িলেন লোকেরা যথার্থ কারণ না বুঝিয়া নানা কথা কহিতেছেন ইহা আশ্চর্য্য নহে এতদপেক্ষা অধিক পাগলামির কথা যে বলেন নাই আমরা তাহাতে আহ্লাদ জ্ঞান করি কেন না তাঁহারা ইহাও বলিতে পারিতেন যে শ্রীযুক্ত রার্বর্টসন সাহেব মন্ত্রের প্রভাবে মক্ষিকার ন্যায় ক্ষুদ্র হইয়া স্বর্গে যাইতেছেন ইহাতে ইন্দ্রকে পরাভব করিয়া কি জানি তাঁহার সিংহাসন কাড়িয়া লন এই ভয়ে পবন চরণে ধরিয়া সাহেবকে ফিরাইয়া দিলেন পূর্ব্বকালের লোকেরা এইসকল বিশ্বাস করিতেন এখন সকলের বোধ হইয়াছে ইঙ্গরেজরা মন্ত্রাদি মানেন না আপনারদের বুদ্ধির কৌশলেতেই নানাবিধ আশ্চর্য্য কার্য্য সৃষ্টি করেন কিন্তু অদ্যাপিও বেলুনে উঠিবার যথার্থ কারণ জানিতে পারেন নাই তাঁহারা বোধ করেন কোন আরকের তেজেতেই বেলুন উপরে উঠে যাহা হউক মন্ত্র তন্ত্রের পরাক্রম না ভাবিয়া যে আরকের তেজের শক্তি জানিয়াছেন ইহাও ভাল পরে বিদ্যাবুদ্ধি হইলেই এসকল বিষয় জানিতে পারিবেন।"[৩]

রবার্টসনের হিতাকাঙ্ক্ষী 'জ্ঞানান্বেষণ' গড়ের মাঠ থেকে তাঁর পরবর্তী আরোহণের সময় 'সাহেবের কিছু অধিক লভ্য হয়'—এই ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল। মাত্র বছর দুয়েক বাদে এই বেলুনপ্রেমী ফরাসি মানুষটির মৃত্যুর পর ১৮৩৮-এর ৫ মে 'জ্ঞানান্বেষণ' দুঃখের সঙ্গে জানিয়েছিল, "সকলই অবগত আছেন যে রার্বর্টসন সাহেব ভারতবর্ষের মাঠ হইতে বেলুন যন্ত্রের দ্বারা উর্দ্ধগমন করিয়াছিলেন সংপ্রতি তাঁহার লোকান্তর হওয়াতে তাঁহার সম্পত্তি সকল নীলাম হইল তন্মধ্যে বেলুনের যে তিনখান যন্ত্র প্রস্তুত করণেতে ২,৪০০ টাকা খরচ হয় তাহা কেবল ৫০ টাকাতে বিক্রয় হইল।"[৪]

"এ দেশের লোকেরা অদ্ভুত কৌতুকের নাম শ্রবণেও মহাকৌতুকী হয়েন"—এই সুযোগে রবার্টসনের পরে কয়েকজন প্রবঞ্চক বেলুনে ওঠার নাম করে বেশ কিছু হাতিয়ে নেন। তার মধ্যে সবচেয়ে বড় স্ক্যান্ডাল হয়েছিল ১৮৫০-র ২ মার্চ। এবার শুধু বেলুনে ওড়া নয়—মেমসাহেব উড়বেন—এই শুনে প্রচুর লোক টিকিট কিনেছিল। কিন্তু মাদাম দ'লাসান্টা-র বেলুন কিছুতেই ফুললো না। মাদাম প্রাঙ্গণ ত্যাগ করে পালকিতে উঠতে যাচ্ছেন যখন, ক্রুদ্ধ জনতা ছুটে এসেছিল। কোনোক্রমে পুলিশের হস্তক্ষেপে তিনি রক্ষা পান। কিন্তু গল্প এখানেই শেষ নয়। মাসখানেক বাদে 'ফ্রেন্ড অফ ইন্ডিয়া' একেবারে হাটে হাঁড়ি ভাঙল, ফরাসি নামটাম পুরো ধাপ্পা, মহিলা আসলে এক পর্তুগীজ এবং তাঁকে নিযুক্ত করেছিল কুখ্যাত মেগ্রে (Maigret) যে ইতিপূর্বে তিনবার বেলুনে আরোহণ করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছে। সত্যি ব্যর্থ হয়েছিল, না বেলুন নিয়ে বুজরুকি কারবার খুলেছিল, বলা শক্ত।[৫]

যাই হোক এইসব কেচ্ছার স্মৃতি মিলোবার আগেই আর-একজন নতুন বেলুন-প্রকল্প নিয়ে



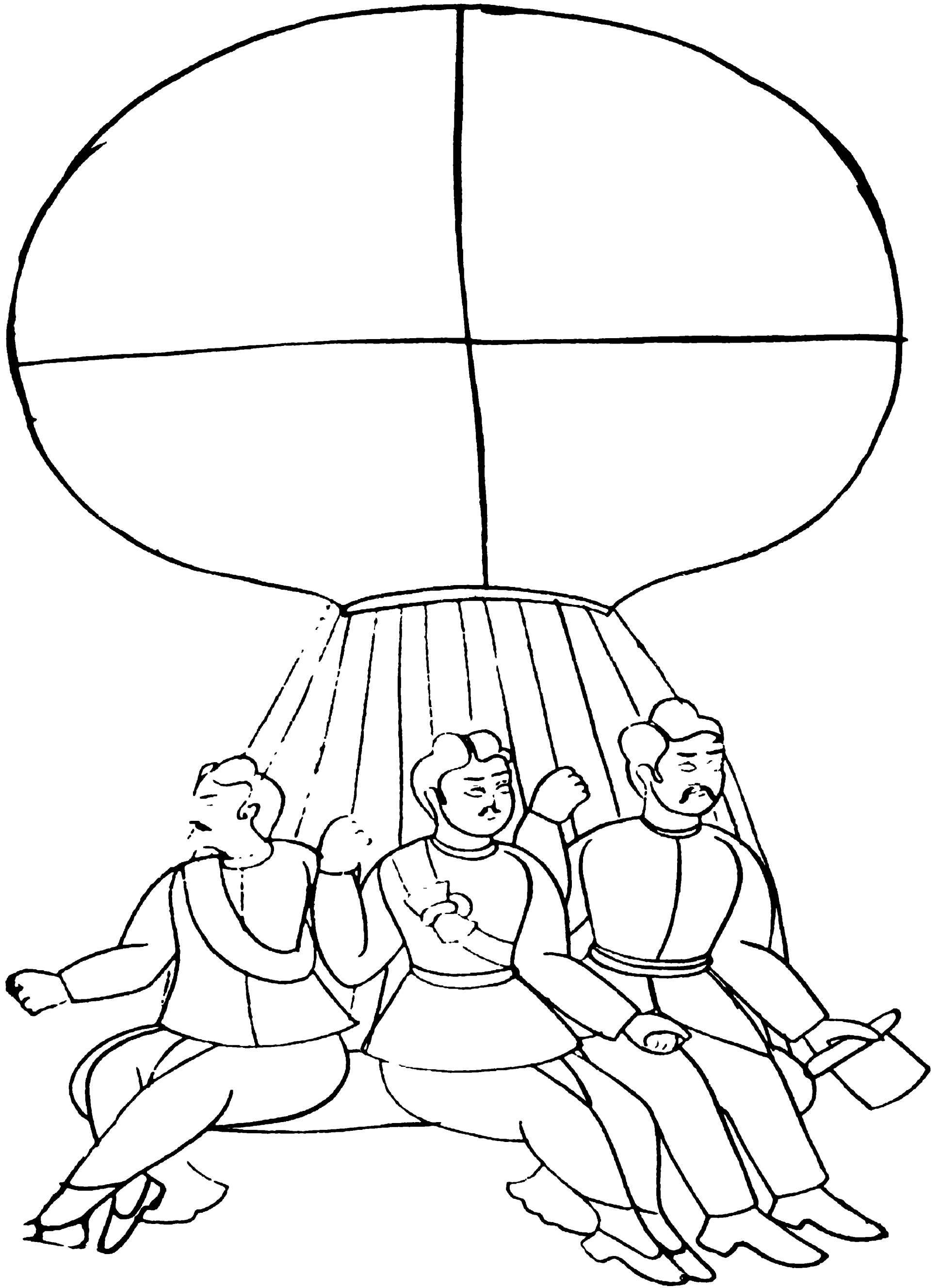
কালীঘাট পটে বেলুন



কালীঘাট পটের এই আরোহিণী কি রামচন্দ্রের কন্যা ?



কালীঘাট পটে বেলুন



কালীঘাট পটে বেলুন

হাজির হলেন। ১৮৫০-এর ২ নভেম্বর 'সংবাদপূর্ণচন্দ্রোদয়' লিখেছিল, "এবারকার বেলুনের সাহেব ঐ বিষয় আপনার পারগতা সাধারণ লোকের বিদিতনিমিত্ত আদৌ প্রচার করিয়াছেন যে প্রকৃত গ্যাস বা বাষ্প দ্বারা বেলুন পূর্ণ করিবেন এবং পূর্ব্বকার মেগ্রি সাহেব যে যে সময় বেলুন উঠাইবার জন্য ধার্য্য করেন তাহারও পরিবর্ত্তন করিয়াছেন অর্থাৎ ইঁহার বেলুনের সময় অপরাহ্ণ না হইয়া পূর্ব্বাহ্ণ ইহাতে অনুমান হয় কৌতুকার্থিভূরি তদ্দর্শনাভিলাষী হইয়া তাঁহার মানস পূর্ণ করিতে পারেন কিন্তু এ বিষয়ে একটা সন্দেহ আছে যে এই সাহেব স্থান পবিবর্ত্তন করেন নাই, মেগ্রি সাহেব যেখানে ভূয়োভয় কৃতকার্য্য হইয়া সাধারণের বিবাগভাজন হইয়াছিলেন সেই স্থানেই ইনি উড়িবেন স্থানপ্রভাবে পাছে লোকদের অসন্তোষ করা হয়।"

কাইট সাহেব অবশ্য হতাশ করেননি। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত-র কয়েকটি পঙ্‌ক্তি তার অন্যতম সাক্ষী[৬] :

এ আবার কোথা হতে আইল কাইট
নাহি বলে, বলে চলে কলের কাইট
মর্ত্যলোকে শব্দ করে কাইট কাইট।

কাইট-এর বেলুন অভিযানের বিস্তৃত বিবরণ আছে 'ক্যালকাটা ক্রিশ্চান স্কুল বুক সোসাইটি' প্রকাশিত 'বঙ্গীয় পাঠাবলী' নামে সংকলন গ্রন্থের চতুর্থ ভাগে :

"গত মাসের মধ্যে [নভেম্বর, ১৮৫০] মেং কাইট নামা একজন সাহেব শ্রীযুক্ত রাজা বৈদ্যনাথ রায়ের উদ্যান হইতে বেলুন যোগে আকাশবিহারী হওয়াতে কলিকাতার লোকেরা অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়াছেন, রবার্টসন নামক এক ব্যক্তি ইহার পূর্ব্বে একবার উড্ডীন হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি উঠিবার অনতিবিলম্বে নামিয়াছিলেন, তাহা আর চৌদ্দ বৎসর গত হওয়াতে বর্তমান যুবক লোকদের তদ্বিষয় স্মরণ নাই....

"পূর্বোক্ত মেং কাইট সাহেব ৫ নবম্বর দিবসে উড্ডীন হইয়া এক ঘণ্টার মধ্যে দমদমার উপর প্রকাশমান হয়েন, পরে বায়ুরদ্বারা সাগরের নিকট বাহিত হয়েন, অবশেষে বাতাসের বিপরীত সঞ্চার হওয়াতে তিনি জাগুলের সন্নিদ্ধ কোটরা গ্রামে আসিয়া অবরোহণ করেন। কাইট সাহেব আপনার আকাশ বিহারের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয় তিনি অনেক দূর পর্য্যন্ত উর্দ্ধে গমন করিয়াছিলেন, কেননা অতিশয় শীতল বাতাস প্রাপ্ত হওয়াতে তাঁহার কর্ণকুহর কণ ২ করিয়াছিল। ঐ সময়ে তিনি একটা চুরুট জ্বালিয়া ধূমপান করত কালহরণ করিতে লাগিলেন। পরে অবরোহণ করিবার মানসে গ্যাস বাহির করিবার সূত্র আকর্ষণ করাতে তাহা ছিন্ন হইয়া গেল কিন্তু দৈবাৎ তাহার নিকট এক বড়শা ছিল, তদ্দ্বারা বেলুনের কোন কোন অংশ নিদীর্ণ করাতে তাহা নীচে নামিতে লাগিল।

"অপর সমুদ্রের জল এবং প্রবল তরঙ্গ ধ্বনি তাঁহার ইন্দ্রিয় গোচর হওয়াতে তিনি পুনশ্চ বেলুন বিদীর্ণ করত অবরোহণ করিতে লাগিলে পর অনুকূল বায়ুর সঞ্চার হওয়াতে সমুদ্রের দূরে বাহিত হইয়া নিরুদ্বেগ হইলেন ঐ সময়ে বায়ুর বিলক্ষণ তেজ থাকাতে তিনি মহাবেগে আকাশ গমন করিতে লাগিলেন, অবশেষে প্রায় ১ ঘটিকার সময় কোটরা গ্রামের সন্নিকটস্থ হওয়াতে, লৌহময় নঙ্গর নিক্ষেপ করিলেন তাহাতে বেলুন স্থগিত হইল। তখন কৃষক লোক সেই স্থলে থাকাতে তাহারা রজ্জু ধরিয়া

তাঁহাকে নীচে নামাইল।

"তিনি জাগুলে নিবাসি বাবু রাধাবল্লভ বিশ্বাসের বাটীতে আসিয়া সেই রাত্রি প্রবাস করেন, পর দিবস প্রাতঃকালে শকটারোহণ করিয়া কলিকাতায় আইসেন।"[৭]

পরবর্তী নভশ্চর সাহেবভায়া পার্সিভাল স্পেন্সার। 'বেলুনে বাঙালী বিবি' প্রসঙ্গে যাঁর নাম আমরা আগেই জেনেছি। বোম্বাইয়ে তিনি ইতিপূর্বে সফল হলেও কলকাতায় তাঁর প্রথম চেষ্টা ব্যর্থ হয়। পরের দিন, ১৮৮৯-এর ৩ মার্চ 'স্টেটসম্যান' এই ঘটনার সরস বিবরণ প্রকাশ করে। বিকেল চারটের মধ্যে বালিগঞ্জ ময়দানের আবেষ্টনীর মধ্যে পুরো পাঁচ হাজার লোকের ভিড় জমেছিল। আর বাইরে দর্শকদের সংখ্যা লক্ষ পেরিয়েছিল। সম্ভ্রান্ত মানুষ বহু ছিলেন, ছিলেন ভাইসরয় ও তাঁর পার্টি। বেলা দু'টো থেকে গ্যাস ভরা শুরু হয় কিন্তু বেলুন আর কিছুতেই ফুলতে চায় না। বেলুন ছাড়ার সময় সাড়ে পাঁচটা বাজল, তখনো সেটার অবস্থা জেলি ফিশের মতো। কোনো নির্দিষ্ট আকার গ্রহণ করেনি। সোয়া ছ'টায় ব্যালাস্ট (বালির বস্তা) ফেলে বেলুন খোলা হলো, মাঝ আকাশে কিছু আকর্ষণীয় হেলাদোলা দেখল লোকে, কিন্তু নভশ্চর তাঁর অভিযানে যেতে পারলেন না।

১৯ মার্চ, দ্বিতীয়বারের চেষ্টায় সফল হলেন স্পেন্সার। এবার আর ওরিয়েন্টাল গ্যাস কোম্পানির তৈরি কোল গ্যাস নয়, রেস-কোর্সের মধ্যেই সালফিউরিক অ্যাসিডও জিঙ্ক দিয়ে নিজে হাইড্রোজেন গ্যাস তৈরি করে বেলুন ফুলিয়েছিলেন [illegible] চড়ে সাহেব প্রথমে মনুমেন্টের মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেলেন, তারপর হাওয়ার দিক বদলে [illegible] বেলুন উড়ে গেল বালিগঞ্জের দিকে। সন্ধ্যার পরে বেলুন অদৃশ্য। প্রথমে গুজব শোনা গেল তিনি পোর্ট ক্যানিঙে নেমেছেন, তারপর বলা হলো সুন্দরবনের কাছে। ২১ মার্চের 'স্টেটসম্যান' লিখল, "এই দুঃসাহসের প্রশংসা না করে যদিও উপায় নেই তবু এর পরিণতি যে প্রাণঘাতী ছাড়া আর কিছু হতে পারে তেমন আশা আমাদের ছিল না এবং নিশ্চয় ঘটেওছে তাই।"

আসলে স্পেন্সারের অবতরণের খবর ২২ তারিখের আগে কলকাতায় পৌঁছয়নি। দেড় ঘণ্টা বেলুন চড়ার পর বসিরহাট সাব ডিভিশনের বস্তালিয়াবাদ নামে একটি জায়গায় নেমেছিলেন তিনি। পরের দিন বুধবার বিকেল পাঁচটায় নৌকায় করে হোসেনাবাদ যান। সেখান থেকে বৃহস্পতিবার দুপুরে রওনা হন বসিরহাটের দিকে। বসিরহাট থেকে রাত ন'টায় কলকাতার ট্রেন। বেলুনটিকে সঙ্গে করেই ফিরিয়ে এনেছিলেন।

পরের বছর কলকাতার টিভোলি গার্ডেন্স থেকে নিদেনপক্ষে তিনবার তিনি বেলুনে পাড়ি দিয়েছিলেন।[৮]

প্রথম বাঙালি নভশ্চরের হাতেখড়ি হয়েছিল এই স্পেন্সারেরই কাছে। ১৮৮৯-এর ১০ এপ্রিল নারকেলডাঙ্গায় ওরিয়েন্টাল গ্যাস কোম্পানির প্রাঙ্গণ থেকে 'ভাইসরয়' বেলুনে চেপে স্পেন্সারের সঙ্গে আকাশে উড়লেন 'ইন্ডিয়ান সার্কাস'-এর রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ঘণ্টাখানেক ওড়ার পর বিকেল সাড়ে চারটেয় বেলুন এসে নামে একটি গ্রামে। স্থানীয় জমিদার পিয়ারীমোহন রায়ের ভাই তাঁদের জন্য একটি হাতি পাঠিয়ে দেন। বেলুন বেঁধেছেঁদে নিয়ে হাতি চেপে তাঁরা চণ্ডীপুরে এসে সেখান থেকে সাতটার সময় ট্রেন ধরে শেয়ালদা রওনা হন।[৯] 'বেঙ্গলি' এই খবর দেওয়ার সময়ে ঘোষণা করেছিল, বাবু রামচন্দ্রই প্রথম বাঙালি নভশ্চর—'এরোনট'।

সাতাশে এপ্রিল 'বেঙ্গলি'-তে বিজ্ঞাপন বেরল :

# Advertisements.

*ANNOUNCEMENT EXTRAORDINARY!*

**GRAND BALLOON ASCENT!**

THE FIRST NATIVE ATTEMPT

IN

INDIA!

BABU RAM CHANDRA CHATTERJEE

The First Indian Aeronaut

in his own Balloon

"THE CITY OF CALCUTTA"

WILL ASCEND

FROM THE GAS WORKS GROUNDS

on Saturday April 27, 1889

GATES OPEN AT 2 P. M.

Balloon Ascends at 4 30 p m

ASSISTED BY

THE BEADON SQUARE AMATEUR QUADRILLE BAND

Prices of Admission

| | | |
|---|---|---|
| Reserved Seats (under sheds) | Rs | [illegible] 0 0 |
| Chairs | „ | 1 0 0 |
| Special cheap enclosures for the million (up to 4 o'clock) | „ | 0-4 0 |

*First class accommodation for Native Ladies*

By desire of several gentlemen special comfortable arrangements have been made for Native Ladies Zenana seats Rs 2 each.

We request the nobility and gentry of Calcutta to secure the Zenana Seats as early as possible as only a limited number could be spared now.

The arranged grounds of the Gas Works will be open to public inspection from Friday the 26th instant

Tickets can be obtained and plan of the grounds seen at the following addresses and at the gate on the day of the performance —

66, Pathuriaghatta Street, Friend & Co's 61, Bentinck Street, Allan & Co's, 83, Dhurrumtollah Street

রামচন্দ্রের বেলুন আরোহণের প্রথম বিজ্ঞাপন

BEBAHO BEBHRAT

G. C GHOSH,

Manager.

**BENGAL THEATRE,**

BEADON-STREET.

*Saturday, the 4th May, at 9 p m*

PARIKSHIT AND RUKMINI RANGA

Next day, Sunday, at candlelight,

PROLHAD AND GOLUCKDHADA.

KUNJA BEHARI BOSE,

**Manager, Advertizing Department.**

## The Postponed

**BALLOON ASCENT,**

BY

**BABOO RAM CHANDRA CHATTERJEE**

**WILL TAKE PLACE ON**

***Saturday, May 4th, 1889,***

**At 4-30 o'clock afternoon,**

**FROM THE**

GAS-WORKS GROUNDS.

**Doors open at 2 p.m**

**POPULAR PRICES AS BEFORE**

***Tickets obtained at the Gate on Saturday from 10 a.m.***

**ASSISTED BY THE**

**Beadon Square Amateur Quadrille Band.**

**Parties holding tickets of the last projected Ascent shall have the privilege of Free Admission and Seats on this occasion on presentation of their respective tickets.**

# ADVERTISEMENTS.

**DOORGA DASS DASS & CO.,**

**60½ & 70, *RADHA BAZAAR,***

**CALCUTTA.**

**THE largest Establishment for Steel Trunks, Cash, Deed, Despatch and Office Boxes, Best Leather Portmanteaux, Carpets, Tapestry, Velvet and Wilton Piles, Square Carpets, Sofa Rugs, Peramul ula-**

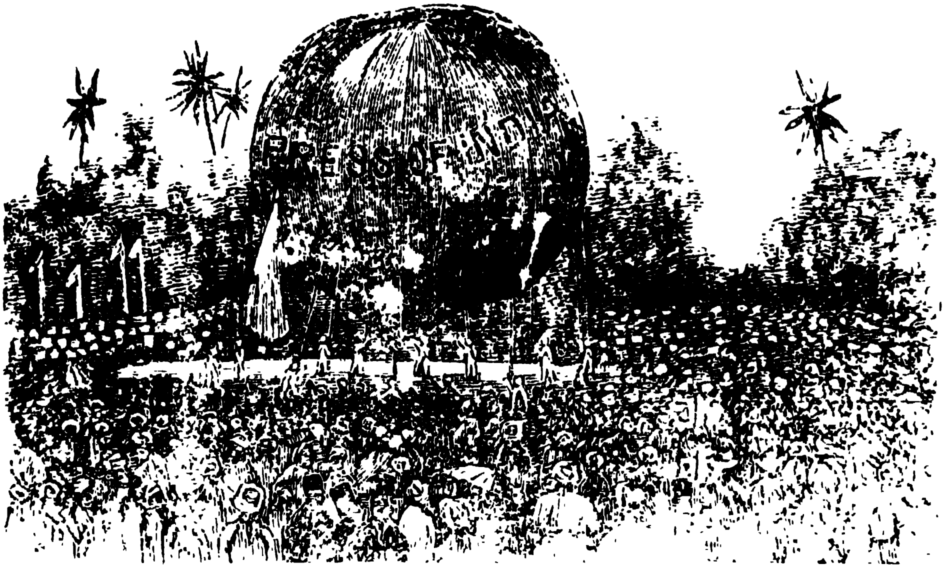
রামচন্দ্রের স্থগিত বেলুন আরোহণের প্রথম বিজ্ঞাপন

ANNOUNCEMENT EXTRAORDINARY
GRAND BALLOON ASCENT
THE FIRST NATIVE ATTEMPT
IN
INDIA
BABU RAM CHANDRA CHATTERJEE
THE FIRST INDIAN
AERONAUT
in his own balloon
"THE CITY OF CALCUTTA"

বিজ্ঞাপনে ঘোষিত হয়েছিল যে, সে-দিনই (২৬ এপ্রিল) বিকেল সাড়ে চারটেয় গ্যাস কোম্পানির মাঠ থেকে বেলুনে উঠবেন রামচন্দ্র। বিডন স্কোয়ার অ্যামেচার কোয়াড্রিল্ড ব্যান্ড এই উপলক্ষে পরিবেশন করবে সঙ্গীত। গেট খোলা হবে দু'টোয়। টিকিটের হার—শামিয়ানার নীচে সংরক্ষিত আসন : তিন টাকা, চেয়ার : ১ টাকা, সাধারণের জন্য সুলভ আসন : চার আনা এবং দেশীয় মহিলাদের জন্য বিশেষ আসন : দু' টাকা। নিম্নলিখিত স্থান ও গ্যাস কোম্পানির গেট থেকে টিকিট কেনার ও মাঠের প্ল্যান দেখার সুযোগ ছিল : ৬৬, পাথুরেঘাটা স্ট্রিট, ফ্রেন্ড অ্যান্ড কোং, ৬১ বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট ও অ্যালান অ্যান্ড কোং, ৮৫ ধর্মতলা স্ট্রিট।

কয়েক হাজার লোককে সেদিন হতাশ হয়ে ফিরতে হয়েছিল। আকস্মিক ঝড়ে শামিয়ানা লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়, বেলুনের গ্যাস বের করে দিয়ে কোনোরকমে সেটিকে রক্ষা করা গিয়েছিল। এই অপ্রত্যাশিত ব্যর্থতার জন্য দুঃখপ্রকাশ করে রামচন্দ্রের একটি চিঠি ছাপা হয় ৪ঠা মে'র 'বেঙ্গলি'-তে। তিনি দর্শকদের আশ্বস্ত করে লিখেছিলেন, যাঁরা টিকিট কেটেছেন, পরবর্তী বেলুন আরোহণের সময় সেই টিকিট ব্যবহার করতে পারবেন।

ভারতের প্রথম নভশ্চরের প্রথম একক আরোহণ সফল হলো ৪ঠা মে। পরের শনিবার ১১ মে, 'বেঙ্গলি'-তে প্রকাশিত হয় রামচন্দ্রের নিজের লেখা নভোচারণার বিবরণ, "পাঁচটা দশে বেলুনটি ভূপৃষ্ঠ ত্যাগ করে এবং উত্তর মুখে এগিয়ে চলে। সঙ্গে যে অ্যানিরয়েড ব্যারোমিটারটি নিয়েছিলাম তার নির্দেশ অনুসারে বেলুন প্রায় চার হাজার ফিট অবধি উঠেছিল। দু' হাজার ফিট ওঠার পর আমি সেখানে বাতাসের গতি তেমন টের পাইনি, বেশ প্রশান্ত বলেই মনে হচ্ছিল কিন্তু দূরবিন দিয়ে দেখলাম নীচে ধরণী মাতার পৃষ্ঠে গাছগুলি আন্দোলিত হচ্ছে। তাপমাত্রার প্রভেদ অবশ্য অল্পই অনুভব করেছি। এই অবস্থায় আমি প্রায় ষাট পাউণ্ড ওজনের ব্যালাস্ট পরিত্যাগ করি, বেলুনটি তখন দ্রুত উপরে উঠতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত অ্যানিরয়েড ব্যারোমিটার ৪০০০ ফিট উচ্চতা নির্দেশ করে। এই অবস্থানেও তাপমাত্রার তেমন কোন প্রভেদ অনুভব করতে পারিনি। এরপর বেলুনটি পুব দিক এগোতে শুরু করে। এবার আমি অবতরণের স্থান খোঁজার দিকে মন দিই। রেল লাইন থেকে যাতে খুব দূরে সরে না যাই তার জন্য ভাল্‌ভটা আমি সামান্য খুলে কিছুটা গ্যাস বার করে দিই। বেলুন নিচে নামতে নামতে যখন মাটির ৫০০ ফিটের কাছে চলে এসেছে, দেখি আমার পায়ের নিচেই



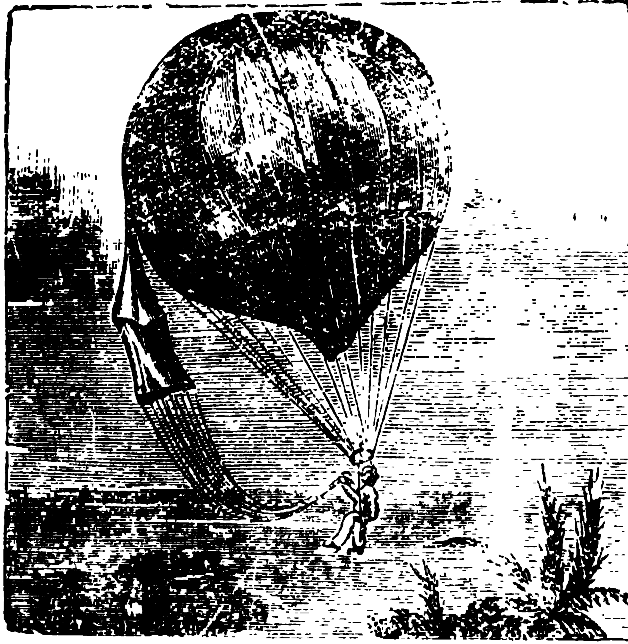
রামচন্দ্রেব বেলুন আরোহনের সমকালীন উড-কাট

বিরাট একটা পুকুর। তখন আমি আবার কিছু 'ব্যালাস্ট' ছুঁড়ে ফেলে দিই যার দরুন বেলুন ফের উপরে উঠে যায়। ফলে অবতরণের উপযুক্ত স্থান নির্ধারণ করার জন্য আমি সুযোগ পাই। নোঙর ছুঁড়ে ফেলার পর একটা মাঠের ওপব দিয়ে সেটা খানিকটা ঘষটে গিয়ে শেষে ছোট একটা পুকুর-পাড়ে বাঁশঝোপের সঙ্গে আটকে যায়। আমার অবস্থা তখন কিঞ্চিৎ সঙ্গিন কারণ বাতাসের ঝাপটায় বেলুনটা বেসামাল হয়ে গিয়েছিল। সৌভাগ্যবশত কিছু গ্রামবাসীর সাহায্যে বেলুনটিকে রক্ষা করা যায়। সোদপুর স্টেশনের দু' মাইল উত্তর-পূর্বে নাটাগড়ে বেলুনটিকে নিরাপদে মাটির ওপর টেনে নামানো হয়। তখন বিকেল পাঁচটা পঞ্চাশ। ব্যারাকপুরের অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট বাবু অম্বিকাচরণ মুখার্জি সব রকম সাহায্য করেন এবং বেলুনটির দায়িত্বও নেন। বলেন, সেটি তিনি কলকাতায় পাঠিয়ে দেবেন। এরপর সোদপুর স্টেশনে গিয়ে ট্রেন ধরে রাত ন'টায় শেয়ালদায় পৌঁছই।"

'স্টেটসম্যান' থেকে জানা যায়, সেদিন 'সিটি অফ ক্যালকাটা'য় গ্যাস ভরার পর রঙিন কাগজের শিকলি ঝুলিয়ে তাকে সুশোভিত করেন বাহারি পোশাক-পরা রামচন্দ্রের সহকারীরা। রামচন্দ্রের পরনে ছিল হালকা রঙের সুট ও টুপি। রামচন্দ্রের নিরাপত্তার জন্য পুরোহিতরা পুজাপাঠ করেন এবং বলিদানও হয়েছিল। বেলুন-বাঁধা দড়ি খুলে দেওয়ার পর রামচন্দ্র আকাশে উড়ে যাওয়ার সময়ে সংলগ্ন গাড়ি থেকেই ব্যায়াম কৌশল পরিবেশন করেন।[১০]

১৮৮৯-র ৪ঠা মে রামচন্দ্রের এই চল্লিশ মিনিটের গগন-বিহার ভারতের আকাশ বা মহাকাশ অভিযানের যাবতীয় ইতিহাসের প্রথম অধ্যায়ে স্থান পাওয়া উচিত।

'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে ধ্রুবজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, রামচন্দ্র নিজে 'সিটি অফ ক্যালকাটা' বেলুনটি তৈরি করিয়ে নিয়েছিলেন। কিন্তু সেটি সত্য নয়। এই আরোহণের



প্যারাশুটে নামছেন রামচন্দ্র

কয়েক সপ্তাহ পরে রামচন্দ্রের একটি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে লাহোরের 'দা সিভিল অ্যান্ড মিলিটারি গেজেট'।[১১] তাতে রামচন্দ্র বলছেন, "কয়েক জন বন্ধু মিলে আমরা স্পেন্সারের বেলুন, 'দা ভাইসরয়' কিনে নিই, এবং আপনারা জানেন আমি তার নতুন নামকরণ করেছি 'দা সিটি অফ ক্যালকাটা' ও 'চ্যাটার্জিস্ বেলুনিং কোম্পানি' স্থাপন করেছি।"

রামচন্দ্র অন্য একটি প্রশ্নের উত্তরে জানান যে, কিছু দিনের মধ্যেই রানীর জন্মদিন উপলক্ষে হাওড়া থেকে তিনি আবার আরোহণ করবেন এবং তারপরে এলাহাবাদ, লাহোর, জয়পুর, লক্ষ্ণৌ, ঢাকা, কাশ্মীর এবং অন্যান্য বড় শহর থেকেও বেলুনে চড়ার ইচ্ছা আছে তাঁর। মাঝ আকাশে বেলুন থেকে ঝাঁপ দেওয়ার জন্য স্পেন্সার সাহেবকে তিনি তাঁর প্যারাসুটটি ধার দেওয়ার অনুরোধ করেছিলেন, কিন্তু সাহেব রাজি হননি। বলেছিলেন, 'এক চাঞ্চল্যকর আত্মহত্যা'র অংশীদার হতে তিনি রাজি নন। রামচন্দ্র বলেন যে, ইংলণ্ড থেকে তিনি অবিলম্বে প্যারাসুট আনাচ্ছেন এবং বোম্বাইয়ে প্রথম প্যারাসুট নিয়ে লাফ দেবেন।

এই বছরের ২২ জুন, এলাহাবাদের খুশরুবাগ থেকে রামচন্দ্র এক দুঃসাহসিক বেলুন আরোহণ করেন। 'ইণ্ডিয়ান ডেইলি নিউজ'-এ প্রকাশিত সংবাদ উদ্ধৃত করে 'দা বেঙ্গলি' লিখেছিল যে, সন্ধ্যে সাড়ে ছ'টার সময় এলাহাবাদের আকাশে উড়েছিল, 'দা সিটি অফ ক্যালকাটা'। প্রায় দশ হাজার লোক জড়ো হয়েছিল। গ্যাসের অভাবে বেলুন আরোহণ যখন প্রায় বাতিল হওয়ার মুখে, বেলুনের গাড়ি থেকে সমস্ত 'ব্যালাস্ট' ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয় কিন্তু তবু বেলুন উড়তে চাইছিল না। দর্শকদের

হতাশ করতে চাননি রামচন্দ্র। বেলুন সংলগ্ন গাড়িটি পর্যন্ত তখন বিচ্ছিন্ন করে শুধু বেলুনের নীচে সংলগ্ন লোহার রিঙে চেপে তিনি আকাশে উড়ে যান। তিনি নাকি ২০,০০০ ফিট আরোহণ করেন এবং ট্র্যাক সোসাইটির প্রাঙ্গণে এসে নামেন।[১২]

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'ঘরোয়া'য় লিখেছিলেন গোপাল মুখুজ্জের [যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের দৌহিত্র] বাড়ি থান-থান তসর কেটে রামচন্দ্র নিজের বেলুন তৈরি করেছিলেন।[১৩] আসলে, বেলুন নয়, প্যারাসুট তৈরি হয়েছিল এই তসর দিয়ে। ইভনিং মেল-এ প্রকাশিত স্পেন্সারের একটি সাক্ষাৎকার থেকেই সেটা অনুমান করা যায়।[১৪]

১৮৯০-এর ২২ মার্চ স্টেটসম্যান পত্রিকায় বিজ্ঞাপন পড়ল :

Baboo Ram Chunder Chatterjee
Mr. Percival Spencer's Indian Pupil
WILL ASCEND ALONE
IN THE
"EMPRESS OF INDIA" Balloon
And upon attaining an altitude of
several thousand feet
he will
leap from the balloon
and make a
Parachute Descent,
In sight of the spectators
at 6 P. M.
Mr. Spencer purposes to address the
audience and
present Baboo Ram Chunder Chatterjee
with a medal.
First Parachute descent by a Native
of India.

পরের দিনের কাগজে ফলাও করে বেরিয়েছিল, রামচন্দ্রের সফল আরোহণ ও প্যারাসুট নিয়ে ঝাঁপ দেওয়ার কাহিনী। টিভোলি গার্ডেন্স থেকে বেলুনে চড়েছিলেন তিনি। সাড়ে তিন হাজার ফিট উচ্চতায় পৌঁছে ঝাঁপ দেন। প্যারাশুটের ব্যাস ছিল সাড়ে আট ফিট। ক্যাম্পবেল হাসপাতালের কাছে সুরিজ ট্যাঙ্ক পাথ লেনে একটি বাড়ির ছাতে তিনি অবতরণ করেন।[১৫]

অবনীন্দ্রনাথ কিন্তু তাঁর বিবরণে নারকেলডাঙা থেকে রামচন্দ্রের বেলুনে চড়া ও প্যারাসুটে অবতরণের উল্লেখ করেছেন। তিনি রামচন্দ্রের দ্বিতীয় কোনো অবতরণের সাক্ষী ছিলেন মনে করা যেতে পারে, কিন্তু তাঁর বর্ণনায় রয়েছে প্রথমত্বের রোমাঞ্চ। সম্ভবত স্মৃতি অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে ছলনা করেছে।

অবনীন্দ্রনাথ লিখেছেন যে, বেলুন ওড়ার পরে রামচন্দ্র রুমাল নাড়তেই দড়ি কেটে দেওয়া

হয়। বেলুন উঠছে তো উঠছেই, রামচন্দ্র আর ঝাঁপ দেন না। দর্শকদের মধ্যে ছিলেন সেন্ট জেভিয়ার্সের বিখ্যাত বিজ্ঞানী অধ্যাপক লাফোঁ। তিনি বললেন যে, রামবাবু আর নামতে পারবেন না, তিনি একেবারে কোল্ড ওয়ভের মধ্যে চলে গেছেন, সেখানে থেকে জীবন্ত অবস্থায় ফিরে আসা সম্ভব নয়। "আমাদের তো মুখ চুন। গোপাল মুখুজ্জের টাকা গেল, বেলুন গেল. আবার রামবাবুও গেলেন দেখছি।" দূরবিনে চোখ লাগিয়ে দেখছিলেন অবনীন্দ্রনাথ। হঠাৎ রামবাবু লাফ দিলেন, বেলুন আরও উপরে উঠে গেল, রামবাবু আকাশে পাক খেতে-খেতে এক-একবারে পঞ্চাশ-ষাট হাত নেমে আসছেন কিন্তু প্যারাসুট আর খোলে না। দর্শকদের হৃৎস্পন্দন বেশ কিছুটা বাড়িয়ে দিয়ে শেষ পর্যন্ত প্যারাসুট খুলল। 'জয় রামবাবুকী জয়'—আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠল সবাই। দুপুর রোদ্দুরে দু' হাত তুলে সবার নৃত্য—"সে যা শোভা আমাদের তখন, যদি দেখতে হেসে বাঁচতে না।"

প্রত্যক্ষদর্শী যোগীন্দ্রনাথ সরকারও রামচন্দ্রের বেলুন থেকে ঝাঁপ দেওয়ার বিবরণ দিয়েছেন, "রবারের বাঁশী ফুঁ দিয়া ফুলাইলে যেমন হয়, সেইরূপ একটা প্রকাণ্ড বেলুন, মাতালের মত একবার দক্ষিণে, একবার বামে টলিতেছে আর কতকগুলি লোকে দড়ি ধরিয়া উহা টানিয়া রাখিয়াছে। তখনও গ্যাস ভরা চলিতেছিল। .....বেলুন যখন মেঘের ভিতর প্রবেশ করিবার উপক্রম করিতেছে, সেই সময় রামবাবু প্যারাসুটের দড়ি ধরিয়া লাফাইয়া পড়িলেন।.... কয়েক শত ফিট পর্য্যন্ত,—কখনও প্যারাসুট নীচে রামবাবু উপরে, আবার কখনও রামবাবু নীচে, প্যারাসুট উপরে—এই ভাবে ডিগ্‌বাজী খাইতে খাইতে সহসা উহা খুলিয়া ঠিক ছাতার আকার ধারণ করিল এবং ধীর গতিতে রামবাবুকে লইয়া নীচে আসিল। আমরাও যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম।"[১৬]

প্রশ্ন উঠতে পারে, অভিনবত্ব কেটে যাওয়ার পর এই তামাশা আর নিছক বাহাদুরির কিবা তাৎপর্য? সেকালেও এই প্রশ্ন ওঠেনি তা নয়। ঢাকা থেকে প্রকাশিত দ্বি-সাপ্তাহিক 'দা বেঙ্গল টাইমস'-এর সুর কিভাবে বদলেছে, লক্ষ্য করলেই, রামচন্দ্রের কৃতিত্ব ও সীমাবদ্ধতা, দুই-ই ধরা যাবে।

রামচন্দ্র একা স্পেন্সারের বেলুনে চড়ে উঠবেন, জানতে পেরেই এই পত্রিকার ক্রুদ্ধ প্রতিবেদক ১৮৮৯-এর ২৭ এপ্রিল লিখেছিলেন, "যদি তাঁর কোনো ক্ষতি হয়, এবং আমাদের আশংকা সেটাই স্বাভাবিক, তা হলে যারা তাঁকে প্রশ্রয় দিচ্ছে তাদের একটি আত্মহত্যাকে প্রারোচিত করার দায়ে পড়তে হবে। স্থানীয় কর্তৃপক্ষও দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারবেন না। পূর্ব অভিজ্ঞতা বা জ্ঞান ছাড়া এই ধরনের আকাশারোহণের প্রচেষ্টা, আমরা মনে করি, ভাগ্যকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলা এবং আইন-বলেই তা নিবারণ করা উচিত। আমাদের স্বদেশী বন্ধুরা বোধ হয় বীরত্ব আর বোকামির মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছেন।"

একই কাগজ রামচন্দ্রের প্রথম একক আরোহণের সাফল্য-সংবাদ পেশ করার সময় কিন্তু আবেগে প্রায় অসংযত, "এই সেই রামচন্দ্র চ্যাটার্জি যাঁর মাথায় দুনিয়ার বিদ্রূপ চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। দুর্ভাগ্য তাঁর যে বাঙালি জাতির মধ্যে জন্ম নিয়েছেন। যাইহোক তিনি সব দুর্নাম ঝেড়ে ফেলতে পেরেছেন। 'বাবু-বেলুনিস্ট' তাঁর গত শনিবারের সফল আরোহণের পর সব নিন্দুকের মুখ বন্ধ করে দিয়েছেন। ফল হয়েছে এইটাই যে সব সংবাদপত্রের মধ্যে খোদ 'ইংলিশম্যান', সবচেয়ে উন্নাসিক নিন্দুকও বাধ্য হয়েছে এই 'বাবু বেলুনিস্ট'-এর শরণাপন্ন হতে। তা, এটা খুব অশালীন কোনো ছবি নয়, আমরা শুধু চাইব ছবিটার রঙ যেন চিরকাল অমলিন থাকে। 'ইংলিশম্যান' পড়েন যাঁরা, এ-কথার সার্থকতা ঠিকই অনুধাবন করবেন।"[১৭]

কলকাতার মিশনারি পত্রিকা 'দা ইন্‌ডো-উওরোপিয়ান করেসপণ্ডেন্স'-ও বৈজ্ঞানিক উদ্দেশ্যহীন বেলুনবাজির সমর্থক ছিল না। স্পেন্সারের প্রসঙ্গে তারা লিখছে, "আমরা তাঁর চরিত্রের দৃঢ়তা ও বীরত্বের প্রশংসা করি কিন্তু এই গুণগুলি হাওয়ায় উড়িয়ে না দিয়ে মহত্তর উদ্দেশ্যে নিযুক্ত হলেই খুশি হব। একটা কাজ যতই বীরত্বপূর্ণ হক, তা যদি উদ্দেশ্যহীন হয়, তা হলে তাকে অভিনন্দন জানানোর মতো কিছু থাকে না।" কিছুদিন পরে বিলেতে একটি বেলুন দুর্ঘটনার পরে কাগজটি আরও তিক্তভাবে জানিয়েছিল যে প্যারাসুটে অবতরণের তামাশাটা এবার আরও জনপ্রিয় হবে। কারণ, হতভাগ্য প্রদর্শকের প্রাণনাশের দৃশ্য দেখার সুযোগ থাকলে তবেই তামাশা জমে।[১৮]

এই কাগজও কিন্তু রামচন্দ্রের কৃতিত্বকে খাটো করে দেখেনি কারণ[১৯] :

...the Bengali Baboo, overcoming his natural timidity, penetrated into cloudland ....we would hardly have expected to find a Bengali Baboo taking to Balloon ing, of all things, in the quest for fame and fortune.

পেশাদার ফিরিঙ্গি বেলুনবাজদের সঙ্গে রামচন্দ্রের প্রধান পার্থক্য এইটাই। রামচন্দ্রের দুঃসাহসিকতায় মনোরঞ্জনের অতিরিক্ত একটি মাত্রা ছিল। সেটা স্বাদেশিকতা। দক্ষতায় ও বীরত্বে বাঙালিরাও সমানে-সমানে টুপিধারীদের সঙ্গে জুঝতে পারে, এটা শুধু বেলুনবাজিকে ঘিরে নয়, সার্কাসের তাঁবুতে, ক্রিকেট ও ফুটবল মাঠেও যখনই প্রদর্শিত হয়েছে, উদ্দীপিত হয়েছে জাতীয়তাবোধ।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, রামচন্দ্র প্রথম যৌবনে ছিলেন, 'ন্যাশনাল' নবগোপাল মিত্তিরের চেলা। বাঙালির প্রথম সার্কাস কোম্পানি 'ন্যাশানাল সার্কাস'-এ ফ্লাইং ট্র্যাপিজের খেলা দেখাতেন। উইলসন ব্রাদার্সের গ্রেগরি ভ্রাতৃদ্বয়ের খেলা দেখেই তিনি তা শিখেছিলেন। পরবর্তীকালে রামচন্দ্র নিজে 'গ্রেট ইণ্ডিয়ান সার্কাস কোম্পানি' খুলেছিলেন। তাছাড়া কলকাতার গভর্নমেন্ট নর্মাল স্কুলের ব্যায়াম-শিক্ষকও ছিলেন। রামচন্দ্রের জন্ম হয়েছিল কলকাতার সিমলা পল্লীর অন্তর্গত কাঁসারীপাড়ায়।[২০]

১৮৮৪ থেকে সত্তর বছরেরও বেশি কলকাতায় কাটিয়েছিলেন মেজর হ্যারি হব্‌স। স্মৃতিকথায় তিনি লিখেছেন, রামচন্দ্রের কন্যাও দুঃসাহসে কিছু কম ছিল না। সেও তার বাবার সঙ্গে কয়েকবার বেলুনে উড়েছিল।[২১]

উনিশ শতকের একটি কালীঘাটের পটেও সম্ভবত এই মন্তব্যের পরোক্ষ সমর্থন। ছবিতে দেখা যায়, প্যারাসুট হাতে এক মহিলা নেমে এসে একটি ঘোড়ার পিঠে বসতে যাচ্ছেন। ছবির ওপরে বাঁ দিকের কোণ দিয়ে আকাশে উড়ে যাচ্ছে সওয়ারিবিহীন হালকা বেলুন। নৃত্যলাল শীলের পঞ্জিকায় (১২৯৭) প্রকাশিত সংবাদের সঙ্গে মুদ্রিত ছবিটিতে দেখা যায় একজোড়া নরনারী বেলুনে চড়েছে। পঞ্জিকার খবরটিতে রামচন্দ্রেরও উল্লেখ ছিল। আরও একটি কালীঘাটের পটে টুপিধারী এক বেলুনারোহীর দর্শন পাই আমরা। টুপিধারী বলেই যে তিনি রামচন্দ্র নন, এ-কথা জোর দিয়ে বলা সম্ভব নয়। রামচন্দ্র পুরো সাহেবি পোশাকেই বেলুনে চড়তেন, টুপি পরতেন, তারও উল্লেখ আছে।[২২] প্রথম প্যারাসুট অবতরণের দিন "he wore a close-fitting jacket, with violet shot trousers, and looked every inch an European to collars and cuffs."

দেশী ও বিদেশী বেলুন আরোহীদের নিয়ে আরও কয়েকটি কালীঘাটের পটের প্রতিচ্ছবি

এখানে রবীন্দ্র ভারতী সোসাইটির সৌজন্যে মুদ্রিত হয়েছে।

সংবাদপত্রের সূত্রে জানা যায়, ১৮৯২-এর ৯ আগস্ট নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত রামচন্দ্রের মৃত্যু হয়। কিন্তু হ্যারি হবস ও 'তত্ত্ব ও তন্ত্রী'-তে প্রকাশিত 'বিমান বিহারের কথা' প্রবন্ধের লেখক রমেশচন্দ্র শুঁই-এর মতে রামচন্দ্র একবার বেলুনে করে নামার সময় আহত হন, তারই ফলে তাঁর মৃত্যু। হয়তো নিউমোনিয়া ছিল তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত কারণ।[২৩]

রামচন্দ্রের পর আরও দু'জন বাঙালি স্পেন্সারের সঙ্গে ১৮৯০ খ্রীস্টাব্দে কলকাতা থেকে বেলুনে চড়েন। এর মধ্যে প্রবোধচন্দ্র লাহা এককভাবেও উড়েছিলেন। তবে রামচন্দ্রের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে নিজেকে তিনি প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি। কথার খেলাপ, বিফলতা ইত্যাদি তাঁর দুর্নামের কারণ হয়।[২৪]

তৃতীয় বেলুনারোহী বাঙালি যোগেশচন্দ্র চৌধুরী। আশুতোষ চৌধুরীর ভাই, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির জামাতা ও পরবর্তী জীবনে লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যারিস্টার ও শিক্ষাবিদ যোগেশ চৌধুরীকে সবাই একনামে চেনেন। কিন্তু তাঁর এই বেলুন-অভিযান বিস্মৃত। ঘটনাটি বিশেষভাবে স্মরণীয়, কারণ তিনি বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের কাজেই বেলুনে চড়ে আকাশে উড়েছিলেন। ভারতের আকাশে এটি দ্বিতীয় বৈজ্ঞানিক হানা। পদার্থ ও রসায়নবিদ্যায় এম এসসি যোগেশচন্দ্র তখন মেট্রোপলিটান কলেজের বিজ্ঞানের অধ্যাপক।[২৫] মনে রাখা দরকার বিদ্যাসাগর তখনও জীবিত। ১৮৯০-এর ২২ ফেব্রুয়ারি বিরাট বিজ্ঞাপন ছাপা হল 'স্টেটসম্যান' পত্রিকায় :

TO-DAY SATURDAY TO-DAY
At 4-30 P.M. PROMPT
MR. PERCIVAL SPENCER
WILL MAKE A
Scientific Balloon Ascent
IN HIS
"City of York" Balloon,
Upon which occasion he will be accompanied by,
D. Coats Niven, Esq.,
Manager, Oriental Gas Co.,
Mr. F. Kapp, Photographer and Professor Chowdhurie of the
Metropolitan Institution
For the purpose of making scientific researches in the air
by means of Scientific Instruments and
Photographic Apparatus.

পরের দিনের কাগজে প্রকাশিত হল সফল বৈজ্ঞানিক অভিযানের বিবরণ। রয়েল টিভোলি গার্ডেন ত্যাগ করে বেলুন প্রায় তিন হাজার ফিট উঠে যায়। তারপরে দক্ষ হাতে স্পেন্সার বেলুনটি প্রায় ঘণ্টাখানেকের মতো নিশ্চল রাখেন যাতে ফোটোগ্রাফ তোলা ও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা যায়। প্রতিবেদক জানান, মিস্টার কাপ আকাশ থেকে নীচের দৃশ্যাবলীর বেশ কয়েকটি ছবি তোলেন এবং প্রফেসর চৌধুরী ও মিস্টার নিভেন বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ করেন। পর্যবেক্ষণের ফল পরে

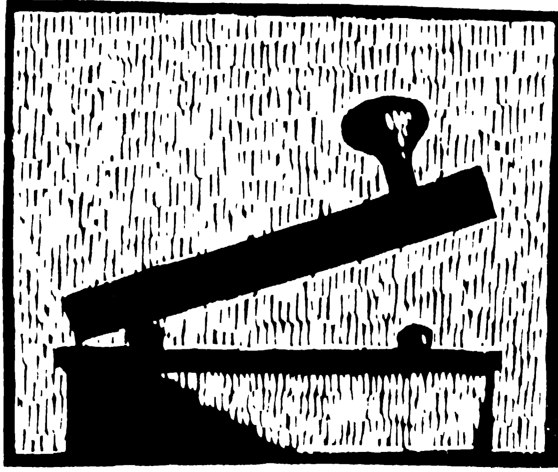
প্রকাশিত হওয়ার প্রতিশ্রুতি কেন 'স্টেটসম্যান' রাখতে পারেনি বলা কঠিন। কাপ-এর তোলা কলকাতার প্রথম এরিয়াল ফোটোগ্রাফেরও বোধহয় আর কোনো হদিস মেলা সম্ভব নয়।[২৬]

প্রফেসর চৌধুরীর আগে স্পেন্সারের সঙ্গেই আর-একজন বেলুনে চড়ে বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ চালিয়েছিলেন কলকাতার আকাশে। ১৮৮৯-এর ১৮ এপ্রিল রয়েল কানাডিয়ানের লেফটেন্যান্ট কানিংহ্যাম গ্যাস কোম্পানির মাঠ থেকে আরোহণ করেন, কলকাতার হাওয়া অফিস প্রদত্ত যন্ত্রপাতি নিয়ে আকাশের অবস্থা ও বায়ুস্রোত ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য। বারাসতের দু' মাইল দূরে বাদু বাজারের কাছে সাড়ে ছ'টায় অবতরণ করেন তাঁরা।[২৭]

বেলুন নিয়ে কলকাতার লোকের আগ্রহ সবে পড়ে এসেছে, সেই সময়ে এক তরুণ ইঞ্জিনিয়ার দার্জিলিঙে 'ফ্লাইং-মেশিন' নিয়ে ট্রায়াল দিতে শুরু করেন। ১৮৯২-এর ১০ অগাস্ট ইন্ডো-ইওরোপিয়ান করেসপন্ডেন্স জানায়, এই উড়ন্ত যন্ত্রটি 'ন্যাচারাল প্রিন্সিপাল' অনুযায়ী চালিত হবে। সম্ভবত পাখির মতো ডানাওয়ালা গ্লাইডারের কথাই বলা হচ্ছে। কলকাতাতেও ভদ্রলোকের পরীক্ষা চালাবার ইচ্ছে আছে, জানানো হয়েছিল।

কলকাতায় প্রথম ইঞ্জিন-চালিত বিমানের মহড়া দেওয়ার জন্য বেলজিয়ান বৈমানিক ব্যারন ডি কেটার্স ও তাঁর সহকারী জুল টিক কলকাতায় এসে পৌঁছন ১৯১০-এর ১২ ডিসেম্বর। ইতিপূর্বেই জাহাজে করে তাঁরা চারটি বাইপ্লেন ও দুটি মনোপ্লেন পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। ২০ ডিসেম্বর 'ব্লেরিও' মোনোপ্লেনে চড়ে কেটার্স প্রথম কলকাতার আকাশে উড়লেন টালিগঞ্জ ক্লাবের মাঠ থেকে। বারো মিনিট কসরত দেখিয়ে নেমে আসেন তিনি। এই ঘটনার তিনদিন আগে, ১৮ ডিসেম্বর এলাহাবাদের আকাশে ভারতের প্রথম কার্যকর এরোপ্লেন দেখা যায়। কার্যকর বলার কারণ, ১৯১০-এর ৩ নভেম্বর উইলফ্রেড উইল্‌স নামে এক মোটর ইঞ্জিনিয়ার তাঁর কুড়ি হর্স পাওয়ারের 'হোম মেড' মেশিন নিয়ে তিরিশ গজ উড়েছিলেন।[২৮]

ক্যাটার্স সাধারণ জনসমাবেশের সামনে কলকাতায় প্রথম বিমান-চালনা প্রদর্শন করেন ১৯১০-এর ২২ ডিসেম্বর। সেদিন উপস্থিত ভারতীয় দর্শকদের মধ্যে একমাত্র মৃণালিনী সেন বৈমানিকের আহ্বান গ্রহণ করে বিমানে সফর করেন। প্রথম বিমানারোহী এই বঙ্গ মহিলা স্বনামধন্যা। কেশবচন্দ্র সেনের দ্বিতীয় পুত্রের পত্নী।[২৯]



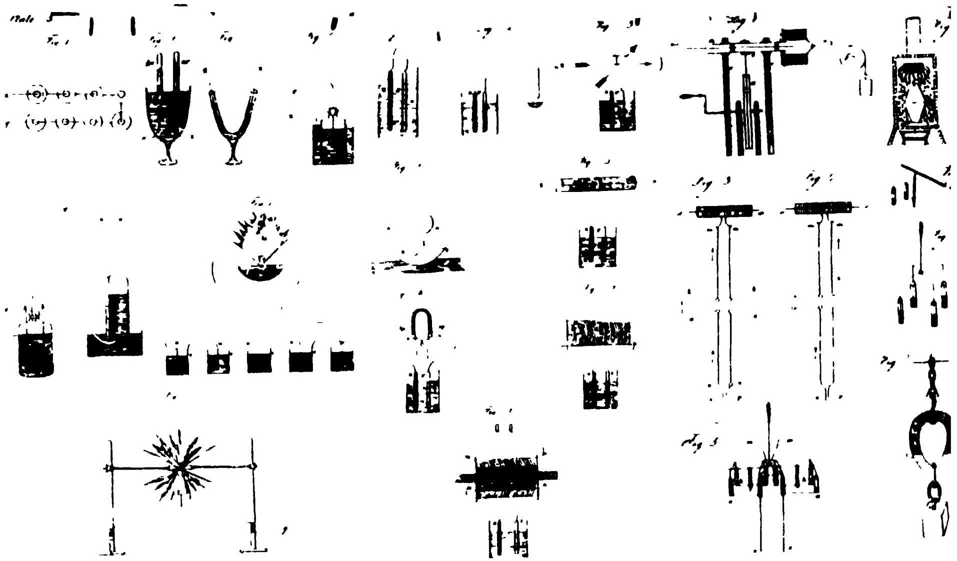
# খবরাখবরের 'টরেটক্কা' কল ও শিবচন্দ্র নন্দী

ইলেকট্রিক টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা প্রবর্তনের পরেই ব্যাপকভাবে বৈদ্যুতিক যন্ত্রের ব্যবহার শুরু এবং ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বৃত্তিরও জন্ম হয় তখনই।[১] ভারতের টেলিগ্রাফের জন্মদাতাদের অন্যতম শিবচন্দ্র নন্দীকে সঙ্গত কারণেই প্রথম ভারতীয় ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার বলে অভিহিত করা যায়। ডিগ্রির দৌলতে নয়, কৃতিত্বের জন্য ও পেশাগত কারণে।

বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফ চালু হওয়ার আগে কলকাতায় 'সেমাফোর' নামে এক পদ্ধতিতে সঙ্কেতে খবর পাঠানো হত। কিছুদূর অন্তর স্থাপিত উঁচু-উঁচু স্তম্ভের মাথায় 'সেমাফোর' যন্ত্র যে সাঙ্কেতিক চিহ্ন নির্দেশ করত তা দূরবিনের সাহায্যে পরবর্তী স্তম্ভ থেকে লক্ষ্য করা হত এবং সেখানেও তখন একই চিহ্ন প্রদর্শিত হত। এইভাবে রিলে পদ্ধতিতে পরিবাহিত হত সংবাদ।[২]

জি· পি· ও-র বাড়ির এককোণে 'পোস্টাল মিউজিয়াম ও ফিলাটেলিক লাইব্রেরি'-তে ডাকহরকরাদের আমলের পোশাক,ঘুঙুর, সড়কি থেকে শুরু করে হরেক রকমের চিঠি ফেলার বাক্স কি আদ্যিকালের টেলিফোনের রিসিভারের সঙ্গে 'সেমাফোর' যুগের একটি নিশান উত্তোলনের যন্ত্রও আছে। হুগলী নদীর মোহানার কাছে মাড্ পয়েন্ট পোস্ট অফিস থেকে সেটি সংগ্রহ করা হয়েছে। ১৮২৭-এ কলকাতা থেকে চুনারের মধ্যে সংবাদ বিনিময়ের জন্য ৮ মাইল অন্তর সেমাফোর স্তম্ভ বসানো হয়। এক বছরের মধ্যে কলকাতা ও ব্যারাকপুরের মধ্যেও স্থাপিত হয় সেমাফোর-ব্যবস্থা। সেমাফোরের তৃতীয় লাইনটি চালু হয় ১৮৩০-এ। ক্যালকাটা এক্সচেঞ্জ বিল্ডিং (বর্তমান হংকং ও সাংহাই ব্যাঙ্কের স্থান) থেকে ডায়মন্ড হারবারের কুড়ি মাইল নীচে কৈখালি লাইট-হাউস অবধি তেরটি সেমাফোর স্তম্ভ বসানো হয়।[৩]

খাস কলকাতায় এখনও দেড়শো বছরের পুরনো একটি সেমাফোর টাওয়ার বহাল তবিয়তে



ও'শনেসীর গবেষণা পত্র থেকে

রয়েছে শুনলে অবাক লাগতেই পারে। তবে স্ট্র্যান্ডে বেড়াবার সময় ছাড়া এটি সাধারণ লোকের চোখে পড়ার বা দেখার সুযোগ নেই। এটি আছে ফোর্ট উইলিয়ামের সংরক্ষিত চত্বরের ভিতরে। তবে কলকাতার পুরনো লোক যাঁদের তোপ পড়ার কথা মনে আছে, একনজরেই চিনে নিতেপারবেন এটিকে। এই সেই 'বল-টাওয়ার' যার নির্দেশ অনুসারে প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে ঘড়ি মিলিয়ে নেওয়া হতো। এই 'বল-টাওয়ার'টির কিন্তু জন্ম হয়েছিল সেমাফোর টাওয়ার হিসেবেই। চারতলা বিশিষ্ট গোলাকৃতি একটি স্তম্ভ যার মাথার দিকটা সামান্য সরু হয়ে গেছে।[৪]

ভারতে বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফের জনক উইলিয়াম ব্রুক ও'শনেসি। তিনি ১৮৩৫-এ কলকাতা মেডিকেল কলেজে নিযুক্ত হন রসায়ন ও মেটিরিয়া মেডিকার প্রথম অধ্যাপক হিসেবে। সেকালের কলকাতার গর্ব ছিলেন ও'শনেসি। তিনি মিন্ট মাস্টার, কেমিক্যাল এগ্‌জামিনার অব মিন্ট এবং এশিয়াটিক সোসাইটির জয়েন্ট সেক্রেটারি রূপেও কাজ করেছেন। 'জার্নাল অফ এশিয়াটিক সোসাইটি'র বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত তাঁর বহু প্রবন্ধ থেকে জানা যায়, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, বিশেষ করে গ্যালভানিক ব্যাটারি তৈরির ব্যাপারে তাঁর নানা ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ও কৃতিত্বের উপাখ্যান।[৫] বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, বিদ্যুতের সাহায্যে জলের নিচে বারুদের বিস্ফোরণ ঘটানো। 'ইকুইটেব্‌ল' নামে একটি জাহাজ ১৮৩৯-এ 'ফল্‌তা স্যান্ডস্‌'-এর কাছে ডুবে যাওয়ার পর নৌ-চলাচলে দারুণ অসুবিধা দেখা দেয়। এই ডুবন্ত জাহাজের মধ্যে বারুদ রেখে বৈদ্যুতিক উপায়ে সেটিতে আগুন ধরিয়ে দেন ও'শনেসি। প্রবল বিস্ফোরণ জাহাজটিকে চুরমার করে দেয়।[৬]

১৮৩৯-এ বোটানিকাল গার্ডেনে ২১ মাইল লম্বা তার খাটিয়ে (একটি সীমাবদ্ধ জায়গার মধ্যে তারটিকে চারটি খুঁটির গায়ে বারবার জড়ানো হয়েছিল), ও'শনেসি সেটির দু' প্রান্তের মধ্যে সঙ্কেত

বিনিময়ে সফল হন। কিন্তু সফল হলেও তাঁকে হাত গুটিয়ে বসে থাকতে হয়েছিল দশ বছরের উপর। যতদিন না ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কলকাতা থেকে ডায়মন্ড হারবার পর্যন্ত লাইন বসাবার অর্থ মঞ্জুর করল। অনুমতি পাওয়ার দশ মাসের মধ্যে ও'শনেসির নেতৃত্বে, ১৮৫১ খ্রীস্টাব্দে, টেলিগ্রাফ লাইনের একুশ মাইল লম্বা প্রথম অংশের কাজ শেষ হয়। ভারতের সেই প্রথম বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফ লাইনের দুটি টুকরো সযত্নে রাখা আছে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল ও বিড়লা শিল্প ও কারিগরি সংগ্রহালয়ে।

প্রথম লাইন পাতার প্রথম মুহূর্ত থেকে এই কাজের সঙ্গে জড়িত ছিলেন শিবচন্দ্র নন্দী। কিংবা তারও আগে থেকে। ১৮৪৬-এ বাইশ বছরের যুবক শিবচন্দ্র কলকাতার টাঁকশালের রিফাইনারি ডিপার্টমেন্টে যোগ দেন। তাঁর কারিগরি দক্ষতা তখনই ও'শনেসির নজরে পড়ে এবং শিবচন্দ্র হয়ে ওঠেন তাঁর দক্ষিণ হস্ত।

১৮৫১-য় ডায়মন্ড হারবার প্রান্ত থেকে ঐতিহাসিক প্রথম বৈদ্যুতিক সমাচারটি শিবচন্দ্রই পাঠিয়েছিলেন। সেটি কলকাতায় লর্ড ডালহৌসির সামনে গ্রহণ করেন ও'শনেসি। কিছুদিন বাদে টেলিগ্রাফ বিভাগের প্রথম ভারতীয় কর্মী শিবচন্দ্র অন্যান্য সংবাদপ্রেরকদের প্রশিক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

ইস্ট ব্যারাকপুর থেকে এলাহাবাদ, বেনারস থেকে মীর্জাপুর, মীর্জাপুর থেকে শিওনি এবং কলকাতা থেকে ঢাকা পর্যন্ত ৯০০ মাইল টেলিগ্রাফ লাইন পাতার কাজ তদারকি করেছিলেন শিবচন্দ্র।

কলকাতা থেকে ঢাকা অবধি লাইন স্থাপনের কাজের সবচেয়ে রোমাঞ্চকর অধ্যায়টি ছিল ভয়াবহ পদ্মার সঙ্গে পাঞ্জা কষা। মাটির উপর দিয়ে তার টানা নয়, পদ্মার জলের তলা দিয়ে 'সাবমেরিন কেবল' পাততে হবে। কোনো স্টিমার কোম্পানিই দশ হাজার টাকার কমে কাজে হাত দিতে রাজি নয়। শিবচন্দ্র শেষ পর্যন্ত জেলে ডিঙি ভাড়া করে ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে কৃতকার্য হলেন।[৭]

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ শিবচন্দ্রের দুঃসাহসিকতা সম্বন্ধে লিখেছিলেন, "বহু লোকের কীর্তিনাশ করিয়া যে পদ্মা কীর্তিনাশা নাম লাভ করিয়াছিল, সেই পদ্মায় ৭ মাইল 'কেব্‌ল' স্থাপনের কার্য শিবচন্দ্র যেরূপ অল্প ব্যয়ে সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন, তাহা বিস্ময়কর। তিনি সেজন্য অনায়াসে আপনার জীবন বিপন্ন করিয়াছিলেন—কেবল কার্যের আগ্রহে আর সাফল্যজনিত আনন্দের প্রেরণায়।... একবার তার খাটানোর জন্য উপযুক্ত স্থান সন্ধান করিতে যাইয়া তিনি চোরাবালিতে পদক্ষেপ করায় দেখিতে দেখিতে নিমগ্ন হইতেছিলেন—তাঁহার সঙ্গীরা কোনোরূপে তাঁহার জীবন রক্ষা করিয়াছিল। একবার তিনি অজগরের সম্মুখে গিয়া পড়িয়াছিলেন এবং কেবল একদল উদ্ধত ইংরেজ সৈনিক অনাচার হেতু তাঁহার নিকট অপমানিত হইয়া দলবদ্ধ হইয়া গোপনে তাঁহাকে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহার বুদ্ধিতে ব্যর্থকাম হইয়াছিল। একবার কোন সামন্ত নৃপতির অসঙ্গত আদেশ পালন করিতে অস্বীকার করায় রাত্রিকালে তাঁহার তাঁবুতে আগুন ধরাইয়া তাঁহাকে সদলে হত্যা করিবার চেষ্টাও হইয়াছিল....[৮]

শুধু দুঃসাহস আর দক্ষতা নয়, শিবচন্দ্র সৃজনশীল ভাবেও তাঁর অর্জিত জ্ঞানকে প্রয়োগ করতে পেরেছিলেন, এবং ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে সেখানেই তাঁর আসল সার্থকতা। ইলেকট্রিকের তার খাটানোর জন্য তখন লোহার খুঁটি আনানো হতো ইংলন্ড থেকে। শিবচন্দ্র তালগাছের গুঁড়িকে লোহার খুঁটির বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। কিভাবে ইন্‌সুলেটর বসানো ও তার সংযুক্ত করা হবে সে-বিষয়ে

অপূর্ব কিছু ড্রইং দিল্লির ন্যাশানাল আর্কাইভের হেফাজতে রয়েছে। এই প্রসঙ্গে ১৮৫৫-র ৩০ সেপ্টেম্বর শিবচন্দ্র ও'শনেসিকে একটি চিঠিতে লিখছেন[৯] :

....I have to this day forwarded to your address at Agra drawings of the Toddy palm-posts with their various insulators in the various methods in which I have used them for your lines, together with that of an obelisk lately erected at Dehree, as well as those proposed for the flying line across the Soane River and one for Baroon.

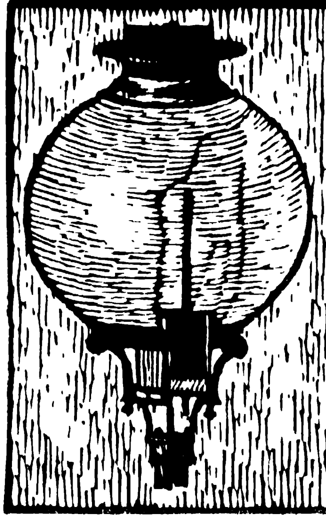
পরিণত বয়সে কলকাতায় নিজের বাড়িতে ১৯০৩-এর ৯ এপ্রিল শিবচন্দ্রের মৃত্যু হয়। তাঁর প্রতি কলকাতার একমাত্র শ্রদ্ধার্ঘ্য—বড়বাজারের কাছে ছোট্ট একটি গলি যার নাম 'শিবু নন্দীর লেন'।[১০]

শিবচন্দ্রের উপরোক্ত চিঠিটি লেখার বছরেই প্রকাশিত হয় বাংলা ভাষায় ইলেকট্রিক টেলিগ্রাফ বিষয়ে প্রথম এবং সম্ভবত আজ অবধি একমাত্র পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ 'ইলেকট্রিক টেলিগ্রাফ বা তড়িৎ বার্ত্তাবহ প্রকরণ'। বইটির লেখক শ্রীরামপুরের বাসিন্দা কালিদাস মৈত্র আগের বছর, ১৮৫৪-য়, কারিগরি বিষয়ে বাংলায় আরেকটি ঐতিহাসিক বই রচনা করেছিলেন, 'বাষ্পীয় কল ও ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে'।

টেলিগ্রাফ বিষয়ে বর্তমানে অত্যন্ত দুর্লভ এই বইটির ভূমিকায় লেখক জানিয়েছিলেন, 'গৌড়ীয় ভাষা'য় ইলেকট্রিক টেলিগ্রাফ বিষয়ে কোনো বই না থাকায় তিনি 'চেম্বার্স ইনফরমেশন ফর দা পিপ্‌ল', লার্ডনার-রচিত 'মিউজিয়ম অফ সায়েন্স অ্যান্ড আর্ট' এবং 'এনসাইক্লোপেডিয়া অফ আমেরিকানা' থেকে 'বহ্বায়াসে' সংকলন করত সাধ্যানুসারে অনুবাদ' করেছিলেন।

ভূমিকা পড়ে মনে হতে পারে বইটি শিক্ষামূলক 'ম্যানুয়েল' জাতীয়, কিন্তু লেখক ভারতে টেলিগ্রাফ লাইন বিস্তার সম্বন্ধেও কিছু আকর্ষণীয় তথ্য পেশ করেছেন, যা অনুবাদ নয়, সংগৃহীত তথ্য। এদেশে ইংলন্ডের রেওয়াজ ভেঙে মোটা তার খাটানো সম্বন্ধে তিনি লিখছেন, "শ্রীযুক্ত ওসেনসি সাহেব যৎকালে কলকাতায় কেবল পঁচিশ ক্রোশ পথ ব্যাপিয়া বার্তাবহ শলাকা পরীক্ষার্থে বিস্তার করিয়াছিলেন, তৎকালে এদেশে অন্য কোন প্রকার উপযুক্ত মত তার প্রাপ্ত না হইয়া বাঁশের খুঁটির উপর অতি মোটা লৌহের শলাকা স্থাপন করিয়াছিলেন। অতঃপর এতদ্দেশের ভাবগতিক অবলোকন পুরঃসর এই স্থির করিলেন যে, ইংলন্ড দেশে যদ্রূপ সূক্ষ্ম তারে ভারতবর্ষে কৃতকার্য হওয়া যাইবে না, কারণ পরীক্ষার্থ শলাকা বিস্তার করিবা মাত্রেই তদুপরি বায়স ও শকুনি প্রভৃতি বৃহৎ বৃহৎ পক্ষী বসিয়াছিল এবং ঐ দৃষ্টান্তে বৃক্ষ হইতে কপিগণ ঐ শলাকা টানিয়াছিল....এ দেশে খুঁটি সকল অনেক অন্তর অন্তর স্থাপিত, প্রত্যুত তদুপরি যে তার আছে তন্নিম্ন দিয়া আম্বারি সহিত হস্তী যাইতে পারে....ইংলন্ডাদি প্রদেশে বিদ্যুতের গতি নিমিত্তে যে রূপে ফাঁকা লৌহ শলাকার মধ্যে তামার তার প্রোথিত করত মৃত্তিকায় প্রোথিত করা রীতি আছে অস্মদ্দেশে শ্রীযুক্ত ওসেনসি সাহেব তন্মত না করিয়া, উইয়ে খাইতে না পারে এ জন্য সম্পূর্ণ রূপে সম্বল ক্ষারে পক্ক করত তাহাতে ছিদ্র করিয়া সেই ছিদ্রের মধ্যে তামার তারকে গটাপর্চা (বটের আঠা) বিশেষ মাখাইয়া প্রবিষ্ট করণক দুই ফিট গভীর খাদে প্রোথিত করিয়াছেন।"

কালিদাস মৈত্রের অক্ষয় কীর্তি, তাঁর এই বইটিতে বাংলায় সংবাদ প্রেরণের একটি প্রস্তাব এবং প্রস্তাব কার্যকর করার জন্য ইংরেজি কী-বোর্ড (key-board)-এর বিকল্প ব্যবস্থার একটি চার্ট প্রকাশ।



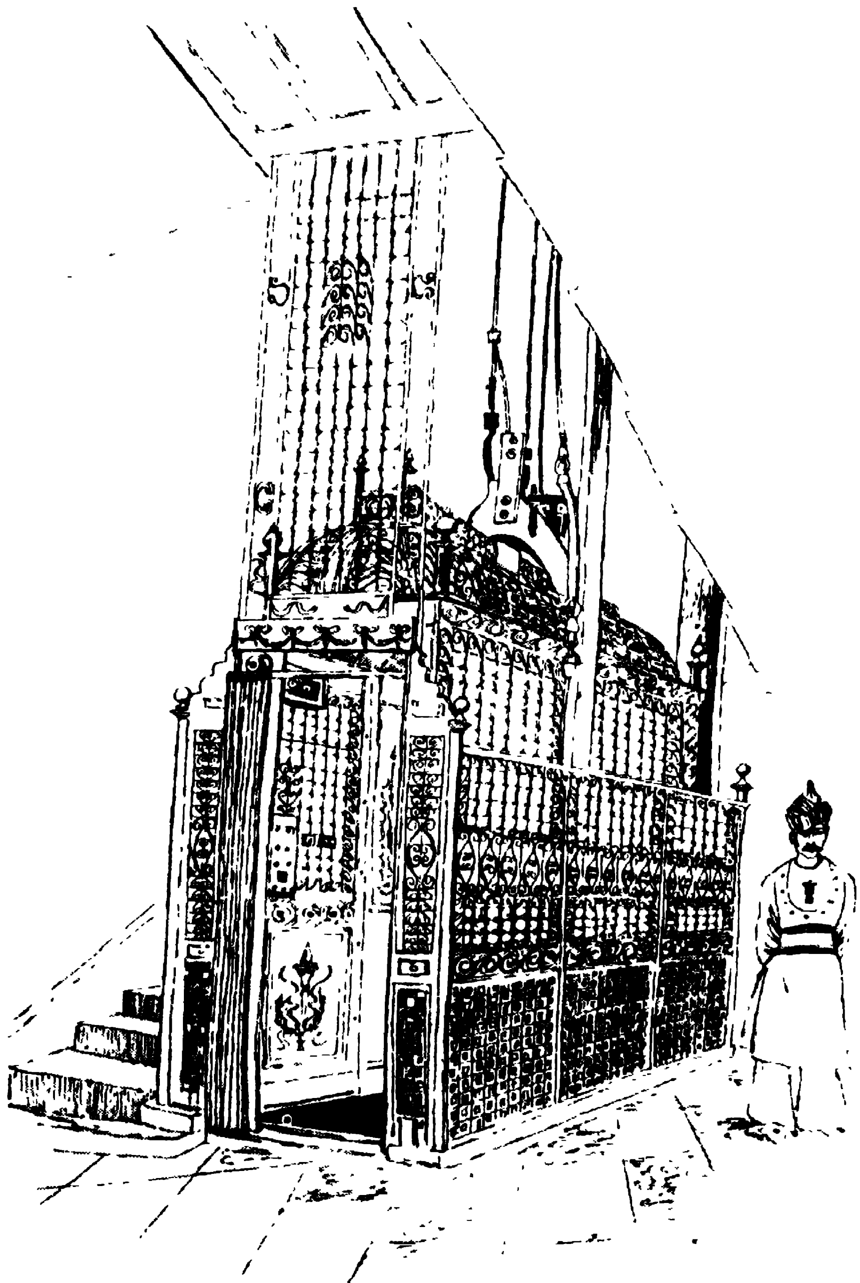
# বিজলি কল, দে শীল অ্যান্ড কো ও জগদীশচন্দ্র বসু

"ধোঁয়া ও বাষ্প দিয়া রেলের গাড়ী চলা কত সুবিধাজনক ও আশ্চর্য্য। এখন আবার তাড়িৎ দ্বারা তাবে খবর যায়, তাহার জোরে রেলগাড়ী চলিতেছে। ইহার ক্ষুদ্রাকার নমুণা, আমাদিগের পাঠিকাদিগের মধ্যে যাঁহারা আলীপুর 'জুওলজীকেল গার্ডেনে' (পশুশালায়) সম্প্রতি গিয়াছেন, দেখিয়া থাকিবেন।"

১৮৮১ সালের অগাস্ট মাসে 'বামাবোধিনী পত্রিকা' চিড়িয়াখানায় ইলেকট্রিক রেল চালু হওয়ার পর এই খবর দিয়েছিল। অবাক করার মতোই খবর, কারণ সাধারণত কলকাতায় বৈদ্যুতিক পরিবহণ বলতেই ১৯০২ সালে প্রথম ইলেকট্রিক ট্রামগাড়ি চালু হওয়ার কথাই মনে পড়ে।

প্রমোদ ভ্রমণের জন্য চিড়িয়াখানায় এই ইলেকট্রিক রেলওয়ে বসার খবর সে-বছরের জানুয়ারি মাসের 'স্টেটসম্যানে'র একটি বিজ্ঞাপন থেকেও জানা যায়।''স্টেট ক্যারেজে' চড়ার জন্য যাত্রীদের আট আনার এবং সেকেন্ড ক্লাসে চড়ার জন্য চার আনার টিকিট কাটতে হতো।[১] এ-ঘটনার মাত্র দু' বছর আগে বার্লিন প্রদর্শনীতে ওয়ার্নার সিমেন্সের ইলেকট্রিক রেলওয়ে ব্যবস্থা দেখে দর্শকরা আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল। কাজেই কলকাতা খুব একটা পিছিয়ে ছিল না।

১৮৮০-র ডিসেম্বরে. বড়দিনের সময় এ.সিবলিঙ্গার নামে এক অস্ট্রিয়ান ভদ্রলোক বার্ন অ্যান্ড কোম্পানির সহায়তা নিয়ে চিড়িয়াখানায় বৈদ্যুতিক টয়-ট্রেন চালানোর ব্যবস্থা করেন। বাংলার গভর্নর ও হাজারখানেকেরও বেশি দর্শকের সামনে প্রথম ট্রেন চলাচলের উদ্বোধন হয়। এই রেলব্যবস্থা নাকি ভিয়েনার চিড়িয়াখানা থেকে আনা হয়। কলকাতার চিড়িয়াখানার বাইরে স্থাপিত একটি দশ অশ্বশক্তির বাষ্পীয় ইঞ্জিনের সাহায্যে উৎপন্ন করা হয়েছিল বিদ্যুৎ। এই বিদ্যুৎ-চালিত মোটরই সংযুক্ত



কলকাতা রাজভবনের 'কার্জন' লিফট। স্কেচ . ডেসমন্ড ডয়েগ

ছিল রেলগাড়ির দুটি চাকার সঙ্গে।[২]

ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকে আজ অবধি কলকাতার বিজলির চাহিদা পূরণের একচ্ছত্র অধিকারী হয়ে রয়েছে। কিন্তু বিজলি আলো জ্বালার ব্যাপারে কলকাতায় প্রথম বড় আকারের উল্লেখযোগ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছিলেন লুই শোয়েন্ডলার। ভারতের টেলিগ্রাফ বিভাগের সুপারিন্টেন্ডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার।

১৮৭৭-এ সরকারের তরফ থেকে পরীক্ষামূলক ভাবে রেলওয়ে স্টেশনে বিজলি আলো দেওয়ার ব্যাপারে তাঁকে খোঁজখবর করতে বলা হয়। ১৮৮০-র ৩১ মে ও ১০ জুন তাঁর পরিকল্পনা অনুসারে হাওড়া স্টেশনের দুটি প্ল্যাটফর্ম বিজলি আলোয় ঝলমল করে ওঠে। একটি ২৫ অশ্বশক্তির সেকেন্ড হ্যান্ড স্টিম ইঞ্জিন দিয়ে চারটি ডায়নামো-ইলেকট্রিক মেশিন ঘুরিয়ে দুটি 'গুড্‌স্ শেড'-এ চারটি কার্বন আর্ক-ল্যাম্প জ্বালিয়েছিলেন তিনি। বিজলি আলোর প্রতিফলক হিসেবে তিনি কাচের প্রলেপ দেওয়া দস্তার পাত ব্যবহার করেন। শোয়েন্ডলার লিখে গেছেন, "পরীক্ষামূলক আলো জ্বালার ব্যাপারে প্রথম থেকেই নেটিভদের উপর সম্পূর্ণ ভরসা করা হয়েছিল। তার থেকে বোঝা গেছে যে, ট্রেনিংপ্রাপ্ত নেটিভদের সাহায্যে এদেশে বিজলি আলো জ্বালানোর ব্যাপারে কোনো অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। নেটিভরা ডায়নামো মেশিন বা ল্যাম্প সারানোর কাজেও যথেষ্ট দক্ষ।"

প্রসঙ্গক্রমে শোয়েন্ডলার তাঁর রিপোর্টে ভারতীয় স্টিম ইঞ্জিন চালকের প্রশংসা করে বলেছিলেন, গভর্নর নামে ইঞ্জিনের একটি যন্ত্রাংশ যখন বেগড়বাই করছিল তখন, 'মার্কারি স্পিডোমিটার'-এর সাহায্যে সেটিকে শায়েস্তা করতে তার কোনো অসুবিধে হয়নি।[৩]

আলো জ্বালা মানে একটা সুইচ টেপা। এখন বিজলি আলো বলতেই এইরকম শান্তশিষ্ট বাধ্যবিনীত একটা জিনিসের কথা মনে হয় আমাদের। কিন্তু উনিশ শতকের যে বিজলি আলো, তার যেমন হাঁকডাক, বেয়াড়াগিরিও কিছু কম নয়। এ শুধু কথার কথা নয়, সে-যুগের কার্বন আর্ক-ল্যাম্প জ্বালার সময় এমন আওয়াজ হত যে, শোয়েন্ডলার লিখেছেন, "একটি শান্ত ঘরের মধ্যে বিজলি আলোর হিস্‌হিস্ শব্দ একেবারেই অসহনীয় ব্যাপার।"[৪]

ঘরোয়া পরিবেশে এই আলো ব্যবহার করার কোনো সুযোগ ছিল না। তাছাড়া আলো জ্বালা মাত্রই কার্বনের রড দুটো ক্রমেই পুড়ে পুড়ে ছোট হতে থাকত। অথচ কার্বনের রডের দুই প্রান্তের মধ্যে একটি বিশেষ ফাঁক বজায় রাখতে না পারলে আলো নিভে যাবে। তাই প্রজ্বলিত অবস্থায় কার্বনের রড দুটি যাতে ক্রমেই একে অন্যের দিকে এগোতে পারে তার জন্যও ছিল বিশেষ স্বয়ংক্রিয় যান্ত্রিক ব্যবস্থা।

এইসব ঝঞ্ঝাটের কথা মনে করিয়ে দেওয়ার একটা উদ্দেশ্য আছে। সে যুগে বিজলি আলোর বাঙালি কারবারি দে, শীল অ্যান্ড কোম্পানির কৃতিত্বের মাপটা তা না হলে পাওয়া যাবে না।

১৮৮৫-র জানুয়ারি মাসে এক রাত্তিরে চিৎপুরের রাস্তা দিয়ে বিয়ের শোভাযাত্রা চলেছে। চোখধাঁধানো বিজলি আলোর আকর্ষণে অসংখ্য মানুষের ভিড়। 'ফ্রেন্ড অফ ইন্ডিয়া' কাগজে এই ঘটনার এবং তার পরের বছরেও এরকম আর-একটি বিজলি আলো শোভিত শোভাযাত্রার বর্ণনা আছে। ১৫০০ মোমবাতি-শক্তি বিশিষ্ট 'সেরিন' ল্যাম্প 'অত্যন্ত উজ্জ্বল ও স্থির ভাবে' আলোক বিতরণ করেছিল। রিপোর্টে বলা হয়, ইলেকট্রিসিয়ান ভদ্রলোকের নাম মিস্টার শীল, যিনি দে, শীল অ্যান্ড কোম্পানির অংশীদার। তখন এই কোম্পানির ঠিকানা ছিল ৩৬ ওয়েলিংটন স্ট্রিট।[৫]

# WONDERFULLY CHEAP,

FOR

## Rs. 10. Ten Rupees. Rs. 10.

ONLY

## *PORTABLE ELECTRIC BELL*

**SET COMPLETE.**

**With a *Battery* in a nice mahogany polished box, 20 yds. of *double wire*, well insulated for the line, with a polished *mahogany Push* attached, and a packet of *salamoniac* to charge the Battery, which will remain constant for six months, after which it can be re-charged with fresh salamoniac solution at two annas only. With full direction enabling any one to fit it up.**

## DEY, SIL & CO.,

***Electricians, Electro-Metallurgists & Brass Founders***

**38, WELLINGTON-STREET, CALCUTTA.**

দে শীল অ্যান্ড কোম্পানির বিজ্ঞাপন

বিজলি বিশারদ দে, শীল অ্যান্ড কোম্পানির আরও কিছু ঐতিহাসিক কীর্তির কথা জানা যায়। কলকাতায় অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সদস্যদের সম্মানার্থে ১৮৮৬-র ২৮ ডিসেম্বর একটি সান্ধ্য পার্টির আয়োজন হয়েছিল। বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সেদিন তিনি "very kindly sang a few songs of his own composition assisted by a strong chorus." এই উপলক্ষে দে, শীল সভাগৃহকে বিজলি আলোয় উদ্ভাসিত করে এবং তাদের তৈরি ইলেকট্রিক যন্ত্র প্রদর্শিত হয়। সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের বিজ্ঞানের অধ্যাপক ফাদার লাফোঁ ও প্রেসিডেন্সি কলেজের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক মিস্টার ইলিয়ট তাদের এই যন্ত্রের অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছিলেন।[৬]

মহারানী ভিক্টোরিয়ার জুবিলি অনুষ্ঠান পালন করার সময় কলকাতাকে আলোকসজ্জায় সাজানো হয় ১৮৮৭-র ১৭ জানুয়ারি। তখন দে, শীল কোম্পানি মিডলটন স্ট্রিটে দ্বারভাঙ্গার মহারাজার বাড়িটিকে বিজলি আলোয় উদ্ভাসিত করেছিল। সেদিন, খুব কম বাড়িই বিজলির কৃপালাভ করেছিল। এমনকি বড়লাটের বাড়িটিও নয়।[৭]

১৮৮৮-র ২৭ জানুয়ারি টাউন হলে 'মহমেডান লিটেরারি সোসাইটি'র বার্ষিক অধিবেশন ও প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছিল এই কোম্পানির তৈরি ঘোড়ার গাড়িতে সংযুক্ত করার উপযোগী একটি বিজলি বাতি, যা ব্যাটারি দিয়ে জ্বালানো যায়। খুব কম করে এর ষোল বছর পর কলকাতায় যখন

হাওয়াগাড়ি এল, তখনও কিন্তু তাদের অ্যাসিটিলিন গ্যাস পুড়িয়েই জ্বালতে হত আলো। এই প্রদর্শনীতে দে, শীলের ইলেকট্রিক মোটর চালিত সেলাইকল ও টেবিল ফ্যানও বেশ শোরগোল ফেলেছিল। স্বয়ং লর্ড ডাফরিন "had a conversation with the manufacturer and congratulated him on his ingenuity."[৮]

১৮৯০-এ এই কোম্পানির বিজ্ঞাপন থেকে বহনযোগ্য বৈদ্যুতিক আলোর সাজসরঞ্জামের ফিরিস্তি পাওয়া যায়[৯] :

Portable Electric Lights !

No. 1 set
Price Rs. 828 : One Serrin Patent self-regulating
focus keeping lamp of 1500 C.P.
with parabolic reflector.
100 quartz size Bunsen's Batteries,
in boxes, with sufficient chemicals
for charging three times.
1 dozen carbon pencils.
1 dozen brass connectors and terminals.
200 yds. of thick copper wire insulated.
Very suitable for illuminating roads, Durbar tents, processions of any kind, etc. etc. Every instruction will be given to buyers.

DEY, SIL & COMPANY
Electrician, Electro-metallurgist and
Brass Founders
No. 20, LAL BAZAAR STREET,
CALCUTTA.

এই বছরেরই ২৩ ফেব্রুয়ারি তারিখের 'স্টেটসম্যানে' প্রকাশিত খবর থেকে জানা যায় দে, শীল কোম্পানির অংশীদার টি· ডি· শীল 'ব্যালান্সড পাংখা' ও সেটি চালাবার জন্য স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র উদ্ভাবন করেছেন ও পেটেন্ট নিয়েছেন।[১০]

১৯১২ সালেও ৬, সাগর ধর লেনে এই কোম্পানির অস্তিত্বের কথা জানা যায়। সেটি তখন তার ম্যানেজিং প্রোপ্রাইটার কালিদাস শীলের বসতবাড়িতে উঠে এসেছে।[১১]

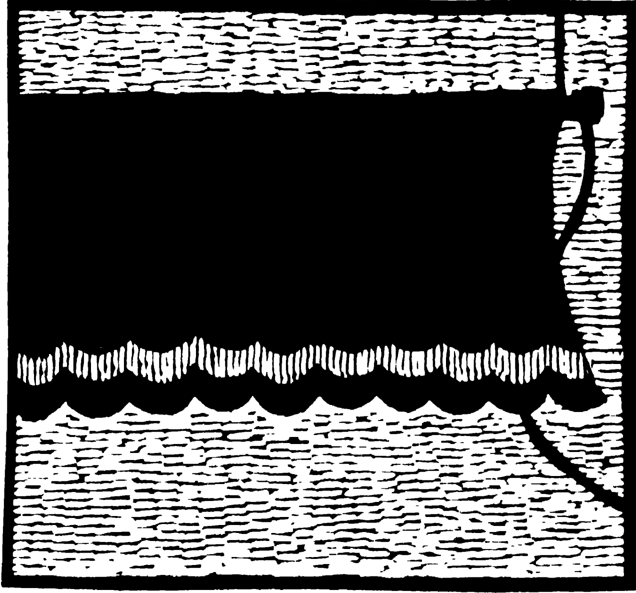
বিদ্যুৎ-সংক্রান্ত তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক গবেষণার ক্ষেত্রে জগদীশচন্দ্র বসুর অবদান কলকাতার গর্ব। বিনি-তারে মাইক্রোওয়েভ তরঙ্গের সাহায্যে দূর থেকে বিস্ফোরণ ঘটানোর বৃত্তান্ত অনেকেই জানেন। এখানে বিজলি যন্ত্রপাতির ব্যাপারে জনশিক্ষার জন্য তাঁর প্রয়াসের একটি উদাহরণ দিচ্ছি। ১৮৮৮-র ১৭ অগাস্ট বঙ্গমহিলা সমিতির নবম সাংবৎসরিক অধিবেশন বসে মোহিনীমোহন বসুর বাড়িতে। 'বামাবোধিনী পত্রিকা' লিখছে, সেদিন শতাধিক পতি পত্নী ও আত্মীয়গণের সামনে বৃহৎ সায়ং সমিতিতে "একটী গৃহ বৈদ্যুতিক আলোক দীপ্তি পাইতেছিল, অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র বসু বিদ্যুৎ বা তাড়িৎ শক্তি দ্বারা কাপড় সেলাই ও অন্যান্য কতকগুলি প্রক্রিয়া প্রদর্শন করেন। তাহার মধ্যে একটী

বড় আশ্চর্য্য। এক যন্ত্রের অপরদিকে হাত রাখিযা বিদ্যুতালোকে দেখিলে হাত দেখা যায় না, হাত বাতাসের মতো স্বচ্ছ হইয়া যায় এবং তাহার ভিতর দিয়া অপর দিকের বস্তু সকল দেখা যায়।"[১২]

ভাবতে অদৃশ্য আলোক বা এক্স-রে'র সাহায্যে প্রথম আলোকচিত্র সম্ভবত জগদীশচন্দ্রই প্রথম গ্রহণ করেন। জগদীশচন্দ্রের ভাগিনেয় প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ডি· এম· বসু লিখেছেন, খবরের কাগজে রন্টজেনের আবিষ্কারের কথা পড়ে জগদীশচন্দ্র বেরিয়াম প্ল্যাটিনোসায়ানাইড স্ক্রিন তৈরি করে বিভিন্ন বস্তুর এক্স-রে চিত্র তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন।[১৩]

কলকাতায় এক্স-রে যন্ত্র আসার আগেই জগদীশচন্দ্রের নির্দেশে তাঁর গবেষণাগারের সহকারী জগদিন্দু রায় তা তৈরি করেন। ১৩৪২-এর আষাঢ় সংখ্যা 'প্রবাসী'তে যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখছেন, "শ্রীরামপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত জগদিন্দু রায় অধ্যাপক বসুর ল্যাবরেটরি অ্যাসিস্টেন্ট ছিলেন। · ··একদিন জগদিন্দুবাবু বলিলেন, 'আমাদের কলেজে এক্স-রে বা অদৃশ্য আলোকযন্ত্র নির্মিত হইয়াছে। আজ বেলা ৩টার সময় সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর উহা দেখিতে আসিবেন···' তিনটার সময় একজন বন্ধুর সহিত প্রেসিডেন্সি কলেজে গিয়া জগদিন্দুবাবুর নিকট শুনিলাম যে, পার্শ্বের কক্ষে সত্যেন্দ্রবাবু ও ক্যাপ্টেন চ্যাটার্জি নামক তাঁহার এক আই· এম· এস· বন্ধু আসিয়াছেন। ····আমি ও আমার বন্ধু জগদিন্দুবাবুর সঙ্গে সেই কক্ষে গমন করিলে অধ্যাপক বসু, ডাক্তার চ্যাটার্জি ও সত্যেন্দ্রবাবু তিনজনেই বিশেষ আগ্রহ সহকারে আমার হাতের ভগ্ন অস্থি দেখিলেন। সত্যেন্দ্রবাবু ইংরেজীতে তাঁহার বন্ধুকে বলিলেন, কলিকাতায় এক্স-রে সাহায্যে ভগ্ন অস্থি দর্শন বোধহয় এই প্রথম। ····তখন কলিকাতায় আর কোথাও এক্স-রে যন্ত্র আসে নাই। প্রেসিডেন্সী কলেজের সেই যন্ত্র ডাক্তার বসুব নির্দেশ ক্রমে কলেজের গবেষণাগারে জগদিন্দুবাবু নির্মাণ কবিযাছিলেন।"

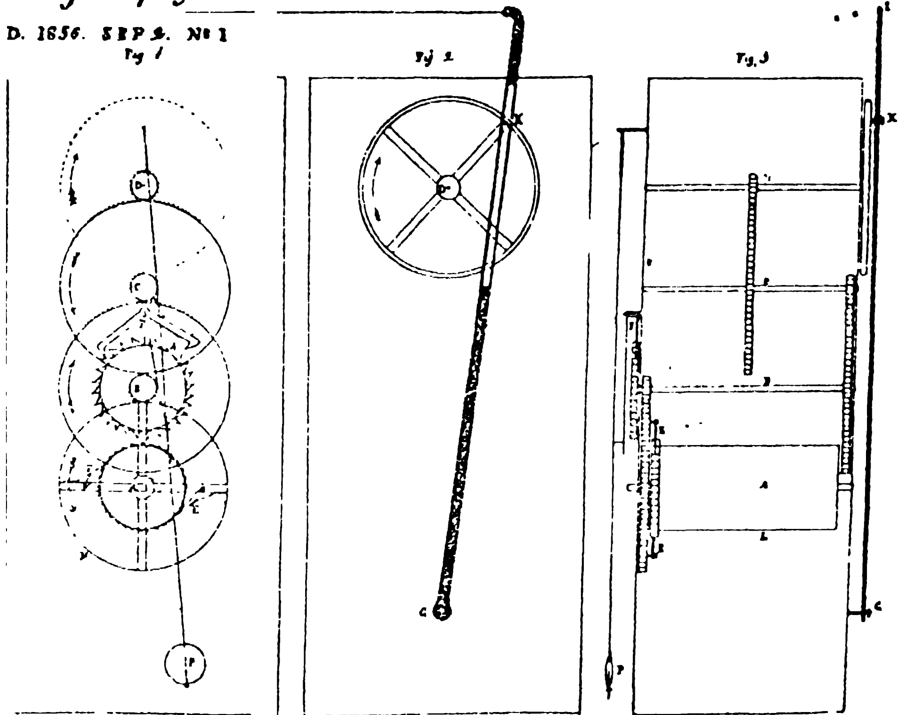
সব সত্ত্বেও কলকাতায় জগদীশচন্দ্রই প্রথম এক্স-রে চিত্র গ্রহণ করেছিলেন, এই দাবি বোধহয় সঙ্গত নয়। ২৭ জুন, ১৯০১ তারিখে লন্ডন থেকে লেখা চিঠিতে জগদীশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে জানাচ্ছেন, "আমি সম্প্রতি বিনা আলোকে ছবি তুলতে সমর্থ হইয়াছি।" কিন্তু এই ঘটনার প্রায় চার বছর আগে, ১৮৯৭-এ প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর ও অধ্যাপক ফাদার লাফোঁ ভারতের ভাইসরয় ও গভর্নর জেনারেল এলগিনের হাতের একটি এক্স-রে চিত্র গ্রহণ করেন। 'শ্যাডোগ্রাফ' অভিহিত ছবিটি ফোটোগ্রাফিক সোসাইটি অফ ইন্ডিয়ার বার্ষিক প্রদর্শনীতে ফোটো-মেকানিকাল প্রসেস বিভাগে স্বর্ণপদক লাভ করে। সোসাইটির জার্নালেও তার প্রতিচ্ছবি ছাপা হয়।[১৪]



# 'পাঙ্খা-পুলিং'-এর আজব কল থেকে সি· ই· এস· সি·

কলকাতায় ঘর্মাক্ত কলেবর সাহেবদের মধ্যে যাদেরই চণ্ডীদাসের খুড়োর মতো একটু আবিষ্কারের বাতিক ছিল সকলেই বোধহয় হাওয়া-খাওয়ার ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামিয়েছিলেন। পাঙ্খা-পুলারদের বাদ দিয়েও কি করে মাথার ওপরে ঝোলানো ঝালর দেওয়া পাঙ্খাটাকে দোলানো যায়—এরকম একটা যন্ত্র আবিষ্কারের দাবি জানিয়ে কলকাতার পেটেন্ট অফিসে ঝুড়ি-ঝুড়ি দরখাস্ত জমা পড়েছিল। পেটেন্টের জন্য প্রথম যে দরখাস্তটি জমা পড়েছিল সেটিও 'পাঙ্খা-পুলিং' মেশিনারি সংক্রান্ত। ১৮৫৬-র ২ সেপ্টেম্বর আলফ্রেড ডি-পেনিং এটি পেশ করেন।[১]

বাঙালি বাবুরাও কয়েকজন এই সমস্যা নিয়ে ভাবিত হয়েছিলেন। ঘড়ি-যন্ত্র ব্যবহার করে পাখা টানার ও ঘোরানোর একটি হিল্লে হয়েছে জানিয়ে রাধাকিশোর সিংহ ও যামিনীকান্ত রায় ১৯০৪-এ পেটেন্ট গ্রহণের জন্য দরখাস্ত করেন (সংখ্যা ৮৫)। আর· কে· সিনহা ১৯০৭-এ পেটেন্ট ফাইল করেন (সংখ্যা ৬৯) একটি হট-এয়ার ইঞ্জিন চালিত ফ্যানের জন্য।[২] (উদ্ভাবক সীতানাথ ঘোষের হট-এয়ার ইঞ্জিনের বিবরণের জন্য পরবর্তী অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। 'টানা পাখা টানিবার নূতন কল'-এর খবর দিয়েছিল ১৮৭০ সালে 'সুলভ সমাচার'। মাত্র দু'শো টাকা মূল্যে গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে একসঙ্গে সাত-আটটি পাখা-টানার যে কলটি বসানো হয়েছিল সেটি চালাবার জন্য নাকি কোনো খরচই পড়ত না, কারণ, "কলিকাতায় যে জলের কল হইয়াছে তাহার সঙ্গে যোগ করিয়া দিলে কল চলিতে

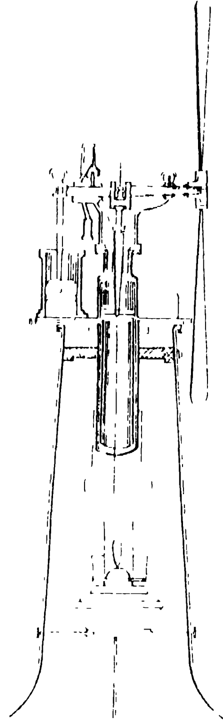



পাখা টানার কল : প্রথম পেটেন্ট-এর নকশা

থাকে।"[৩]

প্রায় কুড়ি বছর পরে 'ইন্ডো ইওরোপিয়ান করেসপন্ডেন্স' জল-চালিত এইরকম আর একটি পাখার কথা জানিয়েছিল। কলকাতারই এক ভদ্রলোক সেটি উদ্ভাবন করেন ও পেটেন্ট নেন। ২২ নম্বর মট লেনে সেটি তখন প্রদর্শিত হয়েছিল। একটি সিলিন্ডারে জল ঢুকিয়ে পিস্টনকে ওপরে তোলা ও ভেতরের জল বের করে দিয়ে পিস্টনকে নামানো, এই ওঠানামার সাহায্যে স্বয়ংক্রিয় পাখাটিকে দোলানো হতো। নিঃশব্দে অনায়াসে চলত পাখাটি এবং দু-তিন মিনিটের মধ্যে সেটাকে খুলে ফেলা বা নতুন করে খাটানোও সম্ভব ছিল।[৪]

টানা-পাখার প্রথম কার্যকর বিকল্প হট-এয়ার ইঞ্জিনের দৌলতে তৈরি হয়েছিল। ১৮৯০ সালে হিট্‌লি গ্রেশাম লিমিটেড এই নিয়ে গবেষণা শুরু করে। প্রায় আট বছর পরে তৈরি হয় তাদের পাখা। কেরোসিনকে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করে উত্তপ্ত বায়ুর প্রসারণজনিত ক্ষমতাকে যান্ত্রিক উপায়ে নিযুক্ত করা হয়েছিল পাখা দোলানোর কাজে। ১৮৯৮-এর সেপ্টেম্বর সংখ্যার 'ইন্ডিয়ান অ্যান্ড ইস্টার্ন



হট এয়ার ইঞ্জিন

ইঞ্জিনিয়ার' পত্রিকার বিবরণ থেকে জানা যায় যে, শেয়ালদার প্ল্যাটফর্মে এইরকম হিটলি-পাখা বসানো হয়েছিল। একটি ইঞ্জিনের সাহায্যে ৬ থেকে ৮টি টানা-পাখা দোলানোর ব্যবস্থা ছিল।[৫]

এর বছর দেড়-দুয়ের মধ্যে ইমামবাগ লেনে ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানির প্রথম জেনারেটিং স্টেশন থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহ শুরু হয়। মজার কথা হচ্ছে, আলো জ্বালা নয়, যন্ত্রের চাকা ঘোরাবার জন্য মোটরও নয়, ইলেকট্রিক কোম্পানির প্রথম ব্যবসায়িক সাফল্য এসেছিল ঘরে-ঘরে ইলেকট্রিক পাখা প্রবর্তনের সুবাদে। লোকে যাতে ইলেকট্রিক কানেকশন নেয় তার জন্য কোম্পানির তরফ থেকে মাসিক চার টাকা ভাড়ায় ইলেকট্রিক ফ্যান ভাড়া দেওয়া হত তখন।[৬]

রাস্তার আলোর ক্ষেত্রে বিস্ময়কর হলেও, গ্যাসকে গদিচ্যুত করার জন্য বহু বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে বিজলিকে। ১৯১৩ সালে গ্যাস বনাম বিজলি আলোর প্রতিযোগিতার একটি রিপোর্টের উল্লেখ করছি। এই অভিনব যুদ্ধের আসর বসেছিল বালিগঞ্জ স্টোর রোডে (গুরুসদয় দত্ত রোডে)। পরীক্ষার পর খরচ—খরচার তুলনামূলক বিচার করে বিচারকদের রায় দেওয়ার কথা ছিল যে, কলকাতার কিছু রাস্তায় বাড়তি আলোর ব্যবস্থা করার জন্য ইলেকট্রিক ব্যবহার করা হবে কিনা!

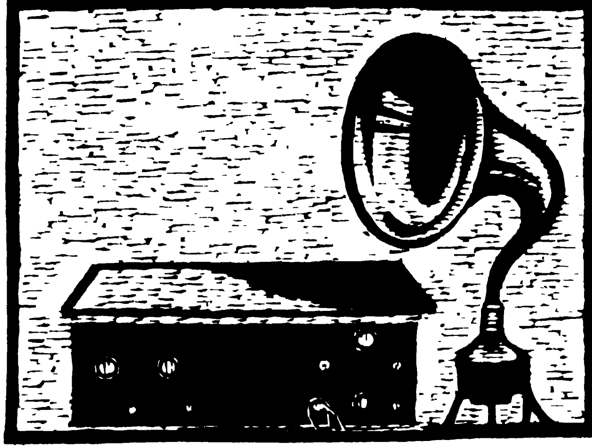
রিপোর্টে আরও জানা যায়, একটি গ্যাসের আলো যেখানে ৬০ মোমবাতি প্রমাণ আলো দেয়, বিজলি আলোর উজ্জ্বলতা মাত্র ৪৫ থেকে ৫০ ক্যান্ডেল পাওয়ার।[৭] ১৯৩৭ থেকে ১৯৪০—এর মধ্যে কলকাতার রাস্তায় গ্যাসের আলোর সংখ্যা সর্বাধিক ২৩,০০০-এ পৌঁছেছিল। ১৯৬০-এর দশকের শেষভাগে কলকাতার পথে দীর্ঘজীবী গ্যাসের শেষ আলোটির মৃত্যু ঘটে।

শেষ বিচারে অবশ্য ছোট বা মাঝারি আকারের কলকারখানায়, কি জলতোলা পাম্প বা মুদ্রণযন্ত্র ইত্যাদি চালাবার উপযোগী ইলেকট্রিক মোটরের ব্যাপক ব্যবহারের সূত্রেই ইলেকট্রিক কোম্পানির রমরমা। স্টিম ইঞ্জিন ও তার বয়লার ইত্যাদির বদলে অনেক ছোটখাটো চেহারার বিজলি মোটর ব্যবহারের সুযোগ-সুবিধে ছিল ঢের বেশি। বহু পুরনো বাংলা বই বা পত্রিকার আখ্যাপত্রে দেখা দেয় ছাপাখানাটিকে 'বাষ্পীয় যন্ত্রালয়' বা 'বাষ্পীয ছাপাখানা' নামে অভিহিত করা হচ্ছে। এ-সবই ইলেকট্রিক সরবরাহ শুরু হওয়ার আগের যুগের কথা। মেশিন প্রিন্টিং বলতেই তখন স্টিম ইঞ্জিন।

১৯০১ এর ১৩ জানুয়ারি 'স্টেটসম্যান' পত্রিকায় বিজলির নিত্য নতুন প্রয়োগের নানা খবর বেরিয়েছিল, তার মধ্যে সবচেয়ে অভিনব, গভর্নর্স হাউসে বসানো ইলেকট্রিক লিফ্ট। রেলওয়ে কারখানায় অবিলম্বে সেকেলে বেল্ট-পুলি ইত্যাদি ঝঞ্ঝাট বিদায় করে ইলেকট্রিক মোটর বসানোর আয়োজনের কথা, চায়ের গুদামঘরে চা তোলার কাজে, চা ভরার কাজে, ছাপাখানায় এবং সেলাই কল চালাবার জন্যও বিজলি মোটরের ব্যবহারের কথা উল্লেখ করার পর সাংবাদিক জানিয়েছিলেন যে, ক্যাথিড্রালের অর্গানটিও এরপর বিজলি শক্তিতে চলবে।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ময়দানব' গল্পের নায়ক এক দক্ষ গর্বিত বাষ্পীয় যন্ত্র-চালক। বিজলির আগমনে শুধু তার পেশাচ্যুত হওয়া নয়, তার অতি প্রিয় স্টিম ইঞ্জিন খারিজ হয়ে যাওয়ার মানসিক যন্ত্রণা ঘিরে গড়ে উঠেছে যুগ-সন্ধিক্ষণের কাহিনী।

মেট্রো রেলপথ চালু হওয়া ইস্তক কলকাতার অলঙ্কার। উপকারে যত না, তাকে ঘিরে হাঁকডাক শোরগোল অনেক বেশি। ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের এক বিস্ময় হিসেবেই তার বেশি আকর্ষণ। কিন্তু নির্মাণকৌশলের বিচারে এর চেয়ে অনেক জটিল ও শ্রমসাধ্য আর-একটি সুড়ঙ্গ ষাট বছর ধরে এই কলকাতাতেই আছে, যদিও সাধারণের চোখের আড়ালে। শুধু তাই নয়, এই সুড়ঙ্গটি বিস্তারিত হয়েছে হুগলী নদীর তলা দিয়ে। ১৯২৯ সালে ইলেকট্রিকের তার টানার জন্য সি ই এস সি এই সুড়ঙ্গ তৈরি করে। এর একপ্রান্তে রয়েছে কলকাতার সাদার্ন জেনারেটিং স্টেশন ও অন্য প্রান্তে শিবপুরের বোটানিক্যাল গার্ডেন। ৬ ফিট ব্যাসের প্রায় ৬০০ গজ লম্বা সুড়ঙ্গটি মাটির নব্বই ফিট নিচে চুড়ির মতো ঢালাই লোহার পরপর অসংখ্য রিং জুড়ে তৈরি। ঠিক কয়লাখনির গহ্বরে নামার মতোই একটা খাঁচায় চড়ে সুড়ঙ্গে নামতে বা উঠতে হয়। একটা ড্রামের গায়ে জড়ানো তার খাঁচাটিকে পরিচালিত করে।[৮] কোম্পানির যোগ্য কর্মীদের তদারকিতে এই সুড়ঙ্গ বহাল তবিয়তে রয়েছে।



# আকাশবাণীর কল ও শিশিরকুমার মিত্র

'ধরার আঙিনা হতে ঐ শোনো
উঠিল আকাশবাণী
অমরলোকের মহিমা দিল যে
মর্ত্যলোকেরে আনি ।'

রবীন্দ্রনাথের এই গান থেকেই নাকি অল ইন্ডিয়া রেডিও স্টেশনের নাম দেওয়া হয়েছিল 'আকাশবাণী' । কিন্তু 'রেডিও'-র বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে 'আকাশবাণী' প্রণয়নের কৃতিত্ব সুকুমার রায়ের । রবীন্দ্রনাথ এই গান রচনার অনেক আগেই 'সন্দেশ'-এ তিনি রেডিও সম্বন্ধে যে প্রবন্ধটি লেখেন তার নাম ছিল 'আকাশবাণীর কল' ।[১]

সুকুমারের প্রবন্ধটি প্রকাশের প্রায় পাঁচ বছর পরে কলকাতার বর্তমান রেডিও স্টেশনের জন্ম ১৯২৭-এর ২৬ আগস্ট । সেদিনের ইন্ডিয়ান ব্রডকাস্টিং কোম্পানি নামে একটি বেসরকারী সংস্থাই কালক্রমে 'আকাশবাণী'র রূপ নিয়েছে ।[২]

কিন্তু রেডিও স্টেশন স্থাপনের বহুকাল আগে বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুর হাতে কলকাতা তথা ভারতে বেতার বা বিনি তারের বার্তা প্রেরণ ও গ্রহণ নিয়ে গবেষণা শুরু । ১৮৯৫-এ আচার্য বসু প্রথম প্রেসিডেন্সি কলেজে সবার সামনে 'মাইক্রোওয়েভ' বিদ্যুৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ (২৫ মিমি থেকে ৫ মিমি) সৃষ্টি, প্রেরণ ও গ্রহণ-ব্যবস্থা প্রদর্শন করেন । প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের ঘর থেকে পাঠানো তরঙ্গটি একটি বন্ধ ঘরের দরজা ও দেওয়াল ভেদ করে ধরা পড়ল অধ্যাপক পেডলারের ঘরে রাখা গ্রাহক যন্ত্রে । এই বছরেই টাউন হলে জগদীশচন্দ্র বেতার তরঙ্গের সাহায্যে বাংলার লেফটেনেন্ট গভর্নরের বিপুল বপু ও

দুটি রুদ্ধ কক্ষ ভেদ করে পরবর্তী ঘরে একটি লোহার গোলা নিক্ষেপ করে ও পিস্তল ছুড়ে দর্শকদের স্তম্ভিত করে দেন ।[৩]

"হ্যালো, হ্যালো, দা স্টেটস্‌মান । ব্যারাকপুর রেসকোর্স থেকে বলছি....”—কলকাতার এই প্রথম বেতার-বার্তা । ১৯২২-এর ১২ মার্চ 'মার্কনি' ওয়ারলেস সেট-এর সাহায্যে যা পাঠানো হয়েছিল ।[৪]

'ইন্ডিয়ান স্টেটস অ্যান্ড ইস্টার্ন এজেন্সি' কলকাতা থেকে প্রথম বেতার অনুষ্ঠান প্রচার শুরু করে ১৯২৩-এ । তারপর কলকাতার হাইকোর্টের সামনে টেম্পল চেম্বার্সের উপর তলায় স্থাপিত একটি স্টুডিও থেকে 'রেডিও ক্লাব অফ বেঙ্গল' প্রতিদিন সন্ধ্যায় এক ঘণ্টা ইওরোপিয় ও এক ঘণ্টা ভারতীয় সঙ্গীত প্রচার শুরু করে । কানে হেডফোন লাগিয়ে শুনতে হতো সেই অনুষ্ঠান ।

১৯২৫ নাগাদ আর একটি ট্রান্সমিটার সান্ধ্যকালীন অনুষ্ঠান প্রচার শুরু করে 'ইউনিভার্সিটি কলেজ অফ সায়েন্স'-এর বেতার গবেষণাগার থেকে । এই গবেষণাগারের প্রতিষ্ঠাতা ডক্টর শিশিরকুমার মিত্রই নির্মাণ করেছিলেন ট্রান্সমিটার যন্ত্রটি । গবেষণারত ছাত্রদের স্বার্থেই পরীক্ষামূলকভাবে এই সম্প্রচারের ব্যবস্থা হয়েছিল । শিশিরকুমারের বেতার যন্ত্রের কল-সাইন ছিল 2 C Z । ১৯২৭ অবধি কলকাতায় এই দুটি ছাড়া আর ট্রান্সমিটার ছিল না ।[৫]

সাধারণ মানুষের জন্য শিশিরকুমার বাংলায় বেশ কিছু বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনা করেন । ১৯২৭-এ 'বিচিত্রা' পত্রিকার আষাঢ় ও শ্রাবণ সংখ্যায় পরপর প্রকাশিত হয়, 'বেতার-বার্তা' ও 'বেতার গ্রাহক-যন্ত্র' । সহজে, ঘরে বসে রেডিও তৈরির উপদেশ । প্রথম প্রবন্ধে, নিজের তৈরি বেতার-বার্তা প্রেরক যন্ত্র সম্বন্ধে তিনি লিখছেন, "এক বৎসর হইল কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজে একটি প্রেরক-যন্ত্র বসান হইয়াছে । সেখান হইতে সপ্তাহে পাঁচ দিন সঙ্গীত, বক্তৃতাদি প্রেরণ করা হয় । বারাণসী, বর্ম্মা, লক্ষ্ণৌ ইত্যাদি দূর জায়গা হইতে ভাল গ্রাহক-যন্ত্রের সাহায্যে উক্ত প্রেরিত বেতার-বার্তা নিয়মিত ভাবে শুনা যায় ।"

দ্বিতীয় প্রবন্ধটির সঙ্গে ছাপা হয়েছিল শিশিকুমারের তৈরি বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের আর-একটি যন্ত্রের ছবি । 'অ্যাটমস্‌ফেরিক বা নৈসর্গিক বৈদ্যুতিক উৎপাত ধরিবার যন্ত্র' ।

'স্পেক্‌ট্রোস্কোপি' তে ডক্টরেট খেতাবধারী শিশিরকুমারের উদ্যোগে ও একক প্রচেষ্টাতেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোস্ট গ্র্যাজুয়েট স্তরে ১৯২৫-এ 'বেতার' (বর্তমানে 'রেডিও-ইলেকট্রনিক্স) বিষয়ে পাঠক্রম ও গবেষণা প্রবর্তিত হয় । ফ্রান্সে প্রফেসর গাটন-এর গবেষণাগারে রেডিও-ভালভ্‌ নিয়ে গবেষণা করার সময়েই শিশিরকুমার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে এই নতুন পাঠ প্রবর্তনের ইচ্ছার কথা জানিয়েছিলেন এবং সমর্থনও লাভ করেন । কলকাতার 'ইলেকট্রনিক্স' গবেষণার পথিকৃৎ শিশিরকুমার এম· এস· সি· (পদার্থবিদ্যা) কোর্সে শুধু 'বেতার' বিষয়ে একটি 'পেপার' চালু করেই নিরস্ত হননি । সায়েন্স কলেজের গবেষণাগারে মাইক্রোফোন, লাউডস্পিকার, রেডিও ভাল্‌ভ, ডায়োড ও ট্রায়োড ইত্যাদি তৈরি শুরু হয় তাঁর নির্দেশে । স্বাধীনতা লাভের পরে 'ভারত ইলেকট্রনিক্সে'র হাতে এই কারিগরি প্রকৌশল তুলে দেওয়া হয় । কিন্তু তা সত্ত্বেও কেন ইলেকট্রনিক্স যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ নির্মাণের ক্ষেত্রে আজও আমাদের পর-নির্ভরতা ঘোচেনি, সেটি অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ নিয়ে চিন্তিত গবেষকদের আলোচনা-ক্ষেত্র । উৎপাদনকারী ভারতীয় সংস্থা কেন, কার নির্দেশ বা কাদের স্বার্থরক্ষার জন্য স্বনির্ভর কোনো

পরিকল্পনা গ্রহণ করল না—এইসব প্রশ্নের উত্তর সন্ধানের চেষ্টা করলে, কারিগরি ক্ষেত্রে ভারতের পিছিয়ে পড়ার ছবিটিতে মানুষের তৈরি দুর্ভিক্ষেরই ছায়া পড়বে, প্রকৃতির অভিশাপের নয়।[৬]

'উচ্চ বায়ুমণ্ডল' নিয়ে শিশিরকুমারের গবেষণা গ্রন্থ ১৯৪৯-এ এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে প্রকাশিত হয়। ১৯৫২-য় প্রকাশিত হয় তার দ্বিতীয় সংস্করণ এবং রুশ ভাষাতেও সেটি অনূদিত হয়। গ্রন্থটি স্বীয় ক্ষেত্রে প্রায় 'বাইবেল'-এর মর্যাদা লাভ করেছিল। বায়ুমণ্ডল-সংক্রান্ত গবেষণার জন্য শিশিরকুমার নির্মিত 'সেমি-অটোমেটিক আয়োনোস্ফেরিক রেকর্ডার' যন্ত্রটিকে এখন বিড়লা শিল্প ও কারিগরি ও সংগ্রহালয়ের প্রদর্শনী কক্ষে দেখতে পাওয়া যায়।

চারের দশকে শিশিরকুমার, মেঘনাদ সাহা ও এস. এস. ভাটনগরের উদ্যোগে বোর্ড অফ সায়েন্টিফিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চের (বর্তমানে সি. এস. আই. আর.) অধীনে গঠিত হয় 'রেডিও রিসার্চ কমিটি'। ভারতে রেডিও-ইলেকট্রনিক্সের কারিগরি বিকাশের ক্ষেত্রে এই কমিটির ভূমিকা ছিল অতুলনীয়। অদূর ভবিষ্যতে ইলেকট্রনিক্স-এর বিপুল সম্ভাবনার কথা অনুধাবন করে দূরদর্শী শিশিরকুমার, মেঘনাদ সাহার সক্রিয় সমর্থনে ১৯৪৯-এ একটি নতুন পোস্ট গ্র্যাজুয়েট বিভাগ সৃষ্টি করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। রেডিও ফিজিক্স ও ইলেকট্রনিক্স-এর এই বিভাগটি এশিয়া মহাদেশের মধ্যে প্রথম এই জাতীয় প্রয়াস। ১৯৪৯-তে 'সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড স্টাডিজ ইন রেডিও ফিজিক্স অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স' নামে বিভাগটির নতুন নামকরণ হয় এবং শিশিরকুমার বৃত হন তার অধ্যক্ষ রূপে।[৭]

শিশিরকুমারের পরে ইলেকট্রনিক্স যন্ত্র নির্মাতা হিসেবে কলকাতার আর-এক গর্ব বামাদাস চট্টোপাধ্যায়। তিনিও ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের ছাত্র। হয়তো শিশিরকুমারেরই ছাত্র। ১৯৩৩ নাগাদ সবাক চিত্র প্রদর্শনের প্রজেক্টরের সঙ্গে ব্যবহারের জন্য তিনি শব্দযন্ত্র তৈরি করেছিলেন। 'রূপবাণী' সিনেমা জন্মলগ্ন থেকেই বামাদাসের এই 'সিস্টোফোন' যন্ত্র ব্যবহার করেছে। এখানে যে বিজ্ঞাপনটি তুলে দেওয়া হচ্ছে তার থেকেই সিস্টোফোন যন্ত্রের চরিত্র, বৈশিষ্ট ও সমাদরের কথা জানা যায়[৮]:

চিত্র প্রদর্শকগণ :

আপনারা আপনাদের চিত্রগৃহের শব্দযন্ত্রের জন্য অযথা

অধিক ব্যয় করেন কেন ?

ভারতে প্রস্তুত

সিষ্টোফোন

Sound-on Film Equipment

আধুনিক সমস্ত বৈদ্যুতিক-যন্ত্রে গঠিত ভারতে

প্রস্তুত

**CYSTOPHONE**

ব্যবহার করুন

ছ'মাসের মধ্যে দশ জায়গায় 'সিষ্টোফোন' বসানোই এর

সাফল্য প্রমাণ করে। প্রস্তুতকারী কর্তৃক বিশিষ্ট ব্যক্তির দ্বারা

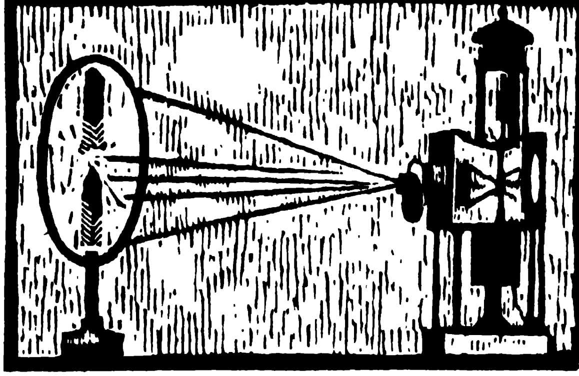
সর্ব্বত্র পরিদর্শন করা হয়।
বিশেষ বিবরণের জন্য অনুসন্ধান করুন
সরকার দত্ত এণ্ড কোং
ষ্টিফেন হউস, ৫, ড্যালহাউসী স্কোয়ার,
কলিকাতা।

পরবর্তীকালে 'সিস্টোফোন ল্যাবরেটরি লিমিটেড' নামে প্রতিষ্ঠান থেকেই বামাদাসের যন্ত্রটি বিক্রি হতো। ১৯৩৫-এ ইন্ডিয়ান সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশনের দ্বাবিংশতি অধিবেশনের সময়ে প্রকাশিত স্মারক-গ্রন্থ 'ক্যালকাটা অ্যান্ড সাবার্বস-এ পাতা-জোড়া বিজ্ঞাপন ছিল এই কোম্পানির :

"TALKIES"
For Labarotories & Colleges
Protected by various patents
An apparatus for practical demonstration of "TALKIES" in Halls & Labarotories.
A compact set, all complete on a strong bed plate, as illustrated, consists of a Cystophone Sound Head, 25 Watts Amplifier, Loudspeaker, Two spools to hold 1000 ft. standard Talkie Film and Motor, running direct from A.C. mains.
VISIT our stall at the Science Congress Exhibition & Cinemas where installed.
UNIQE in India, regarding the manufacture on a commercial basis of highly scientific, Electro-Optical Conversion Apparatus.
CINEMA models of Talkie apparatus are working all over India.
PUBLIC address equipment, installed at SENATE HALL and other places, are renownd for their natural tone.
"CYSTOPHONE"—the trade name guarantees all our products.
MANUFACTURERS
CYSTOPHONE LARARATORY LTD.
115/A AMHERST STREET, CALCUTTA.

উল্লেখযোগ্য, স্মারক-গ্রন্থটি ৯২ আপার সার্কুলার রোডের ইউনিভার্সিটি কলেজ অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি থেকে প্রোফেসর শিশিরকুমার মিত্র ও বি· এম· সেন কর্তৃক প্রকাশিত হয়।

১৩৩৪-এ 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় বামাদাস চট্টোপাধ্যায় 'বেতার টেলিগ্রাফ' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। প্রায় সমকালেই 'বিচিত্রা'য় শিশিরকুমারের প্রবন্ধ দুটিও প্রকাশিত হয়েছিল।[৯]



# ছবি ছাপার কল-কৌশল ও উপেন্দ্রকিশোর

আরমানি বাজারের দক্ষিণে প্রথম বাড়ি, যে-বাড়িতে একটি নিমগাছ আছে, সেখানে 'ডগলেশ সাহেব' আশ্চর্য এক যন্ত্র দিয়ে "ছায়া আকর্ষণ করিয়া ঠিক প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করিতেছেন।" ১৮৪৪-এর 'সম্বাদ ভাস্কর'-এ প্রকাশিত বিজ্ঞাপন থেকে এই খবর জানা যায়। বাংলা পত্রিকায় কলকাতায় ফোটোগ্রাফির আগমনের প্রথম সমাচার। ছোট আকারের ছবি তুলতে কড়কড়ে বারটা টাকা ও বড় ছবির জন্য সেকালে পঞ্চাশ টাকা দিতে ক'জন উৎসাহী হয়েছিলেন বা ক'জনের সে-সামর্থ্য ছিল, অনুমান করা যেতে পারে। বিজ্ঞাপন থেকে আরও জানা যায়, পর্দানশিনদের ছবি তোলার জন্য সাহেবকে বাড়িতে ডেকে আনলে আট টাকা বেশি দিতে হতো। তবে সাহেব আশ্বস্ত করতে ভোলেননি যে, "স্ত্রীলোকদিগকে সাহেবের সাক্ষাতে আসিতে হইবেক না, সাহেব অন্তরে থাকিয়া ছবি করিয়া দিবেন।"[১]

ফোটোগ্রাফার ডগলাশের সাফল্যের কথা বিশেষ জানা যায় না, কিন্তু বাংলা কাগজে ফোটোগ্রাফি বিষয়ে দ্বিতীয় বিজ্ঞাপনদাতা নিউল্যান্ড ছিলেন কলকাতার প্রথম ডাকসাইটে আলোকচিত্রী।

> বিজ্ঞাপন।
> প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ কর্ত্তা।
> জে· ডবলিউ· নিউলেন্ড সাহেব
> তাঁহার কৃত অনেক ব্যক্তির উত্তম ও ঠিক ছায়ায় নির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি তাঁহার জাগার লেডিন বিল্‌ডিঙের [Loudon Building] ৬ নং ভবনে দর্শনার্থ কলিকাতাস্থ বাবুদিগকে নিমন্ত্রণ করিতেছেন; এবং জানাইতেছেন যে, যে কেহ অল্পক্ষণ তথায় বসিলেই তাঁহার অবয়ব প্রতিমূর্ত্তি ঐরূপে করিয়া দিতে পারেন। প্রত্যেক প্রতিমূর্ত্তির মূল্য মায় মায়ার্কিন চামড়ার সুদৃশ্য কেশ ১২ টাকা লয়েন।"

১৮৫০-এর ১৬ এপ্রিল 'সংবাদপূর্ণচন্দ্রোদয়'-এ প্রকাশিত এই বিজ্ঞাপনের পরের অংশে ছিল, 'সিন্দুরিয়াপটীস্থ শ্রীযুত বাবু লালমোহন মল্লিকের বাটীতে' পরের দিন 'অক্সি-হাইড্রোজেন যন্ত্র দ্বারা হিরকের ন্যায় প্রবল আলোক-সন্দর্শনের কথা।' আট আনা করে টিকিট। নিউল্যান্ড এই আলো দিয়ে কি কি ছবি দেখাবেন, তাঁর স্লাইড শোয়ের ছবির তালিকাও পেশ করেছিলেন।

কলকাতায় এই প্রথম স্লাইড-শো। অবশ্য, ছবি তোলার কল প্রথম কলকাতায় পৌঁছেছে ১৮৪০-এ। কিন্তু তার চল শুরু হতে বছর দশেক লেগেছিল। 'চেহারা উঠাইবার' বা ছবি তোলার কল ব্যবহারে বাঙালিদের কৃতিত্বের কথা এই প্রবন্ধের আওতার মধ্যে পড়ে না।[২] আদৎ ক্যামেরা নিয়ে যিনি মৌলিক গবেষণা করেছেন, একজন বাঙালিই করেছেন আজ অবধি, তাঁর কথাই সংক্ষেপে বলছি।

ফোটোগ্রাফি বা পেইন্টিঙের প্রতিচ্ছবি সুলভে বইয়ের পাতায় ছাপার প্রথম ব্যবস্থা হলো উনিশ শতকের শেষের দিকে, হাফটোন ব্লকের প্রচলনের পর। হাফটোন ব্লক তৈরি করার জন্য এক বিশেষ ধরনের ক্যামেরা ব্যবহার করতে হয়, যা প্রসেস ক্যামেরা নামে পরিচিত। মুদ্রণ বিশারদ উপেন্দ্রকিশোর রায়ের কারিগরি গবেষণা এই প্রসেস ক্যামেরা-সংক্রান্ত। প্রসেস ক্যামেরা ব্যবহারের পদ্ধতির মধ্যে গাণিতিক নির্ভুলতা আনা ও এই ক্যামেরাকে অভিনব ভাবে ব্যবহার করার বহু উপায় তিনি বাতলেছিলেন। সেকালের মুদ্রণজগতের লোকের কাছে 'পেনরোজ' পত্রিকাটি ছিল বাইবেলের মতো।এই পত্রিকায় ১৮৯৭ থেকে ১৮১২-র মধ্যে উপেন্দ্রকিশোরের ন'টি গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে তাঁর পুত্র সুকুমারের দু'টি হাফটোন সংক্রান্ত গবেষণাপত্রও এই 'পেনরোজ' পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। পিতা-পুত্রের এই গৌরবে আজ অবধি দ্বিতীয় কোনো বাঙালি ভাগ বসাতে পারেনি।[৩]

বিলেত থেকে বইপত্র ও যন্ত্রপাতি আনিয়ে উপেন্দ্রকিশোর হাফটোন ব্লক তৈরির বিদ্যা নিজেই অল্পদিনের মধ্যে আয়ত্ত করেন। ১৮৯৫-এ স্থাপিত হয় তাঁর প্রতিষ্ঠান 'ইউ রায়', কালক্রমে যা 'ইউ-রায় অ্যান্ড সন্স' নাম নিয়েছিল।

১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত একটি বিজ্ঞাপন সাক্ষী, উপেন্দ্রকিশোর ব্লক তৈরি করার সঙ্গে-সঙ্গেই গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। বিজ্ঞাপিত হয়েছিল যে, তিনি ৭৫, ৮৫, ১২০, ১৩৩, ১৭০, ২৪০, এমনকি ইঞ্চি পিছু ২৬৬ লাইন বা বিন্দু-বিশিষ্ট হাফটোন ব্লক তৈরি করতে পারেন।[৪]

আজও যদি আমরা ইঞ্চি পিছু ১৩ ৩ লাইনের চেয়ে সূক্ষ্ম (অর্থাৎ ১৭০ বা তারও বেশি) হাফটোন ব্লক তৈরি করার চেষ্টা করি, কলকাতায় হয়তো গুটি তিনেক প্রতিষ্ঠান সে-সুযোগ দিতে পারে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই শুনতে হবে, অত সূক্ষ্ম ব্লক ছাপার উপযোগী কাগজ কোথায়! সেরকম কাগজ পাওয়া গেলেও কিন্তু তাঁরা অক্ষম, কারণ এ-কাজে যে গ্লাস স্ক্রিন দরকার, তা তাঁদের নেই। আমার অনুসন্ধান থেকে যতদূর জানি কলকাতায় ইঞ্চি পিছু ১৭৫ লাইনের বেশি সূক্ষ্ম কোনো গ্লাস স্ক্রিন কারও কাছেই নেই। উপেন্দ্রকিশোরের উপরোক্ত বিজ্ঞাপন পড়লে প্রসেস-শিল্পে নিযুক্ত কর্মীরা আরেকটি মন্তব্য করবেন, ১৭০, ২৪০, বা ২৬৬ লাইনের স্ক্রিন হয় এমন কথা কেউ কোনোদিন শোনেনি। হয়তো তাঁরা এ-সন্দেহও ব্যক্ত করতে পারেন, সত্যিই যে উপেন্দ্রকিশোর এসব স্ক্রিন দিয়ে কোনো ব্লক তৈরি করেছিলেন তার কি কোনো মুদ্রিত প্রমাণ পাওয়া গেছে? না, তা যায়নি এবং তার চেয়েও বড় কথা, সত্যিই কিন্তু ১৭০, ২৪০ বা ২৬৬ লাইনের স্ক্রিন কোনোদিনই তৈরি হয়নি এবং যা

তৈরি হয়নি তা নিশ্চয় উপেন্দ্রকিশোরের কাছেও ছিল না।

তাহলে উপেন্দ্রকিশোরের এই বিজ্ঞাপনের অর্থ কি ? একটু খেয়াল করলেই দেখা যাবে ৮৫, ১২০, ও ১৩৩—এই তিনটি সংখ্যার প্রত্যেকটিকে যদি দুই দিয়ে গুণ করা হয় তাহলে যথাক্রমে গুণফলগুলি দাঁড়ায়—১৭০, ২৪০, ও ২৬৬। এইখানেই লুকিয়ে আছে আসল রহস্য। উপেন্দ্রকিশোর ৮৫, ১২০, ও ১৩৩ লাইনের গ্লাস স্ক্রিনের সাহায্যেই বিশেষ কৌশলে স্ক্রিন লাইনের দ্বিগুণ সূক্ষ্মতা আনতে পেরেছিলেন হাফটোন ছবিতে। ৮৫ লাইনের স্ক্রিন ব্যবহার করে প্রস্তুত হাফটোন ছবিতে সাধারণত ইঞ্চি পিছু ৮৫টি ডট (বা বিন্দু) দেখা যায়, কিন্তু উপেন্দ্রকিশোর এই স্ক্রিনের সাহায্যেই সৃষ্টি করতে পারতেন ইঞ্চি পিছু ১৭০টি ডট। এ-বিষয়ে তাঁর প্রবন্ধ 'হাউ মেনি ডটস' প্রকাশিত হয় 'পেনরোজ অ্যানুয়েল'-এ (১৯০১)। অর্থাৎ প্রবন্ধ প্রকাশের অন্তত চার-পাঁচ বছর আগেই তিনি হাতে-কলমে এ-বিষয়ে সাফল্য অর্জন করেছিলেন। শুধু স্ক্রিন লাইনের দ্বিগুণ নয়, চারগুণ ডট-বিশিষ্ট ছবিও তিনি তৈরি করতে পারতেন।

সাধারণ ক্যামেরার সঙ্গে প্রসেস ক্যামেরার মূল পার্থক্য একটি কাচের স্ক্রিন-ঘটিত। সূক্ষ্ম জাফরি কাটা এই স্ক্রিনের দৌলতেই মূল চিত্রটি নেগেটিভে বিন্দুর সমাহারে পরিণত হয়। আলোক-সংবেদী প্লেট বা ফিল্মের থেকে ঠিক কতটা দূরে এই স্ক্রিন স্থাপন করতে হবে, সেই হিসেবটা অত্যন্ত জরুরি। কিন্তু সেকালের ব্লক-নির্মাতারা কিছুটা অন্ধের মতোই অভিজ্ঞতা-সর্বস্ব আচরণের পক্ষপাতি ছিলেন। উপেন্দ্রকিশোর পেনরোজের জন্য বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ রচনা করেন এই 'রুল অফ দা থাম্ব' বা হাতড়ে বেড়ানো পদ্ধতির অবসান ঘটানোর ইচ্ছায়—'দা হাফটোন ডট' (১৮৯৮), 'দা হাফটোন থিওরি গ্র্যাফিকালি এক্সপ্লেন্ড' (১৮৯৯) ও 'মোর অ্যাবাউট হাফটোন থিওরি' (১৯০৩-০৪)। ব্যবহারিক কর্মের মধ্য দিয়েই অনেক কিছু আবিষ্কৃত ও উদ্ভাবিত হয় সত্য, কিন্তু তারপর এমন একটা সময় আসে যখন প্রয়োগকর্মের অন্তর্নিহিত তত্ত্বটিকে অনুধাবন করতে না পারলে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয় না।

যান্ত্রিক উপায়ে স্ক্রিন দূরত্ব নির্ধারণের জন্য তিনি একটি যন্ত্রও উদ্ভাবন করেন। নাম 'স্ক্রিন অ্যাডজাস্টমেন্ট ইন্ডিকেটর'। তাঁর হয়ে পেনরোজ কোম্পানি এটির পেটেন্ট নেয় এবং নিজেদের প্রসেস ক্যামেরার অতিরিক্ত যন্ত্রাংশ। (অ্যাটাচমেন্ট) হিসেবে তারা এটি বিক্রি করত।

এই যন্ত্রটি আবিষ্কারের ফলে সচেয়ে বড় লাভ হল, সাধারণ ফোটোগ্রাফি ও হাফটোন ফোটোগ্রাফির ব্যবধানটি এল কমে। উপেন্দ্রকিশোর লিখেছিলেন :

> Anyone with a good knowledge of photography can now make a negative with the help of a Screen Adjustment Indicator. Thus, while in the one hand the cost of negatives will be reduced owing to decreased demand on the operator's skill, the average quality of work, on the other hand, will be improved, owing to the element of uncertainty being eliminated from the most vital portion of the work. Amateurs may henceforth be expected to take more kindly to half-tone photography.

সেকালে J. Verfasser প্রণীত 'দা হাফটোন প্রসেস' নামে বইটি ছিল সবচেয়ে চালু

পাঠ্যপুস্তকের মতো। গ্রন্থটির চতুর্থ সংস্করণে (১৯০৭) উপেন্দ্রকিশোরের 'স্ক্রিন অ্যাডজাস্টমেন্ট ইন্ডিকেটর'-সংযুক্ত প্রসেস ক্যামেরার একটি ফোটোগ্রাফের প্রতিচ্ছবি ছাপা হয়। সঙ্গে ছিল উপেন্দ্রকিশোরের কারিগরি কল্পনার মুক্তকণ্ঠ স্বীকৃতি :

Attempts have been made to devise automatic methods of adjusting the screen or of indicating its correct position, proportionately to the extension of the camera. Whilst such an apparatus is quite a possibility, and has been patented in two or three forms, there is not at the time of writing any apparatus on the market for the purpose, the fear being probably that the apparatus would prove too complicated to be useful. A most promising idea of this kind is an appratus invented by Mr. Ray, of Calcutta, which seeks only to indicate the correct position of the screen, so that the operator may set it himself without having to think about the matter. This apparatus consists of a pair of rods of equal length, looking very much like half of a pantograph parallelogram. One of the free ends of these two rods is attached to a point opposite to the diaphragm of the lens. A point placed on the rear rod then indicates increase or dimunition of the screen distance proportionate to the extension or closing up of the camera. Such an arrangement implies, of course, the use of a constant size diaphragm or screen, but provision is made in Mr. Ray's invention for correcting the indication according to any alteration of these heads.

১৯০১-এর পেনরোজ-এ উপেন্দ্রকিশোরের পূর্বোক্ত প্রবন্ধটিতে এই যন্ত্রের কার্যকরতার প্রমাণ দাখিল করতে উপেন্দ্রকিশোর-কৃত ব্লকের চারটি নমুনা ছাপা হয়েছিল। উপেন্দ্রকিশোর জানিয়েছিলেন, এগুলি একবার মাত্র এচ্ করা ব্লক থেকে ছাপা। অর্থাৎ ফাইন এচিঙের কেরামতি এখানে একেবারেই অনুপস্থিত। ইল্‌ফোর্ড প্রসেস প্লেটে ছবিগুলি তোলা হয়েছিল। উপেন্দ্রকিশোর লিখেছিলেন, প্রবন্ধটি রচনাকালে তাঁর প্রতিষ্ঠানে আগের মতো মাইক্রোস্কোপ ব্যবহারের পাট উঠে গেছে, তার আর প্রয়োজনও পড়ে না 'স্ক্রিন ইন্ডিকেটর'-এর দৌলতে।

খুব ছোট ছিদ্রের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় আলো তার সরলরেখা চরিত্র থেকে বিচ্যুত হয়, অর্থাৎ কিঞ্চিৎ বেঁকে যায়। এই ঘটনাটিই 'ডিফ্র্যাক্শান' নামে পরিচিত। উপেন্দ্রকিশোরের আগে হাফটোন ছবির তত্ত্ব নিয়ে যত আলোচনা সবই ছিল পিনহোল সংক্রান্ত (অর্থাৎ আলোর সরল-রৈখিক বিস্তার সংক্রান্ত)। অথচ সকলেই জানতেন হাফটোন নেগেটিভের উপর ডিফ্র্যাক্শানজনিত প্রভাব পড়েই। কিন্তু এ-বিষয়ে স্বল্প জ্ঞানের জন্য বড় আকারের ছিদ্রযুক্ত ডায়াফ্রাম ব্যবহার করে ডিফ্র্যাক্শান ঘটিত অনাচারের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যই সকলে ব্যস্ত ছিলেন। এই বক্তব্যের সমর্থনে ভেরফাসার এর লেখা থেকে উদ্ধৃত করছি :

Diffraction is known to have considerable action, but its phenomenon are difficult to explain and it hardly seems profitable to go into these bypaths of scientific speculation, if the principle of the pinhole

idea is sufficient to serve our purpose as a working principle

উপেন্দ্রকিশোর ব্যাপারটি এড়িয়ে যেতে চাননি। 'দা থিওরি অফ হাফটোন ডট্'-এ (১৮৯৮) তিনি লিখেছেন, ডিফ্র্যাক্শানের দরুন একের পরে এক সাদা, কালো, সাদাকালো কিছু 'ব্যান্ড' সৃষ্টি হয় যার সাহায্যে নেগেটিভের সবচেয়ে সূক্ষ্ম ডট্গুলিকে আরও পাকাপোক্ত করা সম্ভব। একই সঙ্গে তিনি সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, "ডিফ্র্যাক্শানের সাহায্য নিয়ে ইচ্ছামতো ভালো নেগেটিভ তৈরি করা খুবই শক্ত, কারণ ব্যাণ্ডগুলির উপর সর্বদা কর্মীদের নিয়ন্ত্রণ থাকে না এবং সেগুলি ভুল স্থানে গঠিত হলে এমন নকশা সৃষ্টি হয় যা হাফটোন নেগেটিভের চেয়ে কার্পেটেই বেশি মানায়।"

এ-সম্বন্ধে তাঁর বিস্তারিত আলোচনা 'ডিফ্র্যাক্শান ইন হাফটোন' প্রকাশিত হল ১৯০২-০৩ এর 'পেনরোজ'-এ। উপেন্দ্রকিশোর শুধু ব্যাখ্যা পেশ করেই নিরস্ত হননি, ডিফ্র্যাক্শানকে কাজে লাগানোর জন্য তৈরি করলেন একাধিক ক্ষুদ্র ছিদ্র বিশিষ্ট ডায়াফ্রাম, নাম দিলেন, 'ডিফ্র্যাক্শান মাল্টিপ্‌ল স্টপ'।

ডিফ্র্যাক্শান স্টপ ব্যবহার করার প্রধান সুবিধে হচ্ছে ভাল গ্রেডেশান লাভ ও মূল চিত্রের ছায়াময় অংশের প্রতিচ্ছবি গ্রহণে সাফল্য। তাছাড়া ডিফ্র্যাক্শানকে কাজে লাগিয়ে সাধারণ হাফটোন ডট্কে ভেঙে ক্ষুদ্রতর ডটে পরিণত করা সম্ভব যা আর অন্য কোনো উপায়েই সম্ভব নয়। এই ডিফ্র্যাক্শান স্টপ ব্যবহার করেই ইপেন্দ্রকিশোর ইঞ্চি-পিছু স্ক্রিনের লাইন-সংখ্যার দ্বিগুণ বা চতুর্গুণ ডট পেতেন হাফটোন ছবিতে। এই ব্যাপারটার উল্লেখ আগেই করা হয়েছে ১৮৯৮-এ প্রকাশিত তাঁর একটি বিজ্ঞাপন আলোচনা প্রসঙ্গে। 'হাউ মেনি ডটস' নামে এক পাতার একটি রচনায় ('পেনরোজ অ্যানুয়াল' ১৯০১) তিনি তৎকালীন একটি ভ্রান্ত ধারণার বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করে জানিয়েছিলেন, ডাব্‌ল অ্যাপারচার ব্যবহার করলেই ছবিতে স্ক্রিন লাইন সংখ্যার দ্বিগুণ সংখ্যক ডট্ পাওয়া যায় না। পাওয়া যায় স্ক্রিনের লাইন সংখ্যার ১$\frac{১}{২}$ বা মোটামুটি ভাবে ১১/৭ গুণ ডট। অর্থাৎ ১১০ লাইন স্ক্রিনের ক্ষেত্রে ১৭০টি ডট। কিন্তু উপেন্দ্রকিশোর ডিফ্র্যাক্শান স্টপের সাহায্যে ১১০ লাইন স্ক্রিন দিয়ে ২২০টি ডট-বিশিষ্ট ছবির ব্লক ছেপেছিলেন আলোচ্য রচনার সঙ্গে ('দা উইচ অফ ঘুম্')।

ফোর-লাইন স্ক্রিন মূলত ডিফ্র্যাক্শানের কাজের উপযোগী স্ক্রিন। ডিফ্র্যাক্শান-সংক্রান্ত আলোচনার সময়েই উপেন্দ্রকিশোর, স্ক্রিন প্রস্তুতকারী লেভি এই স্ক্রিন আর তৈরি করবেন না—এই সংবাদে দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন :

The four-line screen is essentially a diffraction screen and gives excellent results with diffraction stops. It does not command such a variety of dot effects as the cross-line screen. But this defect is more than made up for by its excellence in other directions....It is a great pity that the manufacture of such a beautiful screen is going to be discontinued as announced by Mr. Levy in the last Year Book. The introduction of this screen was a step distinctly forward and ought to have marked a new era in halftone work.

ডিফ্র্যাক্শান-বিষয়ক প্রবন্ধটির স্বভাবসিদ্ধ পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে উপেন্দ্রকিশোর বলেছিলেন, সঠিক ব্যবহার না জানলে হাজারো সম্পদ থাকলেও আমাদের অবস্থা দাঁড়ায় সেই প্রহরীর মতো, 'যার

এক হাতে আছে তরোয়াল আর অন্য হাতে ঢাল, তাই চোরটা যখন ছুটে পালাল প্রহরী তাকে পাকড়ে ধরতে পারল না।'

সাধারণ গ্লাস স্ক্রিনে দুই গুচ্ছ সমান্তরাল রেখা থাকে। প্রতিটি গুচ্ছের সমদূরবর্তী রেখাগুলি অপর গুচ্ছের সমান্তরাল রেখাগুলিকে ৯০ ডিগ্রিতে ছেদ করে।

উপেন্দ্রকিশোর নতুন একটি স্ক্রিনের প্রস্তাব করেন যাতে ৯০ ডিগ্রির পরিবর্তে গুচ্ছ দুটি ৬০ ডিগ্রিতে পরস্পরকে ছেদ করবে। এরকম একটি স্ক্রিন তৈরি হওয়ার আগেই ৬০ ডিগ্রি কোণে আনত রেখা বরাবর হাফটোন ডটের সজ্জার উপযোগিতার কথা তিনি 'পেনরোজ অ্যানুয়াল'-এর ১৮৯৭ ও ১৮৯৮-এ তাঁর প্রকাশিত রচনায় উল্লেখ করেন। তারপর দুই গুচ্ছের বদলে তিন গুচ্ছ রেখা, যাতে প্রত্যেকটি গুচ্ছের সমান্তরাল রেখাগুলি অপরটির সঙ্গে ৬০ ডিগ্রি কোণে আনত অবস্থায় থাকবে—এই ধরনের একটি স্ক্রিনের পরিকল্পনা করেন উপেন্দ্রকিশোর। স্ক্রিনটির নামকরণ করেন 'থ্রি লাইন স্ক্রিন'।

১৯০৫-০৬ এর 'পেনরোজ অ্যানুয়াল'-এ 'দা সিক্সটি ডিগ্রি ক্রস-লাইন স্ক্রিন' প্রবন্ধে থ্রি লাইন স্ক্রিন সম্বন্ধে উপেন্দ্রকিশোর লিখেছেন : "১৮৯৯ নাগাদ মেসার্স পেনরোজ অ্যান্ড কম্পানি মারফত আমি মিস্টার লেভিকে অনুরোধ করেছিলাম আমাকে এইরকম একটি স্ক্রিন তৈরি করে দেওয়ার জন্য, কিন্তু তিনি সেই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন। সত্যিই এ-ধরনের স্ক্রিন তৈরি করা খুব শক্ত। মিস্টার শুল্‌ৎজেও সেই কথা বলেছেন, এবং অন্যান্য নির্মাতাদের কাছে অনুরোধ জানানোর পর আমিও তা জানতে পেরেছি। কিন্তু এইসব অসুবিধার চরিত্র ও মাত্রা যা-ই হোক না, ফোর-লাইন স্ক্রিন নির্মাতার প্রতিভার কাছে [মিস্টার লেভি] তা কখনোই অনতিক্রম্য হতে পারে না।

"যাই হোক, আমার পছন্দমতো স্ক্রিন যখন নির্মাতারা তৈরি করলেন না, তখন তাঁরা যা তৈরি করতে পারবেন তাই গ্রহণ করা ছাড়া আমার আর বিকল্প রইল না। আমি মিস্টার লেভিকে দিয়ে আমার জন্য একটা ৬০ ডিগ্রি ক্রস-লাইন স্ক্রিন তৈরি করিয়ে নিলাম। এর অল্প কিছু দিনের মধ্যেই খবর পেলাম মিস্টার শুল্‌ৎজে এটির পেটেন্ট নিয়েছেন।"

আশ্চর্য লাগে, যখন দেখি শুল্‌ৎজের লেখা 'থ্রি লাইন্‌ড হাফটোন এনগ্রেভিং' প্রকাশিত হচ্ছে 'পেনরোজ' পত্রিকায় ১৯০৩-০৪-এ, আবার পরবর্তী বছরে (১৯০৫-০৬) একই পত্রিকায় উপেন্দ্রকিশোর রচিত এই পেটেন্ট গ্রহণের নেপথ্যকাহিনীও ছাপা হয়েছে কিন্তু অন্যায়ভাবে বঞ্চিত হওয়া সত্ত্বেও কোনো তিক্ততা প্রকাশ পায়নি। তিনি শুধু নৈর্ব্যক্তিকভাবে পুরো ঘটনাটির ইতিহাস তুলে ধরেছেন।

তবে এই প্রসঙ্গে তাঁর সবচেয়ে স্মরণীয় উক্তি :

To the craft it matters little who gets the credit for a particular invention. What directly concerns them is the addition of a valuable resource to their equipment.

এরপরেই তিনি ৬০ ডিগ্রি স্ক্রিন সম্বন্ধে প্রবঞ্চক শুল্‌ৎজের প্রকাশিত রচনার কয়েকটি ত্রুটি ধরিয়ে দিয়েছেন।

৬০ ডিগ্রি স্ক্রিনের উদ্ভাবক হিসেবে, পেটেন্ট তালিকার কোটি-কোটি নামের মধ্যেই শুধু বেঁচে থাকবে শুলৎজে। ৬০ ডিগ্রি স্ক্রিনের পেটেন্ট-কার হিসেবে অর্থ ছাড়া আর কিছুই সে পায়নি, কেননা

৬০ ডিগ্রি স্ক্রিনের ব্যবহারবিধি সম্বন্ধে কিছুই সে জানত না। এই স্ক্রিনকে কাজে লাগাতে হলে, এর থেকে বিশেষ উপযোগিতা পাওয়ার জন্য কি আকৃতির ও আকারের স্টপ বা ডায়াফ্রাম ব্যবহার করতে হয় সেটাও হিসেব কষে, এঁকে, ব্যাখ্যা করে দেখিয়ে দিয়েছিলেন উপেন্দ্রকিশোর, আলোচ্য প্রবন্ধটিতে।

রঙিন ছবির হাফটোন প্রতিচ্ছবি ছাপার জন্য হয় গোলাকার, নয়তো দুটি আয়তাকার গ্লাস স্ক্রিন ব্যবহার করে তিনটি নেগেটিভ তৈরি করে নিতে হয়। উপেন্দ্রকিশোর প্রথম প্রমাণ করলেন যে একটিমাত্র আয়তাকার ৬০ ডিগ্রি স্ক্রিন ব্যবহার করেই (বিশেষভাবে প্রস্তুত কয়েকটি ডায়াফ্রামের সাহায্য) থ্রি কালার হাফটোন ছবি ছবি ছাপার উপযোগী তিনটি হাফটোন নেগেটিভ প্রস্তুত করা সম্ভব। এই ধরনের রঙিন ছবিতে যে লাইন-এফেক্ট পাওয়া যায় তা ক্ষেত্রবিশেষে অতি সন্তোষজনক।

প্রসেস ক্যামেরার কর্মপদ্ধতির উন্নতি সাধনে উপেন্দ্রকিশোরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান মালটিপ্‌ল স্টপ। উপেন্দ্রকিশোরের প্রস্তাবগুলির পরিচয় দেওয়ার আগে জেনে নেওয়া দরকার সে-সময়ে কী ধরনের স্টপ ব্যবহার করা হতো (আজও তাই হয়) এবং সেই সাধারণ স্টপ-এর (সিঙ্গল স্টপ-এর) কার্যপ্রণালী ছিল কী ধরনের। ভেরফাসারের বই থেকেই সেই বিবরণ দেওয়া হচ্ছে।

হাফটোন-এর কাজে নানা ধরনের আকৃতির স্টপ ব্যবহার করা হতো, কিন্তু ডায়াফ্রাম পাতের মধ্যে ছিদ্র থাকত একটিই। (তাই এগুলিকে উপেন্দ্রকিশোর 'সিঙ্গল স্টপ' আখ্যা দিয়েছিলেন।) চৌকো আকৃতির স্টপ ব্যবহার করলে পাওয়া যায় চৌকো ডট্। কিন্তু এই চৌকো স্টপটির বাহুগুলি যদি স্ক্রিন-লাইনের সঙ্গে ৪৫ ডিগ্রি কোনে স্থাপিত হয় (রুইতনের ফোঁটার মতো) তাহলে ডট্-এর চেহারাটা হয় প্রায় আটকোনা ক্ষেত্রের মতো, কারণ স্ক্রিনের লাইন চৌকো স্টপের কোণগুলিকে ছেঁটে ফেলে। কিন্তু এই স্টপের কোণগুলি যদি কেটে বাড়িয়ে দেওয়া যায় তাহলে ডট্‌গুলি ঐ কোনাগুলি বরাবর ছড়িয়ে পড়বে। এই ছড়িয়ে পড়াকেই সাধারণত 'জয়েনিং আপ' বলা হয় এবং প্রসেস-কর্মীরা এই ঘটনাটিকে স্বাগত জানায়। কারণ এর ফলে হাইলাইট অংশের সাপেক্ষে নেগেটিভের ডট্‌গুলি আংশিকভাবে একে অন্যের উপর এসে পড়ে(overlap) এবং দাবা বোর্ডের মতো বাঞ্ছিত নকশা গঠন করে। ভেরফাসারের লেখা থেকে জানা যায় চৌকো স্টপ, বর্ধিত কোনাসমেত চৌকো (square stop with extended corners) ছাড়াও ক্রস চিহ্নের, তারার বা পিনকুশনের আকৃতির স্টপও ব্যবহার হতো, কিন্তু এ-সবের কার্যকরতা সম্বন্ধে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সন্দিগ্ধ। এবং বর্ধিত কোনা সমেত চৌকো স্টপ ছাড়া আর কোনো আকৃতির স্টপের বিষয়েই একটি ছত্র বর্ণনা করেননি।

এবার দেখা যাক ভেরফাসার এইসব সিঙ্গল স্টপ ব্যবহারের প্রণালী সম্বন্ধে কী জানিয়েছিলেন। সাধারণ ফোটোগ্রাফ তোলার মতো শুধু যদি একটি মাপের (size) ডায়াফ্রম ব্যবহার করে এক্সপোজার দেওয়া হয়, তাহলে শ্যাডো অংশে ডট্‌গুলি গঠিত হওয়ার আগেই নেগেটিভের হাইলাইট অংশ পুরোপুরি গঠিত হয়ে যায়। মিড্‌ল টোন অংশের ডট্‌গুলিও অসম্পূর্ণ থাকে। তাই সাধারণ পদ্ধতি হল শ্যাডো অংশে জোর করে ডট ফুটিয়ে তোলা। এটা করার জন্য খুব ছোট মাপের একটা গোলাকার ডায়াফ্রামের সাহায্য নেওয়া হয়—এই ধরা যাক *f/64* মাপের বা তারও ছোট। এই স্টপ ব্যবহারের সময় কপির উপর একটা সাদা কাগজ ধরা হয় এবং মাঝে-মাঝে সেটা নাড়া হয় যাতে কাগজের কোনো ভাঁজ বা দাগ ইত্যাদির প্রতিবিম্ব নেগেটিভে না আসে। এই স্টপ ব্যবহারের ফলে নেগেটিভের সর্বত্র ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্ন ডট সৃষ্টি হয় (একেই বলে ফ্ল্যাশিং)। এরপর হিসেব করে

প্রয়োজনীয় আকারের একটি চৌকো স্টপ লাগিয়ে এমনভাবে এক্সপোজার দেওয়া হয় যাতে ছবির প্রতিবিম্ব নেগেটিভে গৃহীত হয়। এই এক্সপোজারের মান হিসেব করা হয় এইভাবে—স্ক্রিন ব্যবহার না করে ছবি তুলতে যতক্ষণ এক্সপোজার দিতে হতো এখানে তার মোটামুটিভাবে পাঁচগুণ বেশি সময় লাগবে। বেশিরভাগ সাধারণ হাফটোন ছবির ক্ষেত্রে দুটি এক্সপোজারই (দু' ধরনের স্টপ ব্যবহার করে) যথেষ্ট (কোনোরকমের দায়সারা কাজ)। কিন্তু জটিল ছবির ক্ষেত্রে, যেমন ধরা যাক একটি 'ফ্ল্যাট' বা ভোঁতা ছবি—যার মধ্যে বৈষম্য বা উজ্জ্বলতার অভাব, যার হাইলাইট অংশ তুলনামূলক ভাবে ঘন (dark) এবং শ্যাডো অংশ হালকা (light)—সেক্ষেত্রে কিন্তু আরেকটি স্টপ ব্যবহার করে আরেকবার এক্সপোজার দেওয়া দরকার। এই তৃতীয় স্টপটিই হল বর্ধিত-কোনা বিশিষ্ট চৌকো স্টপ, যা জয়েনিং-আপ ঘটাতে সাহায্য করবে। এইসব বিভিন্ন এক্সপোজারের মধ্যকার অনুপাত নির্দিষ্ট করা অসম্ভব। বারবার পরীক্ষা-নিরীক্ষা মারফতই তা জেনে নিতে হয়।

এই ঠেকে শেখার ও হাতড়ে বেড়ানোর 'এম্পিরিকাল' প্রণালীর অবসান ঘটাতেই উপেন্দ্রকিশোরের গবেষণা। তিনি চেয়েছিলেন স্টপ ও এক্সপোজার ব্যবহারের মধ্যে বৈজ্ঞানিক শৃঙ্খলা। এবং সে কাজ শুধু ব্যবহারিক দক্ষতা দিয়ে হয় না, তার জন্যই প্রয়োজন তত্ত্ব-অনুশীলন। উপেন্দ্রকিশোর ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে 'পেনরোজ' পত্রিকায় সচিত্র গাণিতিক ও জ্যামিতিক আলোচনা সহকারে 'মালটিপ্‌ল স্টপ' তৈরি করার ও ব্যবহারের প্রণালী ব্যাখ্যা করেন। মাল্‌টিপল্‌ স্পট ব্যবহার করলে একাধিক সিঙ্গল স্টপ ও একাধিক এক্সপোজারের আর প্রয়োজন পড়ে না।

১৮৯৯-এর 'দা হাফটোন থিওরি গ্র্যাফিকালি এক্সপ্লেন্‌ড' প্রবন্ধে তিনি স্লিট-আকৃতির একটি মালটিপল স্টপের কথা বলেছেন। 'ডিফ্র্যাক্‌শান হাফটোন' (১৯০২-০৩) প্রবন্ধে উল্লিখিত তাঁর ডিফ্র্যাক্‌শান স্টপের কথা আগেই বলা হয়েছে, এটিও 'মালটিপল স্টপ'। 'দা সিক্সটি ডিগ্রি ক্রসলাইন স্ক্রিন'-এ (১৯০৫-০৬) তিনি এই স্ক্রিনের উপযোগী 'মালটিপল স্টপ' এবং এই একটিমাত্র স্ক্রিন নিয়ে 'থ্রি-কালার হাফটোন' তৈরির উপযোগী স্টপ নির্মাণের পদ্ধতি (ব্যাখ্যা সমেত) বর্ণনা করেছেন। তবে 'মালটিপল স্টপস' (১৯১১-১২) নামে 'পেনরোজ'-এ প্রকাশিত তাঁর শেষ রচনাটি এ-বিষয়ে ব্যবহারিক কর্মীদের (গবেষকদেরও) পক্ষে আজও অবশ্যপাঠ্য হওয়া উচিত। এর মধ্যে নানা ধরনের 'মালটিপ্‌ল স্টপ'-এর সচিত্র বর্ণনা আছে।

এই 'মালটিপ্‌ল স্টপস' প্রবন্ধটিতে আছে এই স্টপগুলি দিয়ে প্রস্তুত ব্লক থেকে মুদ্রিত চিত্রের নমুনা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি আলোকচিত্র থেকে চারভাবে প্রস্তুত (একটি নর্মাল-দূরত্বে গোলাকার স্টপ দিয়ে, ও বাকি তিনটি তিন ধরনের মালটিপ্‌ল স্টপ দিয়ে তোলা) চারটি হাফটোন ছবি। তাছাড়া হেরম্বচন্দ্র মৈত্রের একটি আলোকচিত্র থেকেও চারভাবে প্রস্তুত হাফটোন ছবি।

'পেনরোজ অ্যানুয়্যাল'-এ প্রকাশিত উপেন্দ্রকিশোরের ন'টি রচনার কালানুক্রমিক তালিকা এখানে দেওয়া হল :

1. Focussing the Screen By U. Ray, 1897, pp. 108 to 111.

2. The Theory of the Half-tone Dot, Upendrakisor Ray, (Calcutta), 1898, pp. 33 to 40.

3. The Half-tone Theory Graphically Explained By U. Ray, 1899, pp. 49 to 53.

4. Automatic Adjustment of the Half-tone Screen, By U. Ray, Calcutta, 1901, pp. 76 to 80.

5. How Many Dots ? By U. Ray, Calcutta, 1901, p. 81.

6. Diffraction in Half-tone By U. Ray, Calcutta, 1902-3, pp. 81 to 91.

7. More about the Half-tone Theory By U. Ray, Calcutta, 1903, pp. 17 to 23.

8. The 60° Cross-line Screen By Upendrakisor Ray, 1905-6, pp. 97 to 102.

9. Multiple Stops By Upendrakisor Ray, Calcutta, 1911-12, pp. 81 to 88.

**উপেন্দ্রকিশোরের গবেষণার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির নিদর্শন রূপে পেনরোজ-সম্পাদক গ্যাম্বল-এর একটি লেখা পরিশিষ্টে উদ্ধৃত হলো।**

ভারতীয় শিল্পীদের কাজের সঙ্গে সাধারণ মানুষের প্রথম পরিচয় ঘটে উপেন্দ্রকিশোরের হাফটোন ব্লকের মধ্যস্থতায় 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকার পাতায়। উডকাট ও লিথোগ্রাফিকে অতিক্রম করে হাফটোন ব্লকের সৌজন্যে বাংলা গ্রন্থচিত্রণে যে যুগান্তর এল, তার পিছনেও উপেন্দ্রকিশোরের অনিবার্য উপস্থিতি।

'বঙ্গীয় গ্রন্থচিত্রণ' প্রবন্ধে কমলকুমার মজুমদার লিখেছেন, "বাংলায় আধুনিক গ্রন্থ-চিত্রণে দুইজন আমাদের চৈতন্য দিয়া থাকেন—ধার্মিক গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অন্যজন দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার।" 'ঠাকুরমার ঝুলি'র জন্য আঁকা, গ্রন্থকার দক্ষিণারঞ্জনের ছবিগুলিকে কাঠ খোদাই করে ব্লক তৈরি করেছিলেন খ্যাতনামা প্রিয়গোপাল দাশ ও আরও তিনজন। কমলকুমার সম্ভবত জানতেন না, গগনেন্দ্রনাথের ছবিগুলির ব্লক নির্মাণ করেছিলেন উপেন্দ্রকিশোর। প্রিয়গোপালের বুলির আঁচড়ে কাঠের ব্লক তৈরি করার উপযোগী করেই ছবিগুলি এঁকেছিলেন দক্ষিণারঞ্জন। উপেন্দ্রকিশোর ফোটোগ্রাফির সাহায্যেও এই ব্লক তৈরি করে দিতে পারতেন, কিন্তু কোনো উড-ব্লক নির্মাতার সাধ্য ছিল না গগনেন্দ্রনাথের ছবির তরল রঙের ছড়িয়ে পড়া আর ঘন হওয়াকে মুদ্রণোপযোগী রূপ দেওয়া। লিথোগ্রাফিতে রবি বর্মা ও অন্নদাপ্রসাদ বাগচী এবং কাঠ-খোদাইয়ে ত্রৈলোক্যনাথ দেব ও প্রিয়গোপাল দাশ প্রমুখের প্রতিভাকে পূর্ণ মর্যাদা দিয়েও স্বীকার করতে হবে যে, গ্রন্থ-চিত্রণের জগতে লিথোগ্রাফি, উড ও স্টিল এনগ্রেভিং ও এচিং ইত্যাদিকে যদি এক-একটি জানলা রূপে কল্পনা করা যায়, তবে হাফটোন-এর বাতায়নই সেখানে সবচেয়ে বেশি রঙ আর তার আমেজ ছড়িয়েছে।

১৯০২ খ্রীস্টাব্দে উপেন্দ্রকিশোর কৃত ব্লক থেকে রঙিন প্রতিচ্ছবি প্রকাশিত হওয়ার পর 'প্রবাসী' সম্পাদককে চিঠি দিয়েছিলেন রবি বর্মা। সম্পাদকের ভাষায়, "রবি বর্মা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ইহার প্রশংসা করেন।"

উপেন্দ্রকিশোর প্রতিষ্ঠিত 'ইউ রায় এন্ড সন্স' প্রতিষ্ঠানেই হাতেখড়ি হয় কলকাতার যাবতীয় হাফটোন ব্লক-কুশলীদের—যাঁদের অনেকেই পরবর্তীকালে স্বাধীনভাবে ব্যবসায়ে নামেন। কলকাতায় হাফটোন ব্লক নির্মাণ কালক্রমে কুটিরশিল্পের মতো হয়ে দাঁড়ায়। এটা এক ধরনের চেন-রিঅ্যাকশন—এক থেকে দুই, দুই থেকে চার করে যা প্রসারিত হয়। এই বিক্রিয়ার জন্মদাতা উপেন্দ্রকিশোর।



# গানের কল ও যন্ত্ররসিক এইচ বোস

"রাইচাঁদ বড়াল আদি করে বড় বড় ভাইরে ধরে,
রেখেছে ভাই বন্ধ করে, কলেতে ভরে,
আবার রেখেছে এক মেয়েকে ধরে
তার নাম গহরজান বাঈ।

ধনদৌলত, টাকাকড়ি, জুড়ি, ঘোড়া, ঘর-বাড়ী,
কলেতে গিয়াছে সব বাকী কিছু নাই।
এখন কলের গানে মাতিয়ে প্রাণে
ন্যাংটা করতে চায়।"

গম্ভীরায় নাম উঠেছিল কলের গানের।[১] বোঝা যায় গায়ক-কবি গোপাল দাস এখানে সাহেবি ফিকির হিসেবেই কলের গানকে দেখেছেন।

কলের গান বললেই ধুতরো ফুলের মতো চোঙাওলা গ্রামোফোনের ছবির সঙ্গে 'এইচ· এম· ভি' ট্রেডমার্কদাতা গ্রামোফোন কোম্পানি অফ ইন্ডিয়ার নাম স্মরণ করি আমরা। কিন্তু এই কোম্পানি কলকাতায় তাদের রেকর্ডিং স্টুডিও খোলার আগেই একটি স্বদেশী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান রীতিমতো শোরগোল ফেলেছিল।

'কুন্তলীন' 'দেলখোস' ও 'তাম্বুলীন' (পানপরাগের আদিরূপ) স্রষ্টা এবং 'কুন্তলীন পুরস্কার'-এর প্রবর্তক রূপেই এইচ বোসের নাম মুষ্টিমেয় লোক মনে রেখেছেন। কিন্তু কারিগরি বিষয়ে হেমেন্দ্রমোহন বসুর সৃজনশীলতার সেরা পরিচয় 'ফোনোগ্রাফ' রেকর্ড তৈরির প্রকৌশল আয়ত্ত করা।[২]

ফোনোগ্রাফকে গ্রামোফোনের আদিপুরুষ বলা হয়। জনপ্রিয় কল্পনায় যার আবিষ্কর্তা টমাস আলভা এডিসন। ফোনোগ্রাফে যে রেকর্ড বাজত তার আকার গ্রামোফোন ডিস্কের মতো চ্যাপটা নয়—থালার মতো নয়, এগুলি ছিল চোঙার মতো। তাই সিলিন্ডার রেকর্ড নামেও তা পরিচিত ছিল। মোমের রেকর্ডও বলতো অনেকে, কারণ, এক বিশেক ধরনের মোমের আবরণের গায়ে খাঁজ কেটে শব্দকে বন্দী করা হতো সেখানে।

বৈদ্যুতিক পদ্ধতিতে স্বর বিবর্ধন ও শব্দগ্রহণ শুরু হওয়ার অনেক আগে সে-যুগে ফোনোগ্রাফের রেকর্ডের গুণগত মান তুলনামূলকভাবে গ্রামোফোনের রেকর্ডের চেয়ে ভাল ছিল।

ফোনোগ্রাফ রেকর্ডের জনপ্রিয়তার আরেকটি কারণ ছিল। ঘরে-ঘরে প্রচলিত হওয়ার মতো টেপ-রেকর্ডার তৈরির প্রায় ষাট বছর আগে ফোনোগ্রাফই প্রথম মানুষকে ঘরে বসে নিজের ও আত্মীয়-বন্ধুদের কণ্ঠ রেকর্ড করার ও বাজিয়ে শোনানোর সুযোগ করে দিয়েছিল। মোমের তৈরি সাদা-চোঙা রেকর্ডগুলিকে (blank cylinders) আধুনিক টেপের মতোই বারবার ব্যবহার করা যেত। একবার শব্দগ্রহণের পর বিশেষ যন্ত্রাংশের সাহায্যে মোমের রেকর্ডের উপরকার আস্তরণটা চেঁচে ফেললেই আবার তাতে নতুন শব্দ তোলা সম্ভব হতো (লেদ্ মেশিনে লোহার জিনিস 'টার্ন' করার সময় যেমন বাব্রি ছিটকোয়, তেমনি হতো মোমের রেকর্ড এইভাবে 'শেভিং' করার সময়)। গ্রামোফোন রেকর্ড অনেক শক্ত জিনিস (মূল উপাদান লাক্ষা) থেকে তৈরি হতো, তাই 'হোম্-রেকর্ডিং' কখনোই সম্ভব হয়নি।

ভারতে প্রথম ফোনোগ্রাফের আগমন কিন্তু স্প্রিঙ-চালিত গানের কল তৈরি হওয়ার আগেই। ১৮৭৯-এ, টাউন হলে মহমেডান লিটেরারি সোসাইটির বার্ষিক অধিবেশনের সময় স্যামুয়েল হ্যারাডেন প্রথম ফোনোগ্রাফ যন্ত্র ও তার কার্যধারা প্রদর্শন করেন।[৩] তার পরে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের বিজ্ঞানের অধ্যাপক ফাদার লাফোঁ ছাত্রদের অনুশীলনের জন্য আমেরিকার গ্রাফোফোন কোম্পানির তৈরি একটি ফোনোগ্রাফ আনিয়েছিলেন ১৮৮৮ সাল নাগাদ। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য ফাদার লাফোঁই ভারতের প্রথম বিজ্ঞান-মিউজিয়ামের প্রতিষ্ঠাতা (ন্যাচারাল সায়েন্স-এর কথা ধরছি না)। তাছাড়া তিনিই কলকাতার প্রথম মানমন্দির স্থাপন করেন নিজের কলেজে। সেন্ট জেভিয়ার্সের সেই 'মিউজিয়াম অফ ফিজিকাল সায়েন্স' বহুকাল লুপ্ত। এই ফোনোগ্রাফটির পরিচয়-ফলক থেকে জানা যায়, এটি ১৮৮৭-র ২৭ ডিসেম্বরে প্রাপ্ত চার্লস সাম্‌নার টেন্‌টারের পেটেন্ট অনুযায়ী তৈরি।

সে-যুগের আরেকটি বিচিত্র ফোনোগ্রাফের অসাধারণ একটি আলোকচিত্র রক্ষা পেয়েছে। এটি ভারতের পথিকৃৎ আলোকচিত্রী লালা দীনদয়াল তুলেছিলেন হায়দরাবাদের নিজাম-প্রাসাদে। ১৮৯২-এর ২২ মে দিনাঙ্কিত ছবিটিতে দেখা যায় সেলাই কলের মতো পায়ে চালানো এই ফোনোগ্রাফটি শুনতে বহু দেশী-বিদেশী মানুষের ভিড়। কানে নল লাগিয়ে একসঙ্গে দশজন একটি চোঙা রেকর্ড শুনছেন। এই যন্ত্রটিও আমেরিকান গ্রাফোফোন কোম্পানির তৈরি।

ফাদার লাফোঁর ফোনোগ্রাফটি তাঁর ছাত্র জগদীশচন্দ্রের দৃষ্টি আর্কষণ করেছিল কিনা বলা সম্ভব

ফটোগ্রাফে ফনোগ্রাফে

ফটোগ্রাফে আপনার দূরস্থিত বন্ধুর চিত্র দর্শনে আপনি পুলকিত হন। নব আদর্শ ফনোগ্রাফে তাঁহার কণ্ঠস্বরের অবিকল চিত্র চিরস্থায়ী করিবার উপায় হইয়াছে।

এইচ বসুর রেকর্ড

ও

নব আদর্শ ফনোগ্রাফ

আপনার পরিবারের মধ্যে বিমল আনন্দ প্রদান করিবার পক্ষে বিশেষ উপযোগী এমন কি একান্ত প্রয়োজনীয়।

ইহা দ্বারা আপনি স্বদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ গায়কদিগের গান যখন ইচ্ছা শুনিতে পারিবেন।

ইহা দ্বারা আপনি আপনার স্বজন ও বন্ধুদিগের গান ও কথা [illegible] শুনিতে পারিবেন।

ইহা দ্বারা আপনি [illegible] হইতে অব্যাহতি পাইবেন।

ইহা দ্বারা আপনি [illegible] সুখী করিতে পারিবেন।

এইচ বসুর রেকর্ডগুলি

যে কিরূপ আশ্চর্য্য [illegible] জানিবার জন্য আপনার কোন বন্ধুর নিকট পত্র লিখুন, অথবা [illegible] আমাদের অদ্যই পত্র লিখুন।

টকিং মেশিন হল—মার্বল হাউস্‌,

ধর্মতলা, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন . প্রবাসী

SWADESHI BINAPANI R

"Swadeshi"—in the truest sense of

"Swadeshi" not in name only

Unlike so-called Swadeshi Phonographic r

the songs are recorded in India with For

But our "SWADESHI RECOR

Manufactured by "Swadeshi" Brethren with "Sw



SWADESH

RE

NEW

The pride of

glory of

The boast of

The best and

ing all other re

Agents wanted

Manufacturers:—The BINAPANI RECORI

স্বদেশী বীণাপাণি রেকর্ড : বিজ্ঞাপন

নয়। তবে জগদীশচন্দ্র স্বয়ং একটি ফোনোগ্রাফ আনিয়েছিলেন। দেবেন্দ্রমোহন বসু সে বিষয়ে লিখেছেন, "১৮৯২ সালে তিনি মানুষের কণ্ঠস্বর বাণীবদ্ধ করার ও বাজিয়ে শোনানোর জন্যে এডিসনের সাবেক মডেলের একটি ফোনোগ্রাফ সংগ্রহ করেন। ওই ফোনোগ্রাফ থেকে তীক্ষ্ণ আনুনাসিক ঝাঁঝালো স্বর বের হচ্ছিল। আমার চেয়ে বয়সে বড় এক বালক ভৃত্য দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে ব্যাখ্যা জুড়ে বলেছিল যে একটি কালো ধাতুর প্যাঁটরায় বন্দী জিনেরই ওই আওয়াজ।[৪]

১২৯৮ সালের 'পরিচারিকা'র জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা থেকে জানা যায়, সে সময়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে জগদীশচন্দ্র বসু একটি ফোনোগ্রাফ আনিয়েছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথ সহ "তন্মধ্যে ব্রাহ্ম সমাজের গায়ক-গায়িকা কয়টী নরনারীর গীত সঞ্চয় করিয়া" রেখেছিলেন।[৫]

মামা জগদীশচন্দ্রের অনুসন্ধিৎসা অনুসরণ করেই দেবেন্দ্রমোহনের জ্যাঠতুত দাদা হেমেন্দ্রমোহনও নিশ্চয় ফোনোগ্রাফের দিকে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু ঐ তীক্ষ্ণ আনুনাসিক ঝাঁঝালো স্বর তাঁর হাতে পরাস্ত হয়েছিল।

১৩০৩ সালের ২৪শে মাঘ জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর দুই ভাইপো গগনেন্দ্রনাথ ও বলেন্দ্রনাথের আগ্রহে 'খামখেয়ালি সভা' গড়ে ওঠে। ঐ সভার প্রাণপুরুষ ছিলেন

রবীন্দ্রনাথ। খামখেয়ালি সভার প্রথম অধিবেশনের বিবরণ সমেত রবীন্দ্রনাথ একটি প্রতিবেদনে লিখছেন :

"খামখেয়ালি সভার প্রথম সূচনা। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ও গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রস্তাব মত এই সভার প্রথম প্রতিষ্ঠা হয়। ২৪ মাঘ ১৩০৩ জোড়াসাঁকো। নিমন্ত্রণ কর্তা।—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। অনুষ্ঠান।—রাধিকা গোস্বামীর গান। অক্ষয় মজুমদার কর্তৃক 'বিনি পয়সায় ভোজ' আবৃত্তি। ফোনোগ্রাফ যন্ত্র শ্রবণ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত 'কুহেলিকা' নামক গল্প পাঠ। গান বাজনা আহার।—বাঙ্গলা জলপান।"[৬]

১৮৯৬ সালে এই ফোনোগ্রাফ যন্ত্রটির পিছনেও হেমেন্দ্রমোহনের উপস্থিতি অনুমান করা যায়। এই খামখেয়ালি সভার আলোচনা প্রসঙ্গেই রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর হেমেন্দ্রমোহনের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন[৭] :

"প্রত্যেক অধিবেশনের জন্যই বাবা নতুন গান বেঁধে রাখতেন। যৌবন বয়সে বাবা কী মিষ্টি অথচ জোরালো গাইতে পারতেন, লোকে তাঁর গান শোনবার জন্য কিরকম পাগল হয়ে যেত, যারা না শুনেছে তারা কল্পনা করতে পারবে না। গ্রামোফোন তখন আবিষ্কার হয়নি, তাঁর গলার রেকর্ড কয়েকটি মাত্র আছে, কিন্তু তাও বৃদ্ধ বয়সে নেওয়া, তখন গলা পড়ে গেছে। তখনকার দিনে ফোনোগ্রাফ নামে মেশিন ছিল, মোমের সিলিন্ডারের উপর রেকর্ড উঠত। তার নকল নেওয়া যেত না। 'কুন্তলীন'-এর এইচ· বোস এই মেশিন এদেশে আমদানি করেন। তিনি বাবার গলার বিস্তর রেকর্ড নিয়েছিলেন। কয়েক বছর পূর্বে তাঁর ছেলে নীতীনকে এই রেকর্ডগুলির খোঁজ নিতে বলি। দুঃখের বিষয় বহু অনুসন্ধানের পর কয়েকটি মাত্র সিলিন্ডার পাওয়া গেল—সেগুলিও তখন নষ্ট হয়ে গেছে।"

১৯০৫-০৬ নাগাদ রেকর্ডের ব্যবসা শুরু করার বহু আগেই হেমেন্দ্রমোহন ফোনোগ্রাফে রেকর্ড করার কৌশল আয়ত্ত করেছিলেন। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা শান্তা দেবী লিখছেন, "গান শোনবার জন্য বাবা কলকাতার কুন্তলীন প্রেসের এইচ· বসুর কাছ থেকে ফোনোগ্রাফ আনিয়েছিলেন। বাজাবার জন্য একজন লোকও সঙ্গে ছিলেন। তখনকার রেকর্ড ছিল গেলাসের মত দেখতে থালার মত নয়। এই প্রথম কলের সাহায্যে রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠের গান শুনলাম। 'অয়ি ভুবনমনোমোহিনী', 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি' এসব গান তার আগে এলাহাবাদে কেউ শোনেনি। কোন কোন রেকর্ড ছিল সুবিখ্যাত গায়িকা অমলা দাসের। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'পার ত জন্মো না কেউ বিষ্যুতবারের বারবেলায়' ও 'বুড়োবুড়ী দু-জনাতে মনের মিলে সুখে থাকত....' এইসব হাসির গান আমরা দু-দিনেই শিখে নিলাম। কী মজা লাগত সেইসব গান গাইতে। বাজিয়ে ভদ্রলোক আমাদের বাড়ীতেই ছিলেন, যখন তখন নানা রেকর্ড বাজিয়ে আমাদের খুশী করতেন।"[৮]

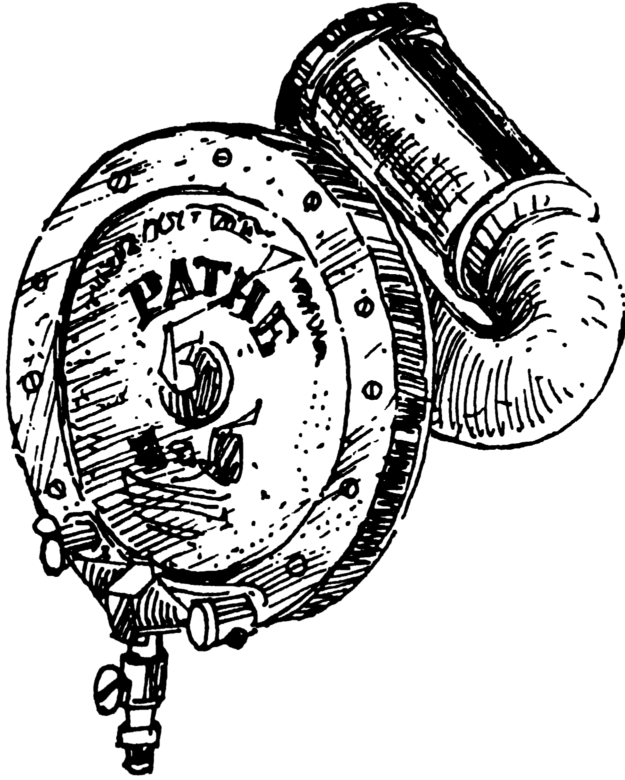
ভাগ্নে হেমেন্দ্রমোহনের তৈরি রেকর্ড শুনে মুগ্ধ হয়েছিলেন জগদীশচন্দ্র। তাই পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ যখনই তাঁর বাড়িতে গান গাইতে এসেছেন ডাক পড়েছে হেমেন্দ্রমোহনের রেকর্ড তোলার জন্য। বিখ্যাত বিজ্ঞানী যন্ত্রকুশলী জগদীশচন্দ্রও এ-ব্যাপারে তাঁর উপর নির্ভর করতেন। ১৯০২-তে বিলেত থেকে ফেরার পর জগদীশচন্দ্র তাঁর পার্শিবাগান লেনের নতুন বাড়িতে (বর্তমান আচার্য ভবনে) উঠলেন। এই সময়কার কথা লিখছেন দেবেন্দ্রমোহন বসু, "প্রথম দিকে রবীন্দ্রনাথ প্রায়ই আসতেন এই বাড়িতে। তিনি সোজা চলে আসতেন ওপরের তলায় জগদীশচন্দ্রের পাঠকক্ষে।

বঙ্গভঙ্গের সঙ্গে এই বাড়ির বহু কর্মকাণ্ডের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। রবীন্দ্রনাথ একটি নতুন 'স্বদেশী' গান বাঁধা মাত্র জগদীশচন্দ্রের বসার ঘরে চলে আসতেন যাতে হেমেন্দ্রমোহন বসু তাঁর নতুন প্যাথেফোনে তাঁর গান রেকর্ড করতে পারেন। বড়ই দুঃখের কথা যে, মধ্যবয়সে পদার্পণের মুখে রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠের মোমের রেকর্ডগুলির মধ্যে কয়েকটি মাত্র রক্ষা করা গেছে।"[৯]

দেবেন্দ্রমোহন বসু তাঁর সপ্ততিতম জন্মদিবসের স্বরচিত ভাষণেও প্রায় একই কথা আবার বলেছেন, "বঙ্গ-বিভাগের বিরুদ্ধে জন-আন্দোলন গড়ে উঠবার ফলে রাজনীতিতে স্বরাজ লাভের আর শিক্ষা ও শিল্পে স্বদেশী আন্দোলনের জন্ম। এতে আমাদের গোষ্ঠীও প্রভাবিত হয়।....রবীন্দ্রনাথ ওই আন্দোলনের সঙ্গে পুরোপুরি একাত্ম হয়ে যান আর তাঁর বিখ্যাত স্বদেশী গানগুলি ওই সময়কার রচনা। তিনি তাঁর সর্বাধুনিক গানগুলি গেয়ে শোনানোর জন্য আচার্য জগদীশচন্দ্রের গৃহে একদিন অন্তর আসতেন। হেমেন্দ্রমোহন বসু সেইসব গান মোমের রেকর্ডে বাণীবদ্ধ করে রাখতেন। দুর্ভাগ্যবশত ঐগুলি থেকে ধাতব ম্যাট্রিক্স তৈরির কলাকৌশল এদেশে প্রচলন হবার আগেই, ঐ সব রেকর্ডের গুণগত উৎকর্ষ নষ্ট হয়ে যায়।"

এখানে দেবেন্দ্রমোহন বসু ভুলক্রমে সে যুগে 'প্যাথেফোনে' মোমের রেকর্ড গ্রহণ করার কথা লিখেছেন। প্যাথে কোম্পানির সঙ্গে চুক্তি অনুসারে হেমেন্দ্রমোহনের 'প্যাথে-এইচ বোসেজ্ রেকর্ড' বেরিয়েছিল সিলিণ্ডার রেকর্ডের ব্যবসা প্রায় বন্ধ হওয়ার মুখে, ১৯০৮-০৯ নাগাদ এবং সেই রেকর্ডগুলি চোঙা রেকর্ড নয়—সেগুলি চাকতি অর্থাৎ ডিস্ক রেকর্ড। সম্প্রতি দেবেন্দ্রমোহন বসুর একটি পাণ্ডুলিপির সন্ধান পাওয়া গেছে, তার থেকে স্পষ্ট জানা যায় যে, স্বদেশী যুগে হেমেন্দ্রমোহন বসু প্যাথেফোনে নয়, ফোনোগ্রাফেই রেকর্ড করতেন, "....সে সময়ে রবীন্দ্রনাথের কাব্যরচনা প্রতিভার চেয়েও গায়কের প্রতিভার বেশী প্রচার ছিল। মনে আছে স্বদেশীর সময়ে রবীন্দ্রনাথ সপ্তাহে কয়েকখানা স্বদেশী গান রচনা করিয়া মামার নিকট ৯৩ U. C. Road-এ আসিয়া গান করিয়া শুনাইতেন। আমার জাঠতুতো দাদা ˚ হেমেন্দ্রমোহন বসু সেই সময়ে বিশেষ দক্ষতার সঙ্গে Phonograph-এ মোমের cylinder-এ record করতেন। রবীন্দ্রনাথের সব স্বদেশী গান তিনি মামার বাড়ীতে আসিয়া রেকর্ড করেন। তখনকার record-এর মধ্যে ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম গান', রবীন্দ্রনাথের আবৃত্তি 'সোনার তরী' ও গান 'ওই ভুবনমনমোহিনী', 'সার্থক জনম মম', 'তোর ডাক শুনে যদি কেউ না আসে' ইত্যাদি। সব সেই সময়ের রচিত গান। দুঃখের বিষয় বছর পনেরর ভেতর সেই সব record নষ্ট হয়ে যায়। যাঁরা রবীন্দ্রনাথের আবৃত্তি ও গান শুনেছেন তাঁরাই বুঝবেন যে তাহাতে কি একটা মূল্যবান জিনিষ record-গুলির সঙ্গে নষ্ট হয়ে গিয়াছে।[১০]

শুধু জগদীশচন্দ্রের বাড়িতেই নয়, রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বদেশী যুগের গান রেকর্ড করতে হেমেন্দ্রমোহনের বাড়িতেও নিয়মিত আসতেন। অমল হোম লিখছেন,[১১] "....তারপর এল তাঁর (রবীন্দ্রনাথের) গানের বন্যা স্বদেশী আন্দোলনের স্রোতধারায়, সোনার বাংলা গেল ভেসে। বাংলা দেশের হৃদয় হতে অপরূপ রূপে বাহির সেই গানগুলি সব ধরেছিলেন তাঁর প্যাথেফোন রেকর্ডে কুন্তলীন দেলখোসের এইচ বসু মশায়। মনে পড়ে, শিবনারায়ণ দাস লেনে হেমেন্দ্রমোহনের বাসভবনে কবি যেদিন রেকর্ডে গান দিতে আসতেন, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটের মুখ থেকে সে সরু গলির দু'ধারে লোক দাঁড়িতে যেত। আর আমরা ছেলেরা বসু মশায়ের বাড়িতে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতাম। রেকর্ড নিখুঁত করার জন্য কখনো কখনো রবীন্দ্রনাথ যখন একটি গান দু'বার গাইতেন, তখন




প্যাথে শব্দ-মঞ্জুষা

আর আমাদের সে অপ্রত্যাশিত আনন্দের সীমা থাকত না। 'বন্দে মাতরম' গানও তিনি রেকর্ডে দিয়েছিলেন। বড় দুঃখের কথা, স্বদেশী যুগে রবীন্দ্রনাথের তেজদৃপ্ত কণ্ঠের সেই উদ্দীপ্ত সংগীতের রেকর্ড প্রায় সবই নষ্ট হয়ে গিয়েছে। সেগুলি থাকলে আজ লোকে জানতে পারত কী বীর্যবন্ত ছিল সে-কণ্ঠ। একথা বলছি এইজন্য যে, অনেকের ধারণা—ভুল ধারণা—আছে, রবীন্দ্রনাথের গলা ছিল মেয়েলি। একেবারেই নয়।"

১৯০৬ থেকে হেমেন্দ্রমোহন দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে ফোনোগ্রাফ ও এইচ বোসেস্ রেকর্ডস্-এর ব্যাপক প্রচারকার্য শুরু করেন। গ্রামোফোন রেকর্ড, যে-সুযোগ দিতে অক্ষম, সেইদিকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি নিয়মিত বিজ্ঞাপন দিতেন 'প্রবাসী'তে। ১৩১৩-র আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত এইরকম একটি বিজ্ঞাপন এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে।

১৯০৬-এর ১৬ ফেব্রুয়ারি বেঙ্গলি-তে প্রকাশিত হলো প্রথম বিজ্ঞাপন। তারপর থেকেই অবিরাম স্রোত। ১০ই সেপ্টেম্বরের বিজ্ঞাপনটি প্রণিধানযোগ্য :

**To Drive Away The Dull Hours**
**after days toil you cannot do better than ask the help of**
**H. Bose's Wonderful Records**
**which will make you laugh when you are not so inclined by the comical songs of Srijut D. L. ROY. They will soothe your disturbed heart with the religious songs of Srijut L. C. BURAL and Srijut H. L. BISWAS. The soul stirring songs of Srijut RABINDRANATH TAGORE and the SEBAK SOMPRADAYA will infuse a new life in you and the rich and sweet voice of hosts of the Master Artists will dispel the gathered gloom of your mind.**

শ্রদ্ধেয় সুকুমার সেনের বিস্ময়কর সংগ্রহের মধ্যে আছে অতি-দুর্লভ 'এইচ বোসেজ রেকর্ডস্'-এর ক্যাটালগের দ্বিতীয় খণ্ড। ১৯০৬-এর মার্চ দিনাঙ্কিত। ভারতের প্রথম রেকর্ড তৈরির কারখানা, হেমেন্দ্রমোহনের 'দা টকিং মেশিন হল' থেকে প্রকাশিত। 'দা টকিং মেশিন হল' প্রতিষ্ঠিত হয় ৪১ নং ধর্মতলা স্ট্রিটের 'মার্বেল হাউস' নামে পরিচিত বাড়িটিতে।

এই রেকর্ড তালিকায় রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলাল-গীত যথাক্রমে চোদ্দটি ও বারটি রেকর্ডের উল্লেখ আছে। হেমেন্দ্রমোহন যে স্বদেশী গানের প্রচারেই উদ্যোগী হয়েছিলেন তারই প্রমাণ নির্বাচিত গানের এই তালিকা। স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে রচিত 'বাউল' গ্রন্থ থেকেই রবীন্দ্রনাথের বেশিরভাগ গান তখন রেকর্ড করা হয়েছিল।[১২]

রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলাল ছাড়া হেমেন্দ্রমোহনের সিলিন্ডার রেকর্ডের বিশিষ্ট শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন, সত্যভূষণ গুপ্ত, বন্দে মাতরম্ সম্প্রদায় (কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ রচিত গান), ওস্তাদ রমজান খাঁ, পীয়ারা সাহেব, লালচাঁদ বড়াল ও স্টার থিয়েটারের নরী, বসন্ত ও কাশীবাবু। বাংলার ক্যারুসো লালচাঁদের কম করে চব্বিশটি রেকর্ড প্রকাশিত হয়েছিল। হিন্দু, উর্দু ও ওড়িয়া গানেরও রেকর্ড ছিল।[১৩]

গ্রামোফোনের ডিস্ক রেকর্ডের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সিলিণ্ডার রেকর্ড জনপ্রিয়তা হারাতে শুরু করে। ১৯০৭-এর ২৭ জুন বিজ্ঞাপিত হলো, 'টকিং মেশিন হল' ১ এপ্রিল ধর্মতলার মার্বেল হাউস ছেড়ে ৬১ বৌবাজার স্ট্রিটের তিনতলা নতুন বাড়ি' দেলখোস হাউস'-এ স্থানান্তরিত হবে। ১৯০৬-এর থ্যাকার্স ডাইরেক্টরি থেকে দেখা যায়, মার্বেল হাউসের কালে এই দোকান তথা কারখানার ম্যানেজার ছিলেন এস· বোস, মেকানিক এন নিয়োগী। আর তিনজন সহকারী টি বোস, এম বোস ও এস ঘোষ। ১৯০৬-এ কলকাতায় ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রিয়াল ও এগ্রিকালচারাল এগ্‌জিবিশন-এ এইচ· বোসের তৈরি সিলিন্ডার রেকর্ড একটি স্বর্ণপদক লাভ করে। উল্লেখযোগ্য, তিনি পুরস্কৃত হন বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুর বিচারে।[১৪]

এইরকম পরিস্থিতিতে হেমেন্দ্রমোহন ফ্রান্সের প্যাথে কোম্পানির সঙ্গে চুক্তি করে যৌথ উদ্যোগে 'ডিস্ক রেকর্ড'-এর ব্যবসায় নামলেন। 'প্যাথে-এইচ· বোসেজ রেকর্ড' লেবেলযুক্ত ডিস্ক রেকর্ড নির্মাণের পর্ব শুরু হলো। ১৯০৭-এ কলকাতায় গ্রামোফোন কোম্পানি রেকর্ড তৈরির প্রেশিং

প্ল্যান্ট বসানোর পরেও কেন তিনি প্যাথে কোম্পানির সঙ্গে চুক্তি করলেন তার পিছনে প্রযুক্তিগত কারণ যেমন আছে, তেমনি আছে বৃহৎ শিল্পোদ্যোগের কোলাবরেশনে নেমে ক্ষুদ্রের স্বাতন্ত্র্য লোপ পাওয়ার আশঙ্কা। তাছাড়া সেই ব্রিটিশ-বিরোধী স্বদেশী আন্দোলনের কালে একটি ব্রিটিশ কোম্পানির চেয়ে ফরাসি কোম্পানির সঙ্গে কাজ করার সুবিধের কথাও নিশ্চয় তিনি অনুধাবন করেছিলেন। বিশেষ ক'রে তাঁর তৈরি রেকর্ডের অধিকাংশ গানই যখন দেশাত্মবোধক।[১৫]

প্রযুক্তিগত কারণটির কথা বলি। প্যাথে ডিস্ক রেকর্ডে 'ভার্টিকাল্ কাট্' পদ্ধতিতে শব্দগ্রহণ করা হতো। সিলিন্ডার রেকর্ডেও তাই। ফলে, হেমেন্দ্রমোহনের সিলিন্ডার রেকর্ড প্যাথে ডিস্ক রেকর্ডে ট্রান্সফার করা সহজ ছিল।[১৬]

প্যাথে ডিস্ক রেকর্ডের আরেকটি বৈশিষ্ট্য ছিল। এই রেকর্ডগুলি বাজতে শুরু করত কেন্দ্রের কাছ থেকে শেষ হতো কিনারায় পৌঁছে। তবে ঘুরত আর-পাঁচটা রেকর্ডেরই মতো (টার্ন-টেবলের উপর থেকে দেখলে ডান-আবর্ত বা ক্লক-ওয়াইজ)।[১৭]

প্যাথে রেকর্ড বাজাবার জন্য প্যাথেফোন-এর বহু মডেল ছিল। তাছাড়া অন্য যে-কোনো ডিস্ক-রেকর্ড বাজাবার যন্ত্রেও শুধু শব্দ-মঞ্জুষাটি বদলে তার জায়গায় প্যাথে-র শব্দমঞ্জুষা লাগিয়ে নিলেও এই রেকর্ড বাজানো যেত। প্যাথে-র শব্দমঞ্জুষায় স্টিল পিন ব্যবহার করা হতো না, ফোনোগ্রাফের রেকর্ড বাজাবার মতোই স্থায়ী 'স্যাফায়ার স্টাইলাস' ছিল। যা বারবার বদল করতে হতো না। স্টিল পিন ব্যবহার না করার অন্যতম কারণ, প্যাথের ডিস্ক তৈরি হতো 'সেলুলোজ' আবৃত ঘনীভূত কাগজে।[১৮]

প্যাথে রেকর্ড ও প্যাথেফোন যন্ত্রের এই বৈশিষ্ট্যগুলির দিকে বারংবার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে দেখা যায় হেমেন্দ্রমোহনকে, তাঁর প্রচারিত বিজ্ঞাপনগুলিতে।

হেমেন্দ্রমোহন অমৃতবাজার পত্রিকায় পাতা-জোড়া প্যাথেফোনের বিজ্ঞাপন দিলেন ১৯০৮-এর ৯ মার্চ। তখনও বাংলা গানের প্যাথে-এইচ বোসেস রেকর্ড এসে পৌঁছয়নি। গ্রামোফোনের সঙ্গে তুলনায় প্যাথেফোনের বাড়তি সুযোগ-সুবিধার কথাই বলা হল :

DEATH OF THE NEEDLE
FIRST CAME OUT THE PHONOGRAPH
With cylinder records which by degrees were perfected to give very loud, clear and distinct music.
Next Came The Disc Machines
which also give quite loud music but have to use a needle every time.
THE LATEST IS THE PATHEPHONE
which is a combination of the above two machines. It is a disc machine doing away with the use of needles. It combines the advantages of both minus the disadvantage of any.

১৫ মার্চ (১৯০৮) 'বেঙ্গলি'তে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে প্রথম প্যাথে ডিস্কে এইচ বোসেস রেকর্ডের আংশিক তালিকা দেখা যায়। তখনো রেকর্ডগুলি এসে পৌঁছয়নি।

সবার উপরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের এই ডিস্ক রেকর্ডটি সম্বন্ধে প্যাথেফোন কোম্পানির ক্যাটালগে লেখা হয়েছিল :

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বনামধন্য কবিকুলশ্রেষ্ঠ সুকণ্ঠ রবীন্দ্রনাথের আর কি পরিচয় দিব ? বঙ্গের গৃহে গৃহে আবালবৃদ্ধবণিতা সকলেই রবিবাবুর সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা ও যশোরাশির বিষয় সম্যক অবগত আছেন। কোন সভায় বা সাধারণ উৎসব ক্ষেত্রে তাঁহার কণ্ঠনিঃসৃত সংগীত লহরী শ্রবণ করিবার আশায় লোকে এককালে উন্মত্ত হইয়া ছুটিত। আমারা যে সেই রবীন্দ্রনাথের কলকণ্ঠ রেকর্ড করিয়া চিরস্থায়ী করিতে পারিয়াছি এই আমাদের পরম সৌভাগ্য। তাঁহার কণ্ঠস্বর গৃহে বসিয়া শুনিতে কাহার না লালসা হয় ? আমাদের নিকট তাঁহার দুইখানি মাত্র রেকর্ড আছে।

৩৬৩৬৯ সোনার তরী (স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি) ইহার মাধুর্য রবিবাবু স্বকণ্ঠে কত সুন্দর ভাবে প্রতিফলিত করিয়াছেন তাহার স্বকণ্ঠে না শুনিলে ভাষায় বর্ণনার অতীত।

৩৬৩৫০ বন্দেমাতরম্
বঙ্গের গৌরব অমর বঙ্কিমচন্দ্রের প্রাণোন্মত্তকারী জাতীয় সংগীত। এতদুপরি স্বয়ং রবিবাবু তাহার গায়ক।

হেমেন্দ্রমোহন গৃহীত রবীন্দ্রনাথের গাওয়া অসংখ্য গানের রেকর্ডের মধ্যে এই প্যাথে ডিস্কটিই একমাত্র রক্ষা পেয়েছে। রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষে হেমেন্দ্রমোহনের পরিবার এই রেকর্ডটি অল ইন্ডিয়া রেডিও-য় উপহার দেন এবং এর একটি 'টেপ' (নং ৬৭) রবীন্দ্রভবনে সুরক্ষিত। রবীন্দ্রভবন সংগ্রহের যে তালিকা প্রকাশিত হচ্ছে তার প্রথম খণ্ডে বলা হয়েছে, হেমেন্দ্রমোহন বসুর রেকর্ডে রবীন্দ্রনাথের গাওয়া প্রায় চল্লিশটি গান বেরিয়েছিল। তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের মাত্র ষোলটি গান ও একটি আবৃত্তিকে নির্দিষ্ট করা গেছে। এইচ বোস রেকর্ডস-এর তালিকায় চোদ্দটি, প্যাথেফোন রেকর্ডের বিজ্ঞাপন থেকে বন্দেমাতরম্, অয়ি ভুবনমনমোহিনী ও আবৃত্তি—সোনার তরী।[১৯]

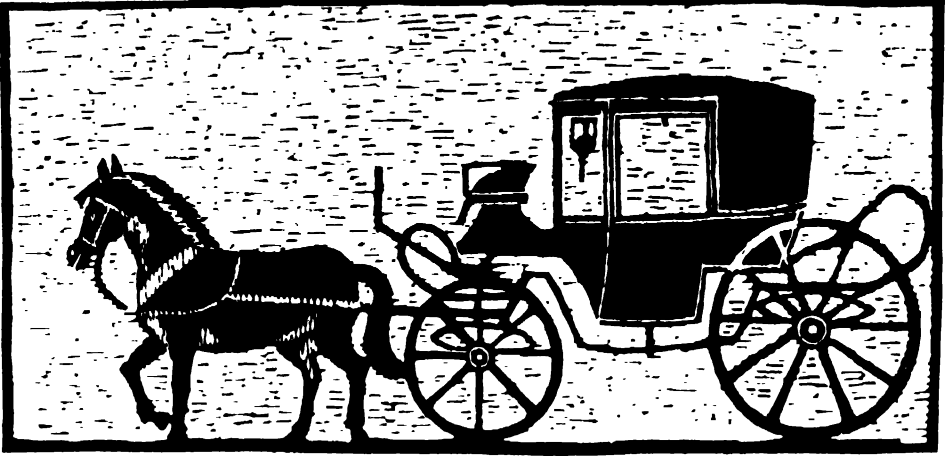
প্যাথে ডিস্কে হেমেন্দ্রমোহনের রেকর্ডগুলি বেলজিয়াম থেকে তৈরি হয়ে আসত। এটা রেকর্ডের উপর একটি খোদাই করা বরফির মধ্যে ইংরাজি বিবরণ থেকেই দেখা যায়। প্যাথে কোম্পানি নিজেরাও বাংলা গানের রেকর্ড প্রকাশ করেছিল, কিন্তু সেগুলি আসত ফ্রান্স থেকে।[২০]

১৯০৮-এর ১৭ মে 'বেঙ্গলি'তে প্রকাশিত বিজ্ঞাপন থেকে প্যাথে ডিস্কে এইচ· বোসের রেকর্ড-এর প্রথম চালান কলকাতায় পৌঁছনোর খবর পাওয়া যায়।

এরপর ২১ মে-র বিজ্ঞাপনে লালচাঁদ বড়ালের (ছ'টি), দেবেন্দ্রলাল ব্যানার্জির (দু'টি), স্টার থিয়েটারের শিল্পীদের (ষোলটি) ও পূর্ণকুমারীর (চারটি) গানের তালিকা প্রকাশিত হয়।

১৯১১-১২ নাগাদ হেমেন্দ্রমোহনের রেকর্ডের ব্যবসা বন্ধ হয়ে যায় প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী গ্রামোফোন কোম্পানির (এইচ· এম· ভি·) দাপটে।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, 'বন্দেমাতরম্' গানটির একটি স্বদেশী ডিস্ক রেকর্ড প্রকাশিত হয়েছিল ১৯০৮-এ। নির্মাতা, ক্রীক রো-এর 'বীণাপানি রেকর্ডস' কোম্পানি দাবি করেছিলেন, "স্বদেশী ভ্রাতাদের হাতে স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার করে এই প্রথম স্বদেশী ডিস্ক রেকর্ড।" এই কোম্পানির এজেন্ট ছিলেন, বিনোদবিহারী মুখার্জি, প্রযত্নে এফ· ডি· ইউনিয়ান স্টোর্স, ২১৭ কর্নওয়ালিস স্ট্রিট।।[২২]



# রকমারি ঘোড়ার গাড়ি

ঘোড়ার গাড়িকে কলকব্জার কাহিনীর মধ্যে টেনে আনা উচিত কিনা, প্রশ্ন উঠতেই পারে। আজকের বিচারে ঘোড়ার গাড়ি তৈরি নেহাতই সাদামাঠা ব্যাপার। কিন্তু মনে রাখা দরকার, এই ঘোড়ার গাড়িতে ইঞ্জিন জুড়েই বিনি-ঘোড়ার মোটরগাড়ির উদ্ভব। সে-কথায় পরে আবার আসতে হবে। এখানে জানিয়ে রাখা দরকার, ঘোড়ার গাড়ির স্প্রিং, চাকা ও স্টিয়ারিং ব্যবস্থা, কাঠের খোল তৈরি ইত্যাদি কাজও কারিগরি কৌশল ও কুশলতার উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। আপাতদৃষ্টিতে যৎসামান্য একটা উপকরণও কত চিন্তার পর জন্ম নেয়, তার একটা উদাহরণ দিচ্ছি।

ঘোড়ার গাড়ির ঝকঝকে পেতলের তৈরি চৌকো ধরনের বাতিদান কে না দেখেছে! বিশেষ করে তার লম্বা লেজটা। এই লেজটা কিন্তু শুধু বাহারি সংযোজন নয়। এটা তেলের আধার, চল্‌কে যাতে পড়ে না যায় তার জন্যই এই বিশেষ আকার।

টমাস রো একটি ইওরোপিয় ঘোড়ার গাড়ি উপহার দিয়েছিলেন সম্রাট জাহাঙ্গীরকে। এক রাত্তিরে সম্রাট সেটিতে চড়ে কিছুদুর ভ্রমণ করে সন্তুষ্ট হন। পরে তিনি আবার গাড়িটি উপহার দিয়েছিলেন নূরজাহানকে। আর নিজের কারিগরদের দিয়ে তারই নকলে একটি গাড়ি তৈরি করিয়ে নিয়েছিলেন। জাহাঙ্গীরের আমলে অল্পদিনের মধ্যেই এরকম আরও কিছু গাড়ি তৈরি হয়। ১৬১৭-য় প্রিন্স খুর্‌রামকে এমনই একটি গাড়ি উপহার দেওয়া হয়। পশ্চিমী ঘোড়ার গাড়ির প্রতি জাহাঙ্গীরের আকর্ষণ কিছুদিনের মধ্যেই ফিকে হয়ে যায়। এরপর সপ্তদশ শতাব্দীতে ভারতে এই জাতীয় গাড়ির আর উল্লেখ মেলে না বললেই চলে। কিন্তু তার জন্য কারিগরি পারদর্শিতার অভাব যে দায়ী নয়, তা একটি ঘটনা থেকেই প্রমাণিত। ভারতীয় সূত্রধররা এমন নিপুণভাবে জাহাঙ্গীরের জন্য প্রথম ঘোড়ার গাড়িটি তৈরি করেছিলেন যে, উপহারদাতা টমাস রো অবধি প্রথম দর্শনে আসল আর নকলের মধ্যে তফাত করতে পারেননি।[১]

পলাশীর যুদ্ধের আগে কলকাতায় একজনই ঘোড়ার গাড়ি চড়তেন বলে জানা যায়। ১৭২৪-এ ফোর্ট উইলিয়ামের প্রেসিডেন্ট ডিন্ সাহেব এগার শ' টাকা দিয়ে একজোড়া ঘোড়া সমেত একটি গাড়ি কিনেছিলেন।[২] অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে কলকাতার রাস্তায় ঘোড়ার গাড়ি চোখে পড়তে শুরু করে। ১৭৮০-র দশকে আঁকা ড্যানিয়েলের একটি কলকাতার দৃশ্যে প্রথম ঘোড়ার গাড়ির ছবি পাওয়া যায়।[৩]

১৭৯০-এর ইস্ট ইন্ডিয়া রেজিস্টার থেকে সারা বাংলায় মাত্র দশজন ঘোড়ার গাড়ি-নির্মাতার সন্ধান মেলে, নিচে তাঁদের নামের পাশে বন্ধনীর মধ্যে নির্দেশিত হয়েছে কে কোন বছরে এসেছিলেন

Edward Candler (1776)
John Coulton, Jessore (1775)
Robert Grange (1779)
William Grange (1783)
Richard Haigh (1780)
James Macnicol (1783)
James Stewart (1783)
Robert Stewart (1784)
Thomas Watson (1785)
James Watson (1781)

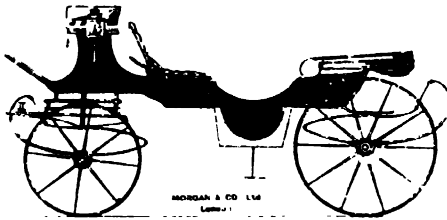
এই তালিকায় জেমস ও রবার্ট স্টুয়ার্ট (পদবীটা পরবর্তীকালে Steuart বলেই লেখা হতো) কলকাতার সবচাইতে নামকরা কোচ-বিল্ডার্স স্টুয়ার্ট অ্যান্ড কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা। আজও বহু হাত বদলের পর, পন্ডিতিয়া রোডে সামান্য মোটর গ্যারেজ হিসেবে সেটি টিকে আছে। সাইনবোর্ডের এককোণে ইংরেজিতে লেখা : স্থাপিত ১৭৭৫। অথচ আমরা দেখছি, ১৭৮৪-র আগে তাঁরা এখানে আসেননি। এটা সাম্প্রতিক কোনো ভ্রান্তির ফল নয়। উনিশ শতকেও স্টুয়ার্ট কোম্পানির বিজ্ঞাপনে স্থাপনার বর্ষটি ১৭৭৫ চিহ্নিত। অনুমান করা হয়, উইলিয়াম জনসন নামে তাঁদের পূর্ববর্তী এক কোচ-নির্মাতার ব্যবসাটি তাঁরা কিনে নিয়েছিলেন। সেই সুবাদেই ১৭৭৫-কে প্রতিষ্ঠা বর্ষ ধরতেন স্টুয়ার্টরা। উইলিয়াম জনসন ১৭৮৪-র ৮ অক্টোবর মারা যান।[৫]

জেমস ও রবার্টের পর তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন তাঁদের বৈমাত্রেয় ভাই উইলিয়াম। ওল্ড কোর্ট হাউস কর্নারে ছিল তাঁদের কারখানা ও আস্তাবল। সংবাদপত্রে স্টুয়ার্ট কোম্পানির প্রাচীনতম বিজ্ঞাপনের মধ্যে একটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৭৮৫-র ৩ জানুয়ারি, 'ইন্ডিয়া গেজেট'-এ :

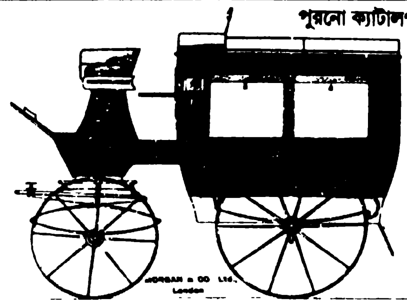
To be sold a Handsome Europe Post Chaise, new lined and painted with elegant medallions on the doors. Price 2000 S.R. [sicca rupees] Also a very handsome new Buggy and harness with a remarkable quick Trotting Horse. Price 1000 S.R.

ছাপা বই হলেও প্রায় পুঁথির পাতার মতো বিবর্ণ একটি অষ্টাদশ শতাব্দীর ঘোড়ার গাড়ির ক্যাটালগ আছে বিড়লা শিল্প ও কারিগরি সংগ্রহালয়ের গ্রন্থাগারে। আখ্যাপত্র নেই, কিন্তু প্রতি পাতাতেই রয়েছে নির্মাতার নাম : মগার্ন অ্যান্ড কোম্পানি, লন্ডন। কিন্তু তার চেয়েও আকর্ষণীয়, তালিকাটির পাতায়-পাতায় স্টুয়ার্ট অ্যান্ড কোম্পানির রাবার স্ট্যাম্প আর আবছা পেনসিলের হরফে

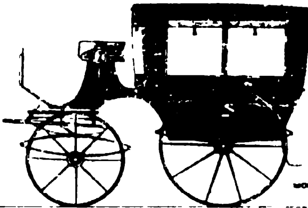
পুরনো ক্যাটালগ থেকে



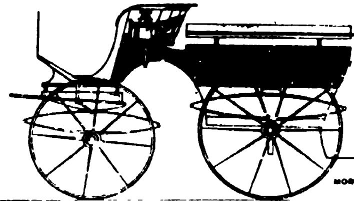

PATENT OCC SPRING SOCIABLE



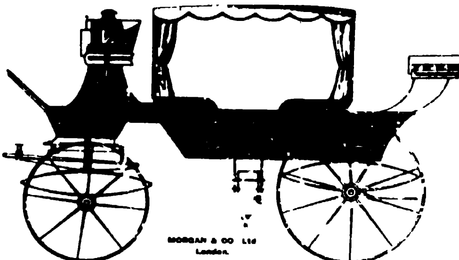

LARGE OMNIBUS WITH REMOVABLE HEAD



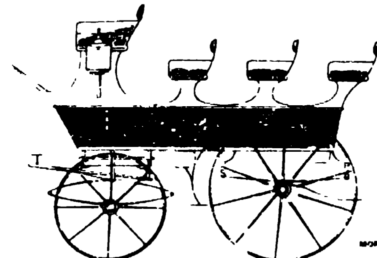

SMALL CIRCULAR FRONT OMNIBUS WITH REMOVABLE HEAD



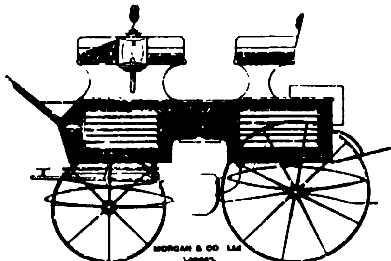

RAISED STANHOPE FRONTED WAGGONETTE



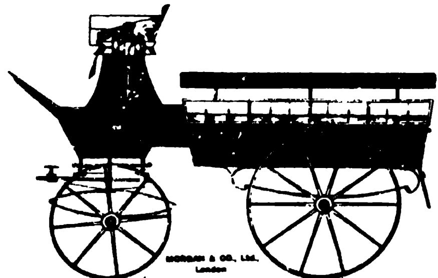

CHAR-À-BANC WITH REMOVABLE CANOPY TOP




CHAR-À-BANC TO SEAT ELEVEN PERSONS

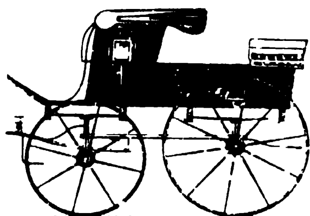



CHAR-À-BANC TO SEAT EIGHT PERSONS.



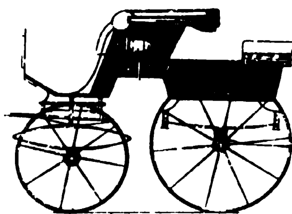

BODY BREAK.

পুরনো ক্যাটালগ থেকে



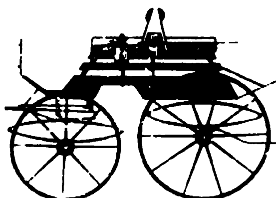
FULL SIZE PERCH MAIL PHAETON

ON EIGHT SPRINGS

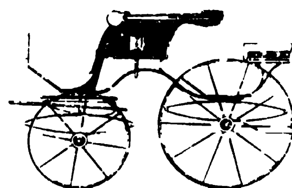



DEMI MAIL PHAETON

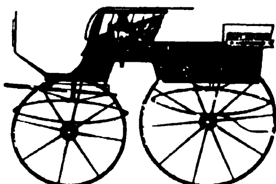
ON [illegible] SPRINGS



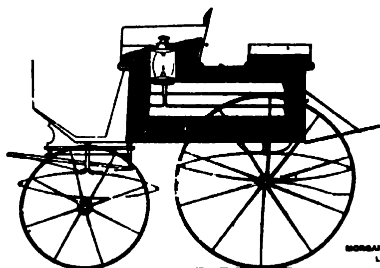

DOG CART PHAETON



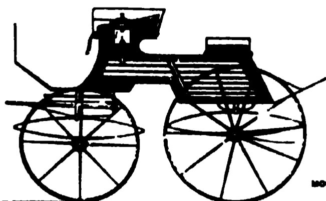

SPIDER PHAETON



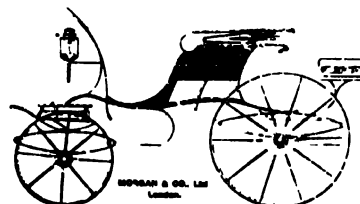

STANHOPE PHAETON




DOG CART PHAETON

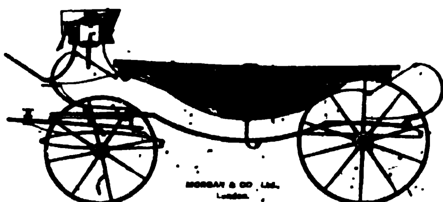



DOG CART PHAETON

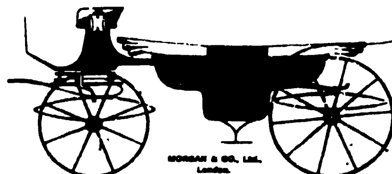



LADY'S DRIVING PHAETON

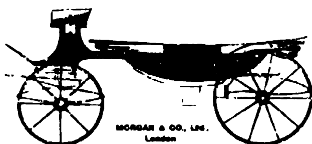
পুরনো ক্যাটালগ থেকে



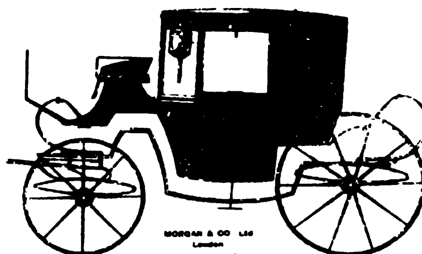
OEE AND UNDER SPRING CANOE LANDAU.



SMALL ELLIPTIC SPRING LANDAU.



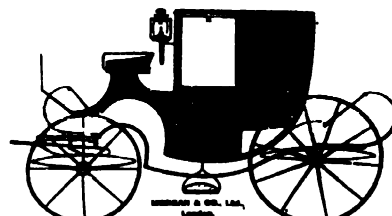
MINIATURE CANOE LANDAU.



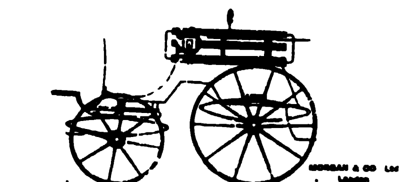
CEE & UNDER SPRING DOUBLE BROUGHAM



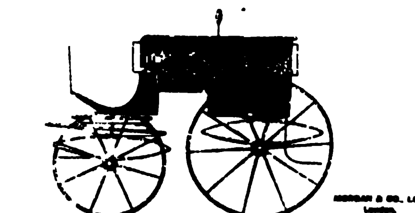
SQUARE FRONTED DOUBLE BROUGHAM



OEE AND UNDER SPRING D'ORSAY BROUGHAM.

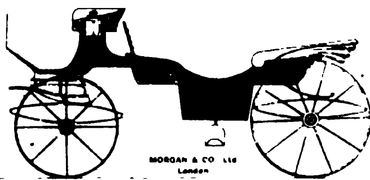


"THE ASCOT."

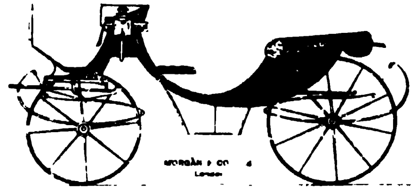


"THE STANLEY."

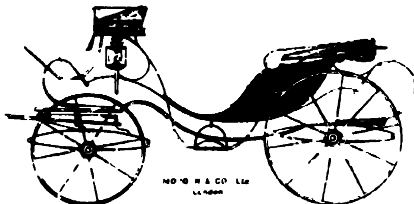
পুরনো ক্যাটালগ থেকে



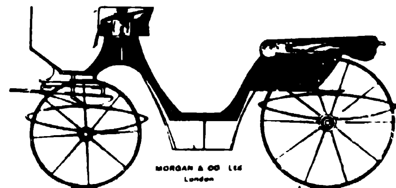
SMALL ELLIPTIC SPRING SOCIABLE



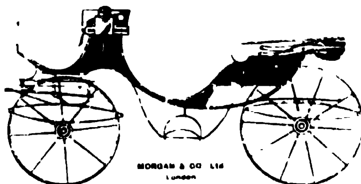
PATENT CEE SPRING CANOE VICTORIA



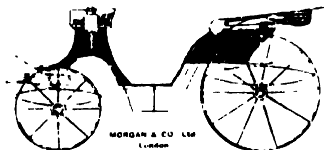
CEE AND UNDER SPRING VICTORIA



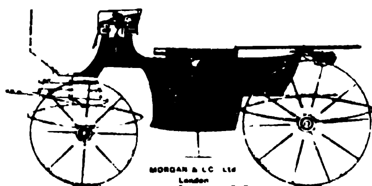
FRENCH DESIGNED VICTORIA



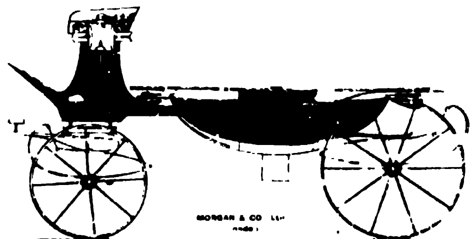
SKELETON SEAT VICTORIA



COB SIZE VICTORIA



"THE SPECIAL"



LARGE PATENT CEE SPRING CANOE LANDAU

দাম। এই ক্যাটালগ দেখিয়ে তাঁরা অর্ডার সংগ্রহ করতেন। অর্ধশতাধিক মডেলের ঘোড়ার গাড়ির মধ্যে কিছু নির্বাচিত ছবি এখানে ছাপা হয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বিলাসবহুল গাড়ি 'সি অ্যান্ড আন্ডার স্প্রিং ক্যানো ল্যান্ডো'র দাম ছিল তিন শো গিনি আর সবচেয়ে সস্তা 'অ্যাস্কট'-এর পঞ্চান্ন। বোঝা যায়, কলকাতায় এখন যত মডেলের মোটর গাড়ি চলে, বৈচিত্র্যে ঘোড়ার গাড়ি তাকে হার মানাতে পারতো।

স্টুয়ার্ট কোম্পানি তাদের দক্ষতাকে প্রয়োজনমতো ভিন্ন কাজেও নিযুক্ত করতে পেরেছিল। হাওড়া থেকে পান্ডুয়া অবধি স্থাপিত প্রথম রেলপথে চলার জন্য কামরাগুলি আসছিল 'এইচ· এম· গুডউইন' জাহাজে। কলকাতার কাছে স্যান্ড হেড্-এ জাহাজটির সলিল সমাধি হয়। তখন স্টুয়ার্ট কোম্পানি ও কলকাতার আর-একটি কোচ-নির্মাতা, সিটন কোম্পানি হাত লাগায় রেলের কামরা তৈরির কাজে।[৬] কাজেই ১৮৫৪ খ্রীস্টাব্দে কলকাতার প্রথম রেলযাত্রীরা এই দুই ঘোড়ার গাড়ি-নির্মাতাদের তৈরি কামরায় বসেই পাড়ি দিয়েছিলেন। আর রামগোপাল ঘোষও নিশ্চয় ওই রেলপথ উদ্বোধনের দিনে এরকমই একটি কামরা বন্ধু-পরিজনবর্গ-সহ পুরো রিজার্ভ করেছিলেন।[৭]

১৮৪৯-এ পূর্বোক্ত সিটন কোম্পানির একটি মজার বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় বাংলা কাগজে :[৮]

সিটন কোং গাড়ী নির্ম্মাণ কর্ত্তা।
কসাইটোলা ৫ ও ৬ নং বাটী।

উক্ত সাহেবানেরা সাধারণের নিকট যে সাহায্য
প্রাপ্ত হইয়াছেন তজ্জন্য তাঁহারদিগের নিকট
কৃতজ্ঞতা স্বীকার পূর্ব্বক জ্ঞাপন করিতেছেন
যে তাঁহারা পূর্ব্বের ন্যায়ই সুলভ মূল্য
লইতেছেন, যাহা কলিকাতায় তাঁহাদের
ন্যায় কর্ম্মচারি অন্যান্যের নিয়মিতমূল্য
অপেক্ষা অনেক সুলভ, এবং প্রার্থনা
করিতেছেন যে তাঁহারদিগের কারখানায়
যেসকল গাড়ী ইত্যাদি উপস্থিত আছে
সাধারণে আগমন করিয়া তাহা দৃষ্টি
করেন, সেই সকলই উত্তম দ্রব্য দ্বারা
মনোনীত পূর্ব্বক নির্ম্মিত হইয়াছে। আর
কম্যিসনে বিক্রয়ার্থ তাঁহারদিগের নিকট কিঞ্চিৎ
ব্যবহৃত অনেক পালকী ও অন্যান্য প্রকার গাড়ী
ও পশ্চিমাঞ্চলে ডাকে গমনের গাড়ী আছে।

১৮৮৩-'৮৪ সালে কলকাতার আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে দেশী-বিদেশী নানা সংস্থার ঘোড়ার গাড়ি ছিল। প্রদর্শনীর ক্যাটালগে মুদ্রিত হয়েছিল স্টুয়ার্ট কোম্পানির বিজ্ঞাপন।[৯]

স্টুয়ার্ট কোম্পানির পরেই তখন দু' নম্বর নাম ডাইক্স অ্যান্ড কোম্পানির। ক্যানো ল্যান্ডো, অ্যাঙ্গুলার ল্যান্ডো, ক্যানো বারুশ, মিনিয়েচার ব্রুহাম, মাইলর্ড ফিটন, রিপন ফিটন, সি স্প্রিং বগি, নিউ

মার্কেট কার্ট ইত্যাদি প্রদর্শন করেছিল তারা।[১০]

অংশগ্রহণকারী বিদেশী নির্মাতাদের মধ্যে ছিল অ্যাটকিন্‌সন অ্যান্ড ফিলিপসন ও ম্যাকনট অ্যান্ড স্মিথ কোম্পানি।[১১]

দেশী নির্মাতাদের মধ্যে ছিলেন মুনরুদ্দীন (Munro Don) এবং ও· বি· দে। শেষোক্ত কোম্পানি অবশ্য পুরো গাড়ি নয়, উন্নত ধরনের চাকা প্রদর্শন করেছিলেন, বগি গাড়ির স্পাইডার-চাকা।[১২]

কোচ বিল্ডার্স হিসেবে উনিশ শতক থেকেই বাঙালি কোম্পানিরাও নেমে পড়ে। ১৮৮৯-এ 'দা বেঙ্গলি' তে প্রকাশিত হয় চাকা-বিশেষজ্ঞ তালতলার ইউ· এন· ব্যানার্জি অ্যান্ড কোম্পানির বিজ্ঞাপন[১৩] :

U. N. Banerjea & Co.
Coach Builders and order-suppliers
Specialist in Wheels.
Taltollah
Calcutta
Undertake to repair and build carriages of
all descriptions at a moderate rate with all
the greatest possible care. Trial solicited.

এক বছর বাদে ১৭ অক্রূর দত্ত লেনের কোচ-বিল্ডার্স জি· সি· দে· অ্যান্ড কোম্পানি বিজ্ঞাপন দিচ্ছে যে, তারা অর্ডারমাফিক গাড়ি বানায় ও সারায়। সবচেয়ে ভাল উপাদান ব্যবহার করে। কুশলতাও অনিন্দ্য। আরও মজার কথা, তারা বাৎসরিক চুক্তিতে চাকায় তেল (বা গ্রিজ) দেওয়ার ঠিকা নেয়। চার চাকার গাড়ির জন্য বছরে দশ ও দু' চাকার জন্য ছ' টাকা। বিজ্ঞাপনে দুই বিশিষ্ট নাগরিকের প্রশংসাপত্র থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছিল। ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়ের চিফ পে-মাস্টার আর· ব্যাটারবি তাঁর অফিস-যান ও এ· বি· স্ট্রদার্স নামে আরেক সাহেব তাঁর ব্রুহাম মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নির্ভর করতেন দে কোম্পানির উপর।[১৪]

দে কোম্পানি আজ আর নেই, কিন্তু ওয়েলিংটন স্ট্রিট থেকে অক্রূর দত্ত লেনে ঢুকে বাঁ দিকে তাহালে এখনও চোখে পড়ে, জরাজীর্ণ বাড়ির গায়ে ভুল বানানে ভরা মার্বেলের ফলক :

A.C. GHOSH & CO.
COACH BUILDERS
BY APPOINMENT
HIS EXCELLIENCY
THE VICEROY AND GOVERNOR
OF BENGAL

বাড়িটির তোরণ-শীর্ষে ঢালাই-লোহার সিংহ ও হাতি একটি রাজকীয় কোনো পদকজাতীয় কিছু ধরে দাঁড়িয়ে আছে।

উনিশ শতকের আরও কিছু দেশী কোচ-মেকার্সদের নাম জানা যায়[১৫] :

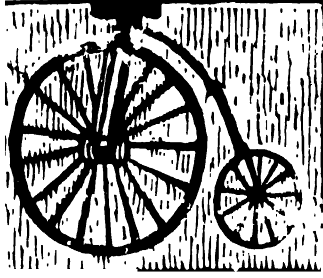
নানভাই ধুনজি অ্যাণ্ড কোং : ২১ ধর্মতলা স্ট্রিট

শেখ মকসুদ আলি : লোয়ার সার্কুলার রোড

হরিশচন্দ্র বোস : লোয়ার সার্কুলার রোড

ফিটন, ব্রুহাম, ল্যাণ্ডো, ভিক্টোরিয়া, ব্যারুশ, গিগ ইত্যাদি হরেক ধরনের বিদেশী ধাঁচের ঘোড়ার গাড়ির মধ্যে কলকাতার নিজস্ব কয়েকটি মডেলও ছিল। কেরাঞ্চি, ছ্যাকরা ও পালকি গাড়ি ছাড়াও 'ব্রাউনবেরি' ও 'গ্রিনফিল্ড'। শেষের গাড়িদুটির উদ্ভাবক ব্রাউনলো ও গ্রিনফিল্ড কলকাতায় বসেই এই কীর্তি করেন।[১৬]

হাওয়া গাড়ি অধ্যায়ে স্টুয়ার্ট ও ডাইক্স কোম্পানির কথায় আবার ফিরে আসতে হবে।



# কলকাতায় চাকা ও প্রসন্নকুমার ঘোষ

ডমরু-স্রষ্টা ত্রৈলোক্যনাথের গল্পে আমরা দেখি বা-সিক্‌ল বা বাইসাইকেল নয়, শুধু চাকায় চড়া বললেই যা বোঝায়, বুঝে নিত লোকে।

সাইকেলের আদিপুরুষ 'ভেলোসিপেড্'-এ চাকা ঘোরানোর জন্য চেন বা প্যাডেলের ব্যবস্থা ছিল না। আরোহী তাতে চড়ে মাটিতে পা ঠেকিয়ে, পায়ের চাপে ঠেলে-ঠেলেই অগ্রসর হত।

১৮৬৭-'৬৮ নাগাদ বর্ধমানের মহারাজা এই ধরনের তিন চাকার একটি সাইকেল আনিয়েছিলেন। তার হদিস পাওয়া যায় ১৮৬৯-এর ১৮ ফেব্রুয়ারি 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় প্রকাশিত একটি খবর থেকে। ১৮৭১ সালের জুলাই মাসে 'সুলভ সমাচার' খবর দেয়, "বছর দুই হইল, কলিকাতায় দুই চাকার ও তিন চাকার এক রকম গাড়ি আসিয়াছে, যাহার উপর চড়িয়া পা নাড়াইলেই গাড়ির মতো দৌড়ায়।" বোঝা যায় এখানে প্যাডেলওলা সাইকেলের কথাই বলা হচ্ছে। কিন্তু এর চেয়েও অবাক-করা খবর ওই কাগজেই বেরিয়েছিল ১৮৭৯ খ্রীস্টাব্দে (১৫ অগ্রহায়ণ ১২৭৭) :

"কলিকাতায় অনেকে দেখিয়া থাকিবেন তিন চাকার এক রকম গাড়ী আছে, তাহা ঘোড়ায় টানে না, যিনি চড়েন তাঁহাকে দুই পা দিয়া চাপ দিতে হয়, আর গাড়িখানি ঘোড়ার গাড়ী অপেক্ষাও দৌড়িয়া চলিয়া যায়। সম্প্রতি সাঁতরাগাছিতে একজন কর্ম্মকার বুদ্ধি খাটাইয়া একখানি সেই রকম গাড়ী প্রস্তুত করাইয়াছেন। তাহাতে অগ্রে একজন এবং পশ্চাতে দুই জন পা দিয়া চাকা ঘুরাইতে থাকে এবং গাড়ীখানি আপনা-আপনি চলিয়া যায়। আমাদের দেশের লোকে যদি একটু চেষ্টা করে, তবে তাহারা কত কল অনায়াসে গড়িতে পারে।"

সপ্তাহ কয়েক পরে ৬ই পৌষ 'সুলভ সমাচার' সাইকেল-নির্মাতার নামটিও জানিয়ে দিয়েছিল, "আমরা যে লিখিয়াছিলাম একজন সাঁতরাগাছির কামার একখানি নূতন রকমের গাড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছেন, শুনা গেল যে বাবু প্রসন্নকুমার ঘোষ তাহা প্রস্তুত করিয়াছেন।"

প্রসন্নকুমার ঘোষের তৈরি প্রথম ভারতীয় সাইকেলটি কারিগরি পরিভাষায় 'ট্যান্ডেম' গোত্রের সাইকেল, অর্থাৎ যেটি একাধিক সওয়ারির সম্মিলিত প্রয়াসে ধাবমান হয়।

তিন চাকার সাইকেলে চড়ে এখন যদি কোনো অ্যাডাল্ট কলকাতার রাস্তায় বের হয় তার মাথার 'ইস্ক্রুপের' অবস্থা নিয়ে চিন্তা হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু খ্যাতনামা বাঙালিদের মধ্যে সেকালে অনেকেই ট্রাইসাইকেল চড়তেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্বন্ধে অসিতকুমার হালদার 'রবিতীর্থ' গ্রন্থে

লিখেছেন, "তখন নতুন-নতুন সাইকেল উঠেছে, বড়দাদা মহাশয় ব্রাউন পেপারে জামা তৈরী করে সাইকেল চড়ে সারা চৌরঙ্গী পরিভ্রমণ করেছিলেন ।"

ভিন্ন বেশে দ্বিজেন্দ্রনাথের ট্রাইসাইকেলের চড়ার আরেকটি গল্প শুনিয়েছিলেন হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ।[১] তিনি লিখেছেন যে, শৌখিন বাঙালি সমাজে প্রথম যাঁরা তিন চাকার পা-গাড়ি ব্যবহার আরম্ভ করেন তাঁদের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রনাথ অন্যতম । দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তখন পার্ক স্ট্রিটের একটি বাড়িতে থাকতেন । দ্বিজেন্দ্রনাথ রোজ সকালে জোড়াসাঁকো থেকে ট্রাইসাইকেলে চৌরঙ্গী পেরিয়ে সেখানে আসতেন । "পাজামা পরা—চাপকানচোগাধারী—মাথায় পাগড়ী ; যাহাকে 'ফুল ড্রেশ' বলে তাহাই ।..... দ্বিজেন্দ্রনাথ ঐ বেশে যখন গড়ের মাঠের পাশ দিয়া গাড়ীতে যাইতেন, তখন তাঁহার শ্মশ্রুরাজি অবাধে উড়িতে থাকিত ।"

'বঙ্গবাসী'র যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু ছিলেন বিশাল-বপু । ট্রাইসাকেলে চড়ার শখ হলে তিনি নিজের ওজন জানিয়ে ইংলন্ডের কোনো কারখানা থেকে একখানা সাইকেল তৈরি করিয়ে আনিয়েছিলেন । দু-চার দিন চড়ার পরেই তাঁর শখ মিটে যায়, তখন বিক্রির জন্য কাগজে বিজ্ঞাপন দেন । বিজ্ঞাপন দেখে সুরেশচন্দ্র সমাজপতি জিগ্যেস করেন, হঠাৎ বিক্রি করার কারণ কি ? যোগেন্দ্রচন্দ্র বলেছিলেন, হ্যারিসন রোড চওড়া রাস্তা, সেই রাস্তার ধারে বাড়ি করার পর তিনি ভেবেছিলেন, ওই সাইকেলে চড়ে বেড়াবেন । কিন্তু দেখলেন, তিনি ও তাঁর সাইকেল, রাস্তায় এই দুইয়ের স্থান হওয়া দুষ্কর । কথিত আছে, যোগেন্দ্রচন্দ্রকে ওই সাইকেলে চড়তে দেখলেই পাড়ার ছেলেরা হাততালি দিয়ে হাসত ।[২]

দ্বিচক্র-যানের মধ্যে কিম্ভূত ধরনের একটি জিনিস প্রথম কলকাতায় আমদানি করা হয় । ইংরেজিতে তাদের নাম 'পেনি-ফার্দিং'—বাংলায় স্বচ্ছন্দে 'পাই-পয়সা' বা 'সিকি-আটআনি' নামকরণ করা যায় । এই সাইকেলের দুটি চাকা আকারে সমান নয় । সামনের চাকাটি হতো পেল্লাই, আর পিছনেরটি বেশ ছোট ।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ও স্বর্ণকুমারী দেবীর পুত্র জ্যোৎস্নানাথের এইরকম পেনি-ফার্দিং চড়ার বিবরণ দিয়েছেন ইন্দিরা দেবী[৩] ।

"দুই ভাইয়ে মিলে সেকালের সেই পুরনো মস্ত উঁচু বাইসিক্লে জোড়াসাঁকোর গলি দিয়ে যাচ্ছেন । এমন সময় এক বুড়ি চুনের বস্তা নিয়ে আগে-আগে যাচ্ছে । জ্যোৎস্নাদা তার ঘাড়ে গিয়ে পড়ে তাকে ফেললেন, নিজেও পড়লেন, তাঁর দেখাদেখি সুরেনও পড়ে গেলেন । পরে বুড়ি উঠে গা ঝেড়েঝুড়ে পিছন দিকে ঘুরে শুধু 'সঙ' এই কথাটি শ্লেষের সুরে উচ্চারণ করে দু' ছেলেকে অপ্রস্তুত করে দিয়ে চলে গেল ।"

১৮৮৩-'৮৪ সালে কলকাতার আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে ইংলন্ডের কভেন্ট্রির দুই বিখ্যাত সাইকেল নির্মাতা অংশ নিয়েছিল—কভেন্ট্রি মেসিনিস্ট'স কোম্পানি ও সিংগার অ্যান্ড কোম্পানি । প্রদর্শনীর মুদ্রিত তালিকা থেকে সে-যুগের বিচিত্র ধরনের নানা বাই ও ট্রাইসাইকেলের কথা জানা যায় ।

প্রথম কোম্পানি 'স্পেশাল ক্লাব', 'ক্লাব' ও 'ইউনিভার্সাল ক্লাব' নামে তিন ধরনের বাইসাইকেল তৈরি করত, আর ট্রাইসাইকেল ছিল পাঁচ রকম মডেলের । এর মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয় Cheylesmore নামে ত্রিচক্রযান যা স্বয়ং প্রিন্স অফ ওয়েলসও ব্যবহার করেছেন । দু'জনে মিলে চালাবার উপযোগী এই যন্ত্রের স্টিয়ারিং ছিল পশ্চাতমুখী । তখনো ফ্রি হুইলের প্রবর্তন



পেনি-ফার্দিং চড়ে স্টিভেন্স

হয়নি তাই বিশেষ ধরনের ক্লাচের সাহায্যে সাইকেল চালু থাকার সময়ও নিশ্চল পেডালে পা রাখার ব্যবস্থা করার কথা নির্মাতা উল্লেখ করেছিলেন। এ-ছাড়াও আরও তিন ধরনের দু'জনে চালাবার উপযোগী ট্রাইসাইকেল ছিল।[৪]

সিংগার কোম্পানির বাইসাইকেলের তিনটি মডেল—'ব্রিটিশ চ্যালেঞ্জ', 'রয়েল চ্যালেঞ্জ' ও 'এক্সট্রাঅর্ডিনারি চ্যালেঞ্জ'। তাদের ট্রাইসাইকেলের মধ্যে 'অ্যাপোলো' ও 'ট্যান্ডেম'-এ দু'জন করে চড়তে পারত। 'কেরিয়ার' ট্রাইসাইকেলে দুই, তিন এমনকি চারজন চড়ার ব্যবস্থা ছিল। আরোহীদের মধ্যে এক বা দু'জনকে প্যাডেল করতে হতো। মাল বহনেরও ব্যবস্থা ছিল। 'ভেলোসিম্যান' ট্রাইসাইকেলটিতে আবার হাতে করেও প্যাডেল ঘোরাবার আয়োজন।[৫]

১৮৮৮ নাগাদ কলকাতায় ঢেঙা পেনি-ফার্দিং সাইকেল আরোহীর সংখ্যা আঙুলে গোনা যেত। হ্যারি হব্‌স পেনি-ফার্দিংকে 'স্পাইডার মেশিন' বলে উল্লেখ করে জানাচ্ছেন, পাইলট কাজিন্স, ফ্রেড পাওয়ার, হোয়াইটওয়ে লেড্‌ল-র টার্নার, সি· ডব্লিউ· ওয়াল্‌শ, বিলি ব্র্যাড্‌শ, হ্যামিলটনের ওয়াল্টার

ডেভিস ও আর· ডব্লিউ· এস· মিচেল ছাড়া কেউ তখন কলকাতায় এসব জিনিস ব্যবহার করতো না। ১৯১৮-য় হব্‌স যখন এসব লিখছিলেন তখনও নাকি ৮ নং ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিটের সিঁড়ির ধারে ওয়াল্টার ডেভিসের সাইকেলটি দেখা যেত।[৬]

সাইকেলে প্রথম বিশ্বপর্যটন করেন আমেরিকার টমাস স্টিভেন্স। তাঁর সাইকেলটি ছিল পোপ কোম্পানির তৈরি 'কলম্বিয়া অর্ডিনারি'। সামনের চাকাটির ব্যাস পিছনটির চারগুণ। নিউইয়র্ক থেকে যাত্রা শুরু, আটলান্টিক পেরিয়ে কুইন্স টাউন, সেখান থেকে ডাবলিন। তারপর লিভারপুল হয়ে ইউরোপ ভ্রমণ শেষ করে পারস্য। পারস্য থেকে আফগানিস্তান ও পেশোয়ার হয়ে ১৮৮৬-র আগস্ট মাসে ভারতে প্রবেশ।

স্টিভেন্সের ভ্রমণকাহিনী থেকে জানা যায়, কানপুর ও এলাহাবাদের ভারতীয় ডাকঘরকর্মীদের একাংশ তখন আলিগড়ের ডাক-কারখানা থেকে সরবরাহ-করা সাইকেল চড়ত। কিন্তু সেসব সাইকেল মান্ধাতার আমলের নকশা অনুযায়ী তৈরি। অপ্রীতিকর চালচলন। এলাহাবাদে একটি ছোট সাইকেল ক্লাবের অস্তিত্বের ও বেনারসের দুই উৎসাহী সাইকেল-চালক উইনগ্রেড ও গক্-এর নাম জানা যায় তাঁর বৃত্তান্ত থেকে।

১৮৮৬-র ১৩ থেকে ১৭ সেপ্টেম্বর কলকাতায় কাটিয়েছিলেন তিনি। ডালহাউসি অ্যাথলেটিক ক্লাবের বাইসাইকেল শাখার সতেরজন সদস্য তাঁর সঙ্গে একদিন ময়দানে শুভেচ্ছা-মিছিলে যোগ দিয়েছিলেন।[৭]

হ্যারি হবসের পূর্বোক্ত রচনায় উনিশ শতকের কলকাতার সাইকেল-প্রেমিকদের অনেক খোশ খবর আছে।

আর· ডব্লিউ· এস· মিচেলের দুই পরমা সুন্দরী কন্যা নাকি কলকাতার প্রথম সাইকেল আরোহিনী। অবশ্য তখন 'সেফটি সাইকেল' এসেছে।

হবসের বন্ধু ব্র্যাডশ একদিন হেস্টিংসের ক্লাইভ রো দিয়ে যাচ্ছিলেন সাইকেল চড়ে। দৃশ্যটি একটি ষাঁড়ের পছন্দ হয়নি। সে পিছনের চাকার স্পোকের মধ্যে শিং গলিয়ে সাইকেলটিকে উঁচু করে ধরে, দেখতে চায়, তার ফল কি হয়। আরোহী ছিটকে গিয়ে, পথের পাশের বেড়া টপকে হার্বার মাস্টারের ছোট হাজরি টেবিলের উপর অবতরণ করেন। কিন্তু ব্র্যাডশ মোটেই প্রাতরাশে নিজেকে আমন্ত্রণ জানানোর এই রীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন না।

প্রথম যুগের সেফটি সাইকেলও খুব মজবুত ছিল না। বাথগেটের ড্যান ডিউয়ার সেদিন নিরেট রবারের চাকাওলা সাইকেলে চড়ে, কাঁধে রাইফেল ও বেয়োনেট ঝুলিয়ে চলেছেন। স্কট টমসনের মোড়ে, ট্রাম লাইন পেরোবার সময় সাইকেলটা হঠাৎ একেবারে দু' টুকরো হয়ে গেল। মুখ থুবড়ে পড়লেন তিনি। সাইকেলের পিছনের চাকাটা নির্দ্বিধায় তাঁর পিঠের উপর দিয়ে গড়িয়ে গেল। কান্ড দেখে হবস হাসি চাপতে পারেননি। কিন্তু তারপরেই দেখা গেল ডিউয়ার বেয়োনেট উঁচিয়ে তেড়ে আসছেন। হবস পালিয়ে বাঁচলেন।

হাওয়া-ভরা নিউমেটিক টায়ার প্রথমদিকে খুব জনপ্রিয় হয়নি। কারণ সেকালে এই ধরনের টায়ার বলতে ছিল, চাকার রিমের ওপর ক্যানভাস জড়ানো একটা টিউব। সাইকেল ব্যবসায়ী স্ট্যানলি ওকস প্রথম এই ধরনের চাকাওলা একটা সাইকেল কলকাতায় আনান। এবং সেটি নিয়ে প্রচুর যন্ত্রণা পোয়াতে হয়। পাংচার হলে মেরামত করার মতো লোকই বলতে গেলে ছিল না। গ্রেট ইস্টার্ন

হোটেলের একটি পোলিশ পাচক তখন ছিদ্র-পিছু পাঁচ টাকা নিয়ে পাংচার সারাত। আসলে হোটেলে কাজ করত বলে ইন্ডিয়া রাবারের তৈরি তামাকের থলি কেটে তাই দিয়ে তালি দেওয়ার সুযোগ ছিল তার।

পুস্তক-বিক্রেতা নিউম্যান কোম্পানির ব্রাইনিং এক সময়ে উনিশ শতকের বাইসাইকেল ক্লাবের সেক্রেটারি ছিলেন। ক্লাবের সদস্যরা পঞ্চাশ মাইল ব্যাসার্ধের একটি বৃত্তপথে কলকাতাকে ঘিরে চক্কর মারতেন। ঘোড়া বা গরু-মোষের নালে টায়ার প্রায়ই পাংচার হতো। ব্রাইনিং ক্লাবের বেয়ারাদের বললেন, গড়ের মাঠের রাস্তা থেকে তারা যদি নাল কুড়োয়, এক-একটার জন্য এক পয়সা করে বকশিশ দেবেন। দেখা গেল প্রতিদিন অগুনতি নাল সংগ্রহ হচ্ছে। অনুসন্ধানে শেষ পর্যন্ত প্রকাশ পেল, পাইকারি দামে নাল কিনে তারা তাই দেখিয়ে বকশিশ আদায় করছে।

কলকাতার সাহেবরা ১৮৯৭-এর মে মাসে ডালডাইসি ইনস্টিটিউটে এক সভা করে 'বেঙ্গল সাইক্লিস্ট অ্যাসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠা করেন। সভাপতি, কলকাতা হাইকোর্টের স্যার উইলিয়াম ম্যাকফারশন। কমিটির সাধারণ সদস্যদের মধ্যে অনেক নামীদামীরা ছিলেন—এ· এ· আপকার, স্যার অ্যালান আর্থার, জেনারেল স্যার ইয়ান হ্যামিলটন, এইচ· ই· ব্রাইনিং, স্ট্যানলি ওক্‌স ও ডব্লুউ· এস· বার্ক, পরবর্তীকালে যিনি ইংলন্ডের সাইক্লিস্ট'স ইউনিয়ন ট্যুরিং ক্লাবের সদস্য হন।

সে-সময়ে সাইকেল চড়া একটা ফ্যাশনে দাঁড়িয়েছিল। টালিগঞ্জ ক্লাবে সান্ধ্যভোজে যোগ দিতে পুরুষ ও মহিলারা, সবাই সাইকেলে চড়ে যেতেন। সাইকেল রেসও প্রায়ই হতো। স্ট্যানলি ওক্‌স, ব্রাইনিং, এ· কে· অ্যাফ্‌লেক, সি· ডব্লিউ ইভ্‌স ও আরও অনেকে নিয়মিত এইসব প্রতিযোগিতায় অংশ নিতেন।

১৮৯৭-এর জুন মাসে ফস্টার ফ্রেজার, তাঁর দুই সহচর লুন ও লো-কে নিয়ে কলকাতায় পৌঁছন। বেশ কিছুদিন আগে থেকেই 'ইংলিশম্যান' পত্রিকায় ফ্রেজারের বিশ্বপর্যটনের বৃত্তান্ত নিয়মিত ছাপা হচ্ছিল। কলকাতায় আসা-মাত্র শোরগোল পড়ে তাঁদের নিয়ে।

অভ্যর্থনা জানাবার জন্য এক স্পেশাল ট্রেনে চড়ে কলকাতার ২৬৫ জন সাইকেল-বিলাসী বালি স্টেশনে হাজির হলেন। সেই দলে ছিলেন ইংরেজ কর্নেল থেকে চীনা সূত্রধর।

বার্ক ও ব্র্যাডশ চন্দননগরে অভিযাত্রীদের সঙ্গে যোগ দেন ও তাঁরা সবাই মিলে সাইকেলে কলকাতা অবধি আসেন। পর্যটকদের মধ্যে একজনের বসন্ত হয়েছিল, তিনি পরে কলকাতায় পৌঁছন। বালি ব্রিজ থেকে প্রিন্সেপ ঘাট অবধি সেদিন যাত্রাপথের দু'ধারে কড়া পুলিশ পাহারা ছিল। কলকাতায় এই তিন পর্যটকের জন্য ভলান্টিয়ার হেড-কোয়ার্টারে এক 'বড়া খানা' দেওয়া হয়। খাওয়ার ঘরের দেওয়ালটি তখন অভিনব ভাবে পঞ্চাশটি সাইকেল ঝুলিয়ে সজ্জিত করা হয়েছিল।[৮]

এবার বাঘা-বাঘা ক'জন বাঙালি সাইকেল-প্রেমিকের কথা। তিন 'স্যার' ও হেমেন্দ্রমোহন বোস। তিন 'স্যার' বলতে জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র ও নীলরতন সরকার।

১৮৯৭ সালে জগদীশচন্দ্রের লেখা পদার্থবিদ্যা সংক্রান্ত গবেষণা খাতার মধ্যে কয়েকটি মূল্যবান পাণ্ডুলিপি খুঁজে পাওয়া গেছে কিছুদিন আগে। তার মধ্যে জগদীশচন্দ্রের বাইসাইকেল সংক্রান্ত বাংলা রচনার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করছি, "....যে জিনিসটাকে এক মুহূর্ত খাড়া রাখা যায় না একজন মানুষ তাহার উপর উঠিয়া বায়ুবেগে গমন করিতেছে ইহাতে লোকের কৌতুহল হইবার কথা নয়ত কি? অল্পদিন হইল এদেশে বাইসিকেল প্রচলিত হইয়াছে তাহাতেই এত লোকের সখ হইয়াছে।

বিলাতে তাহা হইলে ব্যাপারখানা কি তাহা বোঝা কঠিন হইবে না। সেদেশে বাইসিকেলের এত ব্যবহার যে বিলাতে ও আমেরিকাতে কোটী-কোটী টাকার কারবার চলিতেছে। পৃথিবীর মধ্যে আর কোনো জিনিসের এতবড় কারবার নাই।....কেবল সখ ছাড়া ইহাতে কাজের অনেক সুবিধা হয়। বিলাতে অনেক রকম কাজে বাইসিকেল ব্যবহার হয়।....ডাকপিয়নেরা বাইসিকেলে চড়িয়া চিঠি বিলি করে, দাসীরা বাজার করিয়া আনে। এইরূপ বাইসিকেলে লোকের কত সুবিধা করিয়া দিয়াছে। আমাদের দেশেও....অফিসে লোকেরা বাইসিকেলে চড়িয়া তাড়াতাড়ি কাজ সারিয়া আসে।.....আজকাল বাইসিকেল আমাদের পুষ্পক রথ।"[১]

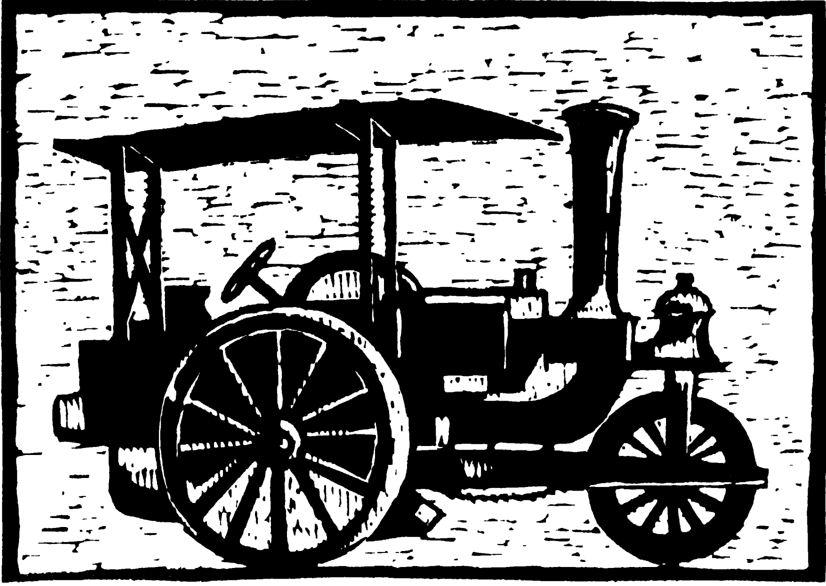
জগদীশচন্দ্র ও হেমেন্দ্রমোহনই শুধু এই পুষ্পক রথের সওয়ারি হননি। সহযাত্রী হিসেবে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, স্যার নীলরতন সরকার ও তাঁর পত্নী নির্মলা দেবী এবং আচার্য-পত্নী অবলা বসুকেও দলে টেনেছিলেন। ভোরবেলা তাঁরা সবাই মিলে সাইকেলে চড়ে গড়ের মাঠে হাওয়া খেতে যেতেন।

জগদীশচন্দ্রের ভাগ্নে বিজ্ঞানী দেবেন্দ্রমোহন বসুর রচনায় সেকালে তিন 'স্যার'-এর সাইকেল-চড়া সম্বন্ধে আকর্ষণীয় একটি বিবরণ রয়েছে : (১৮৯৬-৯৭ সালে) "ইংল্যান্ড সফরের সময় সাইকেল চালনাতেও অবলা বসু পারদর্শিতা অর্জন করেছিলেন। তাঁর স্বামী অবশ্য পূর্বেই কাজটা রপ্ত করেছিলেন। ৮৫ নম্বর আপার সার্কুলার রোডে বাস করার সময় তাঁরা প্রায় মিশনারিসুলভ আগ্রহ নিয়ে তাঁদের কয়েকজন বন্ধুকে এই শিল্প অভ্যাস করার জন্য প্ররোচিত করেন। তাঁদের অনুশীলনভূমি ছিল ৬৪/২ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটের বাড়িটির লন। জগদীশচন্দ্রের বাড়ির সঙ্গে যার ব্যবধান বলতে একটিমাত্র পাঁচিল। যোগদানকারীদের মধ্যে ডক্টর পি· সি· রায়, ডক্টর নীলরতন সরকার ও তাঁর স্ত্রী ছিলেন। আমার ধারণা তাঁদের উৎসাহ একটি শীতকালের বেশি স্থায়ী হয়নি.... ।"[১৩]

পরবর্তীকালে সেন-পণ্ডিত ও সেন-র‍্যালে নামে বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানের স্থাপক হিসাবে সুধীরকুমার সেন ভারতে সাইকেল-নির্মাণ শিল্পের প্রবর্তকের সম্মান লাভ করেছিলেন। ছাত্রাবস্থায় তিনি তাঁর প্রথম সাইকেলটি কিনেছিলেন এইচ· বোসের দোকান থেকে। 'সুধীরকুমার সেন-জীবন-চরিত' গ্রন্থে মণি বাগচির লেখায় সে-যুগের কথা ধরা আছে : "বিগত শতাব্দীর শেষভাগে কয়েকজন শিক্ষিত বাঙালীর মধ্যে সাইকেলের প্রতি আকর্ষণ বা অনুরাগ দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল ; ইঁহাদের মধ্যে গিরিশচন্দ্র শর্মা, চিত্ততোষ বসু ও হেমেন্দ্রমোহন বসু (পরবর্তীকালে যিনি 'কুন্তলীন' ও 'দেলখোস' নির্মাতা এইচ· বোস নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন) প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। আর বিখ্যাত বাঙালীদের মধ্যে যাঁহারা এই সময়ে সাইকেল চড়িতে শিখিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন স্যার নীলরতন সরকার, স্যার জগদীশচন্দ্র বসু ও স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায়। ইঁহাদের সকলেই হেমেন্দ্রমোহনের নিকট সাইকেল-চড়া শিক্ষা করেন। হেমেন্দ্রমোহন বসু হ্যারিসন রোডে একটি সাইকেল দোকানও খুলিয়াছিলেন। কলিকাতায় বাঙালীর সেই প্রথম সাইকেলের দোকান। কথিত আছে, ছাত্রাবস্থায় সুধীরবাবু তাঁহার প্রথম 'রোভার' সাইকেলটি এইচ বসুর দোকান হইতেই কিনিয়াছিলেন। দোকানটি ছিল প্রেসিডেন্সী কলেজের নিকটেই ; কলেজে পড়িবার সময় সুধীরবাবু মাঝে-মাঝে এইচ বসুর দোকানে আসিতেন এবং সাইকেল সম্পর্কে তাঁহার ঔৎসুক্যের সূচনা তখন হইতেই। সেই সময় সাইকেল চড়িয়া সর্বপ্রথম যে দুইজন বাঙালী বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করিয়া সকলকে বিস্মিত করেন তাঁহারা গিরিশচন্দ্র শর্মা ও চিত্ততোষ বসু। ইঁহারা সাইকেল চড়িয়া গয়া ও হাজারীবাগ হইয়া

রাঁচী ঘুরিয়া আসিয়াছিলেন। 'সঞ্জীবনী' পত্রিকায় বাঙালী যুবকদের এই দুঃসাহসিক অভিযানের কথা প্রকাশিত হইয়াছিল।....হ্যারিসন রোডে এইচ বসুর দোকানের পর ভবরঞ্জন মজুমদার স্ট্যান্ডার্ড সাইকেল কোম্পানী আর তরফদার ব্রাদার্সের নাম উল্লেখযোগ্য। এই সময় ধর্মতলা স্ট্রীটে প্রথম বাঙালী যিনি সাইকেল দোকান করেন তিনি হরিদাস নন্দী।"[১১]

এখন যেখানে মহাত্মা গান্ধী রোডে সেঞ্চুরী মেডিক্যাল হল, হেরম্বরচন্দ্র মৈত্রের গৃহসংলগ্ন ঐ ঘরেই ছিল এইচ বোসের সাইকেলের দোকানের শো-রুম। ঠিকানা ৬৫/১ হ্যারিসন রোড। পাশেই বেনেটোলা লেনের মধ্যে কারখানা। শুধু আমদানি আর বিক্রি নয়, স্প্রে পেইন্টিং, নিকেল প্লেটিঙ ও নানারকম মেরামতির ব্যবস্থাও ছিল। পরে হেমেন্দ্রমোহন তাঁর ভাই যতীন্দ্রমোহনের উপর এটি দেখাশোনার ভার দিয়েছিলেন। তাঁর সহকারী ছিলেন এস রায়। (থ্যাকার্স ডাইরেক্টরি ১৯০৬)। হেমেন্দ্রমোহন গ্রেট ইস্টার্ন মোটর কোম্পানি স্থাপন করার পর সেখান থেকেও সাইকেল বিক্রি হতো।[১২]



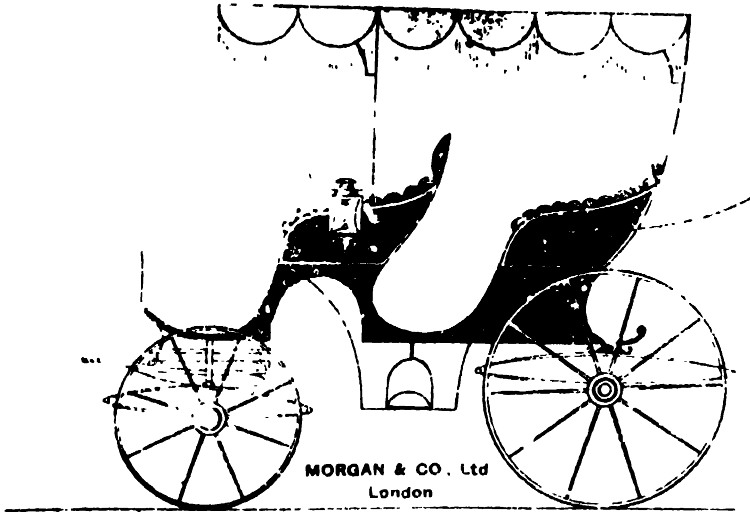
# কলের গাড়ি, হাওয়া গাড়ি ও বিপিনবিহারী দাস

কলকাতায় মোটর গাড়ি কবে আসে ? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে জানা দরকার, মোটর গাড়ি বলতে আমরা কি বোঝাতে চাই ? পেট্রল পুড়িয়ে যে গাড়ি চলে ? কিন্তু শুধু পেট্রল কেন, ইলেকট্রিক বা বাষ্পচালিত গাড়িও তো কলকাতার রাস্তায় সেই বিংশ শতাব্দীর শুরুতেই দেখা দিয়েছিল। 'অটোমোবাইল'-এর বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে যদি বিবেচনা করা যায়, তা হলে কিন্তু রাস্তায় চলার উপযোগী স্বয়ংচালিত (যন্ত্রচালিত) যে-কোনো গাড়িকেই আমরা মোটরগাড়ি নামে অভিহিত করতে পারি। সেদিক থেকে বিচার করলে ১৮৬৫ সালের মধ্যেই কলকাতায় কলের গাড়ি দেখা দিয়েছে।

১৮৬৫-র ডিসেম্বরে 'বেঙ্গলি' দৈনিক পত্রে টি· ই· টমসন অ্যান্ড কোম্পানি (১৪ এসপ্ল্যানেড রো) বিজ্ঞাপন দিচ্ছে যে, জল, কয়লা ও নিজের 'ইঞ্জিনিয়ার' সমেত পাঁচ জন আরোহীকে নিয়ে সাধারণ রাস্তা দিয়ে ঘণ্টায় ১০ থেকে ১২ মাইল স্পিডে চলার মতো 'রোড স্টিম ক্যারেজ' বিক্রি করে তারা[১] :

ROAD STEAM-CARRIAGE
Capable of running upon ordinary roads at a speed
from 10—12 miles per hour; carrying five persons,
with its own Engineer, Coals, and Water...

বছর দশেক আগেও কলকাতার রাস্তাকে সিধে করার জন্য চিমনিওলা 'রুলপেটা' বা রূপচাঁদ




হাওড়া গাড়ির অন্যতম অনুপ্রেরণা : 'সারে'

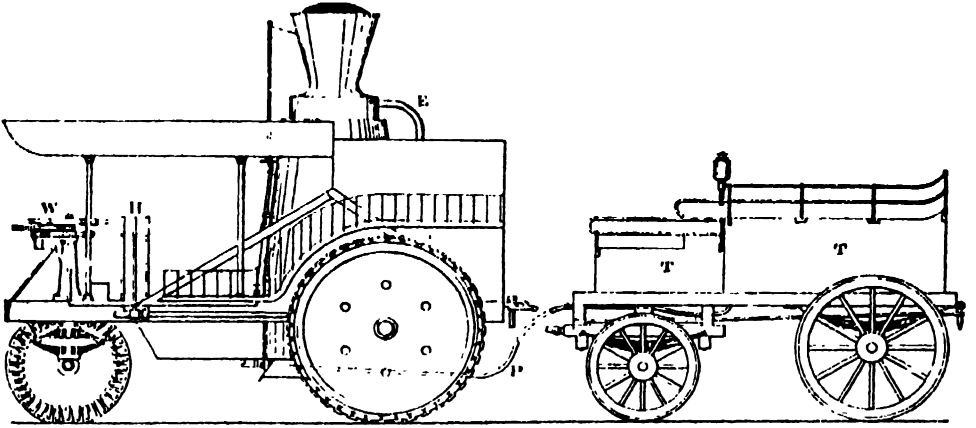
পক্ষীর ভাষায় 'কলাকৃতি ঐরাবৎ করে এক দিবসে সোজা পথ'-দের দেখা মিলত। এই স্টিম রোড রোলাররাই কলকাতার প্রথম নিয়মিত 'অটোমোবাইল'।

১৮৭৩-এ বাষ্পচালিত রোড-রোলার কলকাতায় প্রথম প্রবর্তন করেন কর্পোরেশনের ইঞ্জিনিয়ার উইলিয়াম ক্লার্ক। ১৮৬৩ সালে তিনি যখন ইংলণ্ডে যান, জাস্টিসেস অফ পীস্-রা তাঁকে একটি স্টিম-রোলার কিনে আনার অনুমতি দিয়েছিলেন। ক্লার্ক নিজের পরিকল্পনা অনুযায়ী ন'ফুট চওড়া রাস্তা সিধে করার উপযোগী ১২ টনের একটি ইঞ্জিন তৈরি করিয়ে নিয়ে আসেন। খরচ পড়ে ৬১৫ পাউন্ড। এরপরে প্যারিসের রাস্তায় ব্যবহৃত রোড-রোলারের ডিজাইন-মাফিক আর-একটি কেনা হয় ১৩,২০০ টাকায়। ১৮৭৫-এ ৭২৫০ টাকা দিয়ে একটি হালকা রোলার এবং ১৮৮৮-র আগে এরকম আরও দুটি কেনা হয়। কলের গাড়ি বলতে তখন এই ক'টিকেই দেখা যেত।[২]

কার্যকরী ভাবে বাষ্পীয় স্থলযান দিয়ে ভারতে প্রথম যাত্রী ও রসদ পরিবহণের কৃতিত্ব অবশ্য বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার আর· ই· ক্রম্পটনের প্রাপ্য।

কুড়ি বছরের তরুণ ক্রম্পটন রাইফেল ব্রিগেডের অফিসার হিসেবে ভারতে আসেন ১৮৬৫-তে। তার আগেই ইংলন্ডে তিনি নিজের হাতে একটি বাষ্পচালিত মোটরগাড়ি তৈরি করেন। নাম 'ব্লু বেল'। গাড়িটিকে খণ্ড-খণ্ড করে তিনি বিলেত থেকে সঙ্গে করেই এনেছিলেন। ১৮৬৮-তে মোরাদাবাদে থাকার সময়ে 'ব্লু বেল'কে আবার চালু করে ফেলেন তিনি। লন্ডনের সায়েন্স মিউজিয়ামে 'ব্লু বেল' আজও সুরক্ষিত।

এই সময়ে পোস্ট অফিস দপ্তর গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড দিয়ে গরুর গাড়ির ট্রেন চালাত—বুলক ট্রেন। অর্থাৎ গরু দিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া হতো সারিবদ্ধ কয়েকটি গাড়ি। তদানীন্তন গভর্নর লর্ড



Crompton's 100 hp road-steamer: W steering wheel, H control levers, E steam pipe, P flexible water hosepipe, T water tanks

ক্রম্পটনের রোড-স্টিমার

মেয়ো-কে ক্রম্পটন বোঝালেন যে, এর বদলে রাস্তা দিয়ে 'স্টিম ট্রেন' চালানো অনেক সুবিধাজনক।

রাইফেল ব্রিগেডের কাজ ছেড়ে ক্রম্পটন গ্রহণ করলেন নতুন পদ, 'সুপারিন্টেন্ডেন্ট অফ গভর্নমেন্ট স্টিম ট্রেন'।

১৮৭১-এ আট অশ্বশক্তি বিশিষ্ট 'দা প্রাইমার' নামে একটি স্টিম ইঞ্জিন এসে পৌঁছল এডিনবরার আর· ডব্লুউ· থমসনের কারখানা থেকে। বিরাট-বিরাট কাঠের চাকার উপর মোটা রবারের টায়ার পরানো। ক্রম্পটন প্রথম ট্রায়াল দিলেন দিল্লী থেকে আম্বালা। অনেক অসুবিধার মোকাবিলা করতে হয়েছিল ক্রম্পটনকে। ইঞ্জিনের বয়লারটি ছিল কয়লা ব্যবহারের জন্য, তার জায়গায় জ্বালানি করতে হয়েছিল কাঠকে। রাস্তায় কিছু সেতু পড়েছিল, যার উপর এত ভারী ইঞ্জিন তোলা অত্যন্ত বিপজ্জনক।

এইসব অসুবিধে দূর করার জন্য ক্রম্পটনের পরামর্শমতো ইপ্‌সউইচ-এর র‍্যানসম, সিম্‌স্ অ্যান্ড হেড কোম্পানিকে চারটি একশো হর্স-পাওয়ারের ইঞ্জিন বানানোর অর্ডার দেওয়া হলো। নর্থ ব্রিটিশ রাবার কোম্পানি দৈত্যাকার চাকা বানালো—পৌনে পাঁচ ইঞ্চি মোটা রাবার মোড়া ৬ ফুট ২ ইঞ্চি তার ব্যাস। প্রথম ইঞ্জিন 'চেনাব' তৈরি হওয়ার পর ক্রম্পটন নিজে তার ট্রায়াল নেওয়ার জন্য ইংলেন্ডে যান। চেনাব-এর বয়লার-এ আগুন দেওয়ার পর এত ফুল্‌কি ছিটকাতে থাকে যে ইপ্‌সউইচের ঘোড়দৌড়ের মাঠের গ্র্যান্ড স্ট্যান্ডে অগ্নিকাণ্ড ঘটে যায়। নতুন স্ট্যান্ড বানানোর জন্য ভারত সরকারকে টাকা দিতে হয়। ক্রম্পটনের নির্দেশে বয়লার বদল হয়। 'ফিল্ড' বয়লার সংযুক্ত চেনাব তারপর ১২০ জন যাত্রীসহ একটি 'অমনিবাস'কে স্বচ্ছন্দে ঘণ্টায় কুড়ি মাইল গতিতে টেনে নিয়ে যায়। উলভারহ্যাম্পটনের রয়েল এগ্রিকালচারাল প্রদর্শনীতে সেবার চেনাব ছিল মুখ্য আকর্ষণের অন্যতম।

দ্বিতীয় ইঞ্জিন 'রবি'কে নিয়ে ক্রম্পটন পরীক্ষামূলক ভাবে ইপ্‌সউইচ থেকে এডিনবরা যাতায়াত করেন। চাল্লিশ টন মাল টানতে হলেও রবি পথের মধ্যে একজায়গায় গ্রেট নর্দার্ন রেলওয়ের একটি মালবাহী ট্রেনকে দৌড়ে হারিয়ে দেয়।

পরীক্ষায় সন্তুষ্ট হয়ে ইঞ্জিন দুটি জাহাজে তুলে ক্রম্পটন ১৮৭২-এর ফেব্রুয়ারি মাসে কলকাতায় এসে নামেন। স্থির হয় গভর্নমেন্ট স্টিম ট্রেনের সদর দফতর হবে রাওয়ালপিণ্ডি। এ-বছরের অক্টোবর থেকে রাওয়ালপিণ্ডি ও অ্যাটক-এর মধ্যে রবি ও চেনাবের দৈনিক ছোটাছুটি শুরু হয়।

এরপরে 'ইন্ডাস' নামে আরও একটি ইঞ্জিন এসেছিল। চতুর্থটি এসেছিল কিনা জানা যায় না। অর্থকারী ভাবে স্থলপথে স্টিম ট্রেন সফল হলেও তার মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণের পিছনে ক্রম্পটনের ব্যক্তিগত নজর ছিল অপরিহার্য। ক্রম্পটন বিলেতে ফিরে যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই স্টিম ট্রেনেরও দিন ফুরোয়।

ক্রম্পটন ১৮৯৬-এ আরেকবার ভারত সরকারের অনুরোধে এদেশে অসেন। কিন্তু এবার ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে। ইতিমধ্যে ১৮৮২-তে তিনি বিশ্বে প্রথম একটি বাড়িতে ইনক্যানডেসেন্ট ইলেকট্রিক বাল্ব জ্বালিয়ে প্রসিদ্ধ হয়েছেন। ভারত সরকার 'ইলেকট্রিক লাইট অ্যাক্ট'-এর খসড়া রচনা করার জন্য বিশেষজ্ঞ হিসেবে তাঁর সাহায্য চান। ১৮৯৯-এ ইংলন্ডে ফেরার আগে তাঁকে অনুরোধ করা হয়, জম্মু ও কাশ্মীরের মধ্যে সমুদ্রতলের ন' হাজার ফুট উপরে, বানিহাল পাস দিয়ে ইলেকট্রিক রেলওয়ে স্থাপনের সম্ভাব্যতা নিয়ে একটি রিপোর্ট পেশ করার জন্য। ক্রম্পটন তাঁর রিপোর্টে বলেন, চেনাব নদীর কাছে রাম্বান জায়গাটি জলবিদ্যুৎ প্রকল্প গড়ে তোলার পক্ষে আদর্শ স্থান। এই বিদ্যুৎ শুধু ট্রেন নয়, পুরো শিয়ালকোট অঞ্চলের শিল্পায়নের সহায়ক হবে—চিনির কল, লৌহ ও ইস্পাত শিল্প, এমনকি অ্যালুমিনিয়মের কারখানা স্থাপনের সম্ভাবনার উল্লেখ করেন তিনি। কিন্তু কাশ্মীরের মহারাজা তাঁর রিপোর্ট বাতিল করে দেন।[৩]

মোটরগাড়ির চেয়ে হাওয়াগাড়ি নামটা অনেক সুন্দর। কথাটাকে যেভাবেই ব্যাখ্যা করা হোক, অর্থটাও স্পষ্ট। হাওয়ার মতো হালকা গাড়ি, বা হাওয়ার মতো যা উড়ে চলে। সেদিক থেকে দেখলে, ধুমসো ঐরাবত, স্টিম রোড-রোলারদের নিয়ে মাথা ঘামানোর কোনো মানে হয় না। তবে এটা ভাবার কোনো কারণ নেই যে, হাওয়াগাড়ি মানেই পেট্রলগাড়ি। সারা পৃথিবী জুড়ে হাওয়াগাড়ির আদি পর্বে পেট্রলগাড়ির সঙ্গে পাল্লা দিয়েছিল স্টিম-কার ও ইলেকট্রিক কার। তাদের পরিচয়ও আমরা যথাসময়ে পাব।

শ্রীরাধারমণ মিত্র 'কলিকাতা দর্পণ'-এ কোনো সূত্র উল্লেখ না করেই জানিয়েছেন যে, ১৮৯৬-এ কলকাতায় প্রথম হাওয়াগাড়ি দেখা দেয়। তারপর থেকেই সন ১৮৯৬ নানা গবেষণাগ্রন্থে মদত পাচ্ছে। সমকালীন কোনো পত্রিকায় এই তথ্যের সমর্থন নেই। সাময়িকপত্রে ১৮৯৯-এর আগে কলকাতায় হাওয়াগাড়ি আগমনের কোনো বৃত্তান্ত প্রকাশ হয়েছে বলে চোখে পড়ে না।

১৮৯৯-এ 'ইন্ডিয়ান অ্যান্ড ইস্টার্ন ইঞ্জিনিয়ার' পত্রিকার ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় প্রথম এক প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ থেকে কলকাতায় মোটরগাড়ির অস্তিত্বের কথা জানা যায়। পরিবেশনের সরস ভঙ্গির জন্যও বিবরণটি উদ্ধারযোগ্য :

Automotor is now gradually making their appearance felt in some of the cities of India. Not that the machines in use here have proved

themselves entirely superior of their types at home and their failing; for the spectacle of a motley crowd of cyces, chaprasis etc, pushing behind a car along Clive Street, Calcutta was evidence of the fact that they are only—we had almost written human, but should say—motor.

কয়েক মাসের মধ্যেই ফোটোগ্রাফিক সোসাইটি অফ ইন্ডিয়ার জার্নালেও একটি মজার খবর বেরিয়েছিল, "কলকাতায় এখন মোটর দেখা যায়। এক বাঙালি ভদ্রলোকের একটি মোটরকার আছে যেটি নিয়ে তিনি চাঞ্চল্য এবং দুর্গন্ধ সৃষ্টি করে বেড়ান। তাছাড়া প্রায় প্রত্যেকদিন সকালে একজন ফরাসীকে দেখা ও শোনা যায় যিনি মোটরসাইকেলে চড়ে ময়দানে পাক খান।"[৪]

ভারতে মোটরগাড়ি আগমন সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ খবর আছে ১৯৫৯-এ ডানলপ কোম্পানির ডায়মন্ড জুবিলি উপলক্ষে প্রকাশিত 'সিক্সটি ইয়ার্স অফ মোটর ট্রান্সপোর্ট ইন ইন্ডিয়া' নামে বইটিতে। টায়ার-নির্মাতা ডানলপ ১৮৯৮-এ ভারতে তাদের ব্যবসাকেন্দ্র খোলে, কাজেই তাদের নথি থেকে সংগৃহীত তথ্য নির্ভরযোগ্য। এই বিবরণ অনুসারে ১৮৯৮-তেই কলকাতায় প্রথম মোটর গাড়ি আসে বলে অনুমান করা হয়েছে। এই বছরে চারটি মোটরগাড়ি বোম্বেতে এসেছিল। তার মধ্যে তিনটি ওল্ডসমোবিলের মালিক ছিলেন জামসেদজী টাটা, রুস্তম কামা ও কাওয়াসজি ওয়াদিয়া। অজানা মডেলের চতুর্থ গাড়িটি কিনেছিলেন মিস্টার প্যাক। একই সময়ে কলকাতায় অবার্ট (Aubert) নামে একজন একটি 'সারপলেট স্টিম কার' ও অ্যানড্রু ইউল অ্যান্ড কোম্পানির এইচ· এইচ· রেনল্ডস একটি ফরাসী প্যুজো (Peugeot) এনেছিলেন। বাঙালিদের মধ্যে প্রথম মোটরগাড়ি কেনেন অভিজাত বংশীয় সি· বসাক (C. Bysak)।[৫]

ডানলপ প্রকাশনের এই সংবাদের আংশিক সমর্থন রয়েছে ১৯০৪-এর 'দা এম্‌প্রেস' পত্রিকার পয়লা সেপ্টেম্বর সংখ্যায়। প্রতিবেদক জানিয়েছিলেন, মিস্টার রেনল্ডসই কলকাতার প্রথম মোটরকার মালিক।[৬]

কলকাতার খবরের কাগজে মোটরগাড়ি বিক্রির প্রথম বিজ্ঞাপন বেরোয় ১৯০০-র ২৩ এপ্রিল[৭] :

MOTO-CARS
of well known manufacturers supplied from
stock. Orders booked for motor cars of all
description.
Speed—Safety—Elegance
For particulars apply to
Messrs Jambon & Co.
5, Bankshall Street, Calcutta.

১৯০২ অবধি খবরের কাগজে শুধু জাম্বোন অ্যান্ড কোম্পানি মোটরগাড়ি বিক্রির বিজ্ঞাপন দিত। ১৯০০-এ তারা নির্মাতার নাম উল্লেখ না করে পেট্রল ও ইলেকট্রিক গাড়ি আমদানির কথা জানায়।[৮] ১৯০২-এ গার্ডনার সারপলেট স্টিম মোটরকার-এর গুণপনা ব্যাখ্যা করে বলে যে, ভারতের পক্ষে এটি আদর্শ পরিবহণ। সহজলভ্য কেরোসিন পুড়িয়ে চলে। শক্তপোক্ত, নির্ভরযোগ্য,

সহজে রক্ষণাবেক্ষণ করা যায়....যে কোনো পাহাড়ে চড়তে পারে। বড় বড় অক্ষরে তারা ঘোষণা করতে ভোলেনি যে, কেরোসিন পুড়িয়ে এর বয়লারে জল থেকে বাষ্প উৎপন্ন করতে হলেও, কোনো ধোঁয়া নেই। কোনো কাঁপুনি নেই! নো স্মোক! নো ভাইব্রেশন![৯]

এ-বছরেরই আরেকটি বিজ্ঞাপন থেকে দেখা যায় তারা ডি ডিও বুঁটো (De Dion Bouton) প্যুজো এবং প্যানহার্ড লেভাসর (Panhard Levassor) গাড়িও আমদানি করছে আর তার সঙ্গে অগভীর জলে চলার উপযোগী লঞ্চ।[১০]

১৯০২-এ কলকাতার দ্বিতীয় মোটরগাড়ি বিক্রেতা হিসেবে 'দা মোটর ট্র্যান্সপোর্ট অ্যান্ড সাপ্লাই কোম্পানি,' শ' ওয়ালেসের প্রযত্নে বিজ্ঞাপন দিতে শুরু করে। এরা ছিল 'লোকোমোবাইল'-এর সোল এজেন্ট। ১৯০৪-এ ৮/২ ডালহাউসি স্কোয়ার থেকে তারা লোকোমোবাইলের এই মডেলগুলি বিক্রি করত[১১]

| | |
|---|---|
| ছ'জন যাত্রীবাহী ওয়াগনেট (১২ হর্স পাওয়ার) | ৯০০০ টাকা |
| চার জন যাত্রীবাহী ঐ | ৫৭৫০ টাকা |
| ঐ (সেকেন্ড হ্যান্ড) | ৪৫০০ টাকা |
| লোকো-সারে (সেকেন্ড হ্যান্ড) | ২৮০০ টাকা |

শুধু গাড়ি বেচেই নিস্তার পেতেন না সে-যুগের বিক্রেতারা। গাড়ি চালাতে শেখানোটাও ছিল তাদেরই কাজ। আর পেট্রলগাড়ি হলে জ্বালানি সরবরাহেরও ব্যবস্থা। ১৯০৪-এ 'স্টেটসম্যান' পত্রিকায় এইরকম এক বিক্রেতা এ· এ· বাখম্যান-কে ঘোষণা করতে দেখা যায়[১২]:

"will make you an accomplished motorist in a day."

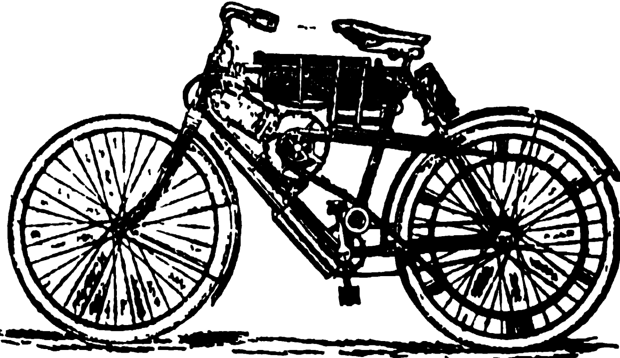
এই বছরেই প্রথম কলকাতায় পেট্রলের বড় ডিপো খোলা হয়[১৩]:

Petrol : Suitable for motor cars can be obtained
ex. the Port Commissioners Depot at Moyapur at a
cost of 12 As/gallon.
Apply to MACNEILL & Co., Agents ASSAM OIL Co. Ltd.

এই বিজ্ঞাপন বেরোনোর এক মাস আগেও বাখম্যান জানিয়েছিলেন, প্রতি গ্যালন এক টাকা দরে দেড় গ্যালনের ড্রামে তাঁরা পেট্রল বিক্রি করেন।[১৪]

কলকাতায় সে-সময়ে পেট্রল সংগ্রহের অসুবিধের জন্যই স্টিম কার বেশি আমদানি হতো, এরকম অনুমান করা হয়তো পুরোপুরি অসঙ্গত নয়। তবে সেইসঙ্গে এটাও বলা দরকার যে, ১৯২৫ সালেও কলকাতায় অন্তত চারটি স্টিম কার ছিল। একটি টার্নার-মিস্‌সে, একটি স্ট্যানলি, ক্যাপ্টেন মে্অল-এর একটি অজানা মডেলের গাড়ি ও ২৯ নম্বর জগন্নাথ সুরি লেনের কে· ডি· ব্যানার্জির একটি হোয়াইট স্টিম কার।[১৫]

কলকাতার প্রাচীন মোটরকার বিক্রেতাদের মধ্যে 'মোটর ট্র্যান্সপোর্ট কোম্পানি' কয়েক ধরনের সস্তা পেট্রল গাড়ি আমদানি করত—দু'জন যাত্রীবাহী ছয় হর্স পাওয়ারের 'স্পিডওয়েল' (একবার পেট্রল ভরলে দু' টাকা চার আনায় ১০০ মাইল চলবে) ও দু'জন যাত্রীবাহী পাঁচ হর্স পাওয়ারের 'বিস্টন হাম্বারেট'। ১৯০৪-এ দুটোরই দাম ছিল তিন হাজার টাকা। অবশ্য ডেমলার, উল্‌সলি, নেপিয়ার ও গ্রেডিয়েটর-ও আনাত তারা।[১৬]




বিজ্ঞাপন ১৯০৫

তবে রীতিমতো হইচই যদি কোনো কোম্পানি বাঁধিয়ে থাকে তো, 'দা কন্টিনেন্টাল ইলেকট্রিক কোম্পানি'। 'স্টেটসম্যানে'র এক রিপোর্টারকে একটি কার্ভড ড্যাশ ওল্ডসমোবাইল-এ চড়িয়ে কলকাতার এক পাব্লিক বিল্ডিঙের সিঁড়ি দিয়ে বেমালুম কয়েকবার ওঠানামা। এও ১৯০৪-এর ঘটনা।[১৭]

কলকাতার হাওয়াগাড়ির ইতিহাসে এই বছরটা আরও একটা কারণে স্মরণীয়। অটোমোবাইল অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল (বর্তমানে A.A.E.I.) এই বছরেই প্রতিষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষ্যে এ·এ·বি-র উদ্যোগে ভারতের প্রথম মোটরগাড়ির জলসা বা 'অটোমোবাইল মিট' ও 'সহনশীল দৌড়' প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় কলকাতায়।[১৮]

২৮ অগাস্ট ১৯০৪। ভোর সাতটার সময়ে ময়দানে লর্ড ডাফরিনের স্ট্যাচুর কাছে এগারটি গাড়ি ও চারটি মোটর সাইকেল জমা হয়েছে। কলকাতায় তখন রেজিস্ট্রি করা গাড়ির সংখ্যা গোটা বাটেক।

সেদিনের গর্বিত মালিক-কাম-চালকরা কে কি নিয়ে হাজির হয়েছিলেন, তার তালিকাটি দেওয়া হল :

| | | |
|---|---|---|
| Dr. Nield Cook (chairman) | De Dion Bouton | 6 H.P. |
| Mr. Inglis | De Dion Bouton | 6 H.P. |
| Mr. Birkmyre | Wolsely | 7½ H.P. |
| Mr. Oakley | Deschamps | 8 H.P. |
| Mr. Marsh | Cadillac | 6½ H.P. |
| Mrs. Acatos | Geo Richard Brazier | 12 H.P. |
| Mr. Oxlade | Heatley | 8 H.P. |
| Mr. Goodall | Humberette | 5 H.P. |
| Mr. Clarke | Oldsmobile | 6 H.P. |
| Mr. Pratt | Oldsmobile | 6 H.P. |
| Mr. Debrunner | Oldsmobile | 6 H.P. |

Motor Bicyeles—Mr. Bachmann, Mr. Behrens, Mr. Wezel, Mr. Garvis

যাত্রীদের মধ্যে কয়েকজন মহিলা থাকলেও একমাত্র লেডি ড্রাইভার মিসেস আকাটোস-ই সবচেয়ে শক্তিশালী গাড়িটির হাল ধরেছিলেন এবং "she handled her 12-horse power car in a workman-like style."

পার্ক স্ট্রিট, ফ্রি স্কুল স্ট্রিট, ওয়েলিংটন স্ট্রিট, কর্নওয়ালিস স্ট্রিট ও বি·টি· রোড হয়ে দৌড়ের প্রথম পর্ব শেষ হয় যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের 'এমারেল্ড বাওয়ার' প্রাসাদে। প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর প্রতিযোগীদের অভ্যর্থনা জানান। একটি গ্রুপ ফোটোগ্রাফ তোলা হয় এবং এ·এ·বি-র প্রাচীনতম সদস্যদের মধ্যে অন্যতম প্রদ্যোৎকুমারের নতুন 'ইলেকট্রিক ল্যান্ডো' গাড়িটি দেখে সকলেই সেটির বেজায় তারিফ করেন। জনাকয়েক মহিলা তাতে চড়ে বাগানের মধ্যে একটু-আধটু ঘোরাঘুরিও করেছিলেন। কিছুক্ষণ বাদে প্রতিযোগীরা ব্যারাকপুরের দিকে রওনা হন। সেখানে কিনিসন মিল্‌স্‌-এর আবাসে তাঁরা মিস্টার আর্কি বার্কমায়ার-এর আতিথ্য গ্রহণ করেন।

প্রদ্যোৎকুমারের ইলেকট্রিক গাড়িটির নির্মাতার নাম জানা যায় না। তবে কি ধরনের ইলেকট্রিক গাড়ি তখন কলকাতায় আমদানি হতো তার একটা ধারণা পুরনো বিজ্ঞাপন থেকে সংগ্রহ করা যায়। জাম্বোন কোম্পানির ১৯০০ সালের বিজ্ঞাপনে ইলেকট্রিক গাড়ির উল্লেখ ছিল, কিন্তু নির্মাতার নয়।[১৯] 'দা মোটর ট্র্যান্সপোর্ট অ্যান্ড সাপ্লাই কোম্পানি' ১৯০৪-এর ৩ জুলাই ঘোষণা করেছিল যে, এক্স-স্টক তারা 'ওয়েভারলি' ইলেকট্রিক গাড়ি বেচতে প্রস্তুত :

1 seated Surrey, Price 4000
This is the ideal run about car for Calcutta,
noiseless, easily handled, simple mechanism.
electric power readily obtained,
cost of electricity Rs. 1-4 for 40 miles,
absolutely reliable.

উল্লিখিত 'সারে', 'ল্যান্ডো' ইত্যাদি নামগুলো এসেছিল ঘোড়ার গাড়ির প্রচলিত মডেলের অনুসরণে। এবং কলকাতায় হাওয়াগাড়ি আমদানি শুরু হওয়ার কয়েক বছরের মধ্যেই এখানকার

বিখ্যাত ঘোড়ার গাড়ি নির্মাতারা অনেকেই মোটরগাড়ির খোল তৈরির কাজে হাত লাগায়। কোচ-মেকার্স থেকে বডি-বিল্ডার্স হয়ে ওঠে তারা। এর মধ্যে অবাক হওয়ার কিছু নেই। আদ্যিকালের হাওয়াগাড়ি তো ঘোড়ার গাড়ির আদলেই গঠিত হয়েছিল। জনপ্রিয় ভাষায় হর্সলেস্ ক্যারেজ বা বিনি ঘোড়ার গাড়িও অভিহিত হতো মোটরগাড়ি।

১৯২৫ সালেও কলকাতায় একটি বৈদ্যুতিক হাওয়াগাড়ি চলত। অজানা নির্মাতার এই মোটরগাড়ির মালিক ছিলের রেনি পার্কের আর· ডি· মেহতা। রেজিস্ট্রেশন নাম্বার . ৪১।[২০]

কলকাতার বিখ্যাত কোচ-মেকার্স স্টুয়ার্ট অ্যান্ড কোম্পানির ১৯০৮ সালের বিজ্ঞাপন থেকে তাদের তৈরি মোটর গাড়ির ছিমছাম অনুপম চেহারাটি দেখা যায়।[২১] ১৯০২ থেকে ডাইক্স অ্যান্ড কোম্পানিও ব্রুহ্যাম ধাঁচে ১৫ হর্স পাওয়ার ট্যালবট গাড়ির বডি নির্মাণ শুরু করে।[২২]

ভারতের প্রথম মোটরগাড়ি (শুধু খোলটা নয়) নির্মাণের কৃতিত্বও এরকম এক কোচ-মেকার্স সংস্থার। অবশ্য সেটি কলকাতার নয়, মাদ্রাজের কোম্পানি। ১৮৪৭ খ্রীস্টাব্দে কোচ-মেকার্স হিসেবেই যাত্রা শুরু সিম্পসন অ্যান্ড কোম্পানির, আজ যা পার্কিন্স ইঞ্জিনের নির্মাতা। সিম্পসন কোম্পানিকে স্বচ্ছন্দে মাদ্রাজের স্টুয়ার্ট কোম্পানি বলা যায়। তাদের তৈরি ঘোড়ার গাড়ি ১৮৫৭ সালেও বিদেশের প্রদর্শনীতে সুনাম কিনেছে। এই কোম্পারিই এক অংশীদার মিস্টার স্যামুয়েল জন গ্রীন ১৯০৩-এ একটি স্টিম কার তৈরি করেন। কিন্তু ওই একটিই। তারপর সিম্পসন কোম্পানি শুধু মোটরগাড়ি আমদানির উপর জোর দেয়। অবশ্য গাড়ির খোলটা তারা তৈরি করত।[২৩]

বাঙালি কোম্পানিব মধ্যে মোটরগাড়ির ব্যবসায়ে প্রথম নাম করে 'গ্রেট ইস্টার্ন মোটর কোম্পানি'। হেমেন্দ্রমোহন বসু ছিলেন তার প্রাণপুরুষ। ঠিক কবে স্থাপিত হয় জানা না গেলেও, ১৯১১-র বিজ্ঞাপন থেকে বোঝা যায় ব্যবসা তখন জমে উঠেছে।

গ্রেট ইস্টার্ন মোটর কোম্পানি পরিচালনার জন্য হেমেন্দ্রমোহন একটি ডিরেক্টর বোর্ড তৈরি করেছিলেন, যার মধ্যে ছিলেন ডাক্তার সুরেশপ্রসাদ সর্বাধিকারী, স্যার নীলরতন সরকার, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, নাটোরের মহারাজা, কাশিমবাজারের মহারাজা, স্যার কেদারনাথ দাস (স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ও প্রথম ভারতীয় এফ· সি· ও· জি· উপাধিপ্রাপ্ত), উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর ভাই, গণিতের অধ্যাপক ও ক্রিকেটার মুক্তিদারঞ্জন রায় প্রমুখ ব্যক্তি।

৪৪ নম্বর পার্ক স্ট্রিটে গ্রেট ইস্টার্ন মোটরের প্রশস্ত সুদৃশ্য শো-রুম ছাড়া মেরামতির কারখানাও ছিল। শ' দুই-আড়াই গাড়ি রাখার ব্যবস্থা ছিল সেখানে। বিদেশ থেকে পাস-করা ইঞ্জিনিয়ার জনৈক মিস্টার প্রেস্টনকে সুপারভাইজার নিযুক্ত করা হয়েছিল। তিনি পরীক্ষা করে গাড়ির 'ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট' দিতেন।[২৪]

হেমেন্দ্রমোহনের ১৯১২-র ডায়েরির বেশ কয়েকটি পাতা জুড়ে (৬ মার্চ, ৭ মার্চ ও ৯ এপ্রিল) রয়েছে বিভিন্ন মডেলের গাড়ির বৈশিষ্ট্যমূলক কারিগরি খুঁটিনাটি। বোঝা যায় গ্রেট ইস্টার্ন মোটর কি-কি গাড়ি আমদানি করবে সেটা তিনি স্থির করতেন। ডায়েরিতে উল্লিখিত এমন অনেক মডেলের গাড়ি আছে, যার একটিও হয়তো আজ কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না।[২৫]

১৯১১-তে প্রথম Klaxon ইলেকট্রিক হর্নের ব্যবহার শুরু হয়। এক বছরের মধ্যেই হেমেন্দ্রমোহন ডায়েরিতে লিখছেন :

The Duplex Electric Horn/2, 4 or 6 volt can be used. The most efficient

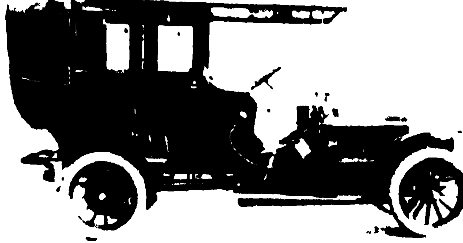
ESTABLISHED 1775.

COACH AND MOTOR BODY BUILDERS

By Special Appointment to

H. R. H. THE PRINCE OF WALES and H. E. THE EARL OF MINTO







The illustration is that of a Thorneycroft Chassis with Body by STEUART & CO.

Specification and Drawing of Body to suit any make of Chassis on application

STEUART & CO., 3, Mangoe Lane, CALCUTTA,

AGENTS FOR THORNEYCROFT CARS

বিজ্ঞাপন : ১৯০৫

& reliable road clearer on the market. Rs. 45.

সাত-আট হাজার টাকা যখন গাড়ির দাম, বৈদ্যুতিক হর্নের ৪৫ টাকা দামটা অত্যধিক। তাই বাল্ব হর্ন বা মেকানিকাল হর্ন বহুদিন বৈদ্যুতিক হর্নের ব্যবহার ঠেকিয়ে রেখেছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় মন্দা ও ১৯১৬-য় হেমেন্দ্রমোহনের মৃত্যুই গ্রেট ইস্টার্ন বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণ।[২৬]

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনে দাঁড়িয়ে আছে একটি টু-সিটার গাড়ি। ১৯২০-তে এইরকম একটি ফোটোগ্রাফ ছাপা হয়েছিল 'বিজনেস' পত্রিকায়। জানানো হয়েছিল, এটি কলকাতার রসা ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানির তৈরি এবং "ingenious Indian work"।[২৭] ভবানীপুরে বর্তমান ফিলিপস কোম্পানির দক্ষিণ দিকে 'রসা'-র কারখানা ছিল। তারা ফোর্ড কোম্পানির ইঞ্জিন আনিয়ে 'রসা' নামে গাড়ি তৈরি করত। ১৯২৫-এ অন্তত সাতটি 'রসা' গাড়ি চলতো কলকাতায়। হাওড়ার হেল্‌থ অফিসার ডক্টর এস· কে· মল্লিকের ও ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোম্পানির 'রসা' গাড়ি ছিল।[২৮]

১৯০৪-এ কলকাতায় প্রথম মোটর দৌড়ে অংশগ্রহণকারী, মোটরগাড়ি ও মোটর সাইকেল

বিক্রেতা বাখম্যান ১৯১২ থেকে নিজের নামেই মোটরগাড়ি তৈরি করতে শুরু করেন। মোটরগাড়ির একটি যন্ত্রাংশ (ফ্রিকশন অ্যান্ড বেল্ট ডিফারেনশিয়াল) নির্মাণের জন্য কলকাতার পেটেন্ট অফিস থেকে এ· ডুক্‌লোস-এর সঙ্গে যৌথভাবে তিনি একটি পেটেন্টের অধিকারও পেয়েছিলেন (২৫-১-১৯১০)।[২৯] ২০ নম্বর কনভেন্ট রোডের ডব্লিউ হেন্ড্রি ১৯২৫ সালেও একটি বাখম্যান ব্যবহার করতেন।[৩০] অবশ্য গাড়ির ইঞ্জিনটি ব্যাখম্যান নিজে তৈরি করেছিলেন, এরকম দাবি করার মতো কোনো প্রমাণ নেই।

ভারতে মোটরগাড়ি নির্মাণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বিস্ময়কর খবর দিয়েছিলেন যশোরের কালেক্টর। ১৯০৮-০৯ সালে নলডাঙ্গার রাজার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত যশোর প্রদর্শনীতে নাকি একটি ছয় হর্সপাওয়ার শক্তিসম্পন্ন 'লোকালি মেড' মোটরগাড়ি ছিল। অবশ্য এ গাড়ির ঠিক কতটা 'লোকালি মেড' জানা যায় না।[৩১]

পুরো ইঞ্জিন সমেত ভারতের প্রথম এবং একাধিক হাওয়াগাড়ি নির্মাণের কৃতিত্ব নগণ্য এক বাঙালির, যাঁর নাম আজ পুরোপুরি বিস্মৃত।

বালিগঞ্জ ফাঁড়ির কাছে ছোট্ট একটি চালাঘরে, নিজের গ্যারেজে, বিপিনবিহারী দাস কম করে তিনখানি মোটরগাড়ি তৈরি করেন।[৩২]

তাঁর সার্থকনামা প্রথম 'স্বদেশী মোটর কার' ১৯৩১-এ তৈরি হয়। গাড়িটি বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি কিনেছিল এবং মোতিলাল নেহরু ও পন্ডিত মদনমোহন মালব্য সেটি ব্যবহার করতেন।

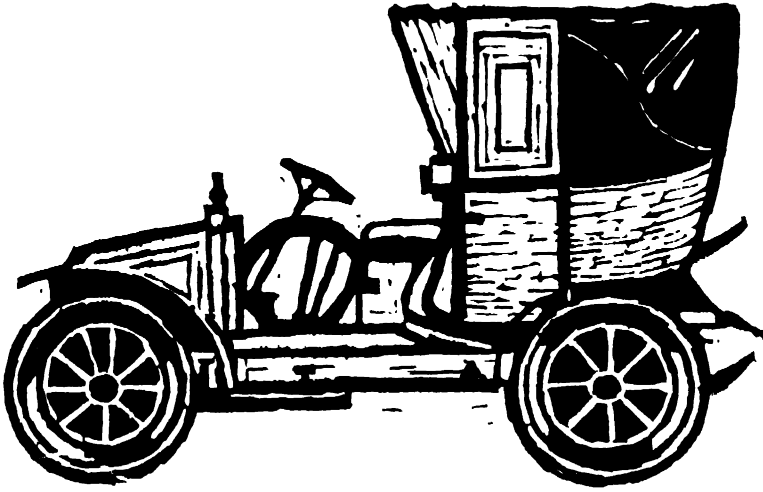
১৯৩৩-এ বিপিনবিহারী দ্বিতীয় গাড়িটি নির্মাণ করেন ক্যালকাটা কর্পোরেশনের জন্য। নভেম্বর মাসে গাড়িটি পরীক্ষামূলক দৌড় হওয়ার পর পুলিশ রেজিস্ট্রেশন অনুযায়ী তার নাম্বার প্লেটের জন্য বরাদ্দ হয় ৩৫৯৭৭। টায়ার, স্পার্ক প্লাগ, কারবুরেটর ও ম্যাগনেটো ছাড়া এই পনের অশ্বশক্তির চার সিলিন্ডারওলা গাড়িটি একা হাতে বানিয়েছিলেন বিপিনবিহারী। গাড়িটি তৈরির সময় মাসে-মাসে কিছু টাকা তিনি অগ্রিম চেয়েছিলেন এবং সবসুদ্ধ মাত্র তিন হাজার টাকা।

'মিউনিসিপ্যাল গেজেটে'র পাতাই সাক্ষী যে, তৎকালীন বাঙালি কাউন্সিলাররাই ছিলেন বিপিনবিহারীর উদ্যোগের সবচেয়ে বড় সমালোচক। বি কে বসু, সুশীলচন্দ্র সেন, ভূপেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, পি এন গুহ ও প্রোফেসর এস সি সেন প্রমুখ প্রথম থেকেই সন্দেহ প্রকাশ করে এসেছেন তাঁর এই প্রয়াসের সাফল্য ও উপযোগিতা সম্বন্ধে। শুধু ডি পি খৈতান, মেয়র সন্তোষকুমার বসু এবং মোটর ভিহিক্‌ল সুপারিন্টেন্ডেন্ট জে সি গুপ্ত ছিলেন বিপিনবিহারীর পক্ষে।

কলকাতার কাছে এই বিশ্বকর্মা অবহেলা ছাড়া আর কিছু লাভ করেননি। মৃত্যুর পর ১৯৩৮-এর এপ্রিল মাসে 'মিউনিসিপ্যাল গেজেট' একটি দায়সারা শোক-সংবাদ ছেপে হাত ধুয়ে ফেলেছিল। পঞ্চান্ন বছর বয়সে এই 'কর্পোরেশন মোটরকার' নির্মাতার মৃত্যু হয়।

সংবাদদাতা অবশ্য জানিয়েছিলেন যে, গোয়ালিয়র রাজ্যের জন্যও তিনি একটি গাড়ি তৈরি করেছিলেন এবং বহু বছর ধরে সেটি সন্তোষজনক ভাবে ব্যবহৃত হয়েছিল। মৃত্যুর সময়েও তিনি আর-একটি গাড়ি তৈরির কাজ করছিলেন।

"এই দেশে তিনিই মোটরগাড়ির একমাত্র ভারতীয় নির্মাতা, তাঁর এই দাবি নিঃসন্দেহে যুক্তিপূর্ণ —গোটা চোদ্দ লাইনের শোকসংবাদ এই বাক্যের সঙ্গেই ফুরিয়ে যায়।[৩৩]



# হাওয়া গাড়ির বাবু ও বিবি

ডক্টর স্যার নীলরতন সরকার তখন কলকাতার ডাকসাইটে ডাক্তার। একদিন গাড়ি হাঁকিয়ে চলেছেন হ্যারিসন রোড ধরে, বাড়ির দিকে। হঠাৎ ট্রাম লাইনে চাকা পড়ে গাড়ি স্কিড করল। গাড়ি রোখার জন্য অভ্যাসবশত লাগালেন এক জোর হেঁচকা টান। তবু গাড়ি থামল না। স্পিড কম ছিল তাই ল্যাম্পপোস্টটাকে শুইয়ে ফেলেনি, সেটা বেয়ে একটু ওঠার চেষ্টা করেছিল। দোষ গাড়িরও নয়, নীলরতনেরও নয়। দোষ অভ্যাসের। নীলরতন দীর্ঘকাল নিজে 'ট্র্যাপ' চালাতেন। সেটা এক ধরনের দু'চাকার ঘোড়ার গাড়ি। সদ্য কিনেছেন মোটরগাড়িটা। বিভ্রান্ত হয়ে ব্রেক টেপার বদলে স্টিয়ারিং হুইলে লাগিয়েছেন টান। লাগামের মতো। নীলরতন সরকারের পৌত্র শ্রীসুমন সরকারের কাছে এই কাহিনী শুনেছি। তাঁর মতে নীলরতন প্রথম যে গাড়িটি কেনেন, একটি ডি ডিও ব্যুঁটো, সেটি কলকাতার রেজিস্ট্রিকৃত দ্বাদশ সংখ্যক গাড়ি।[১]

এই কাহিনী প্রমাণসাপেক্ষ না হলেও কোনো সন্দেহ নেই যে, ডাক্তারবাবু প্রায় ডাকটিকিটের মতো মোটরগাড়ি জমাতেন। ১৯২৫ অবধি কলকাতায় রেজিস্ট্রিকৃত গাড়ির তালিকা থেকে জানা যায় ন'-ন'খানা গাড়ি ছিল তাঁর—শেভ্রলে (১৩২), রেনো (৪৭৭), ১ সিলিন্ডারের ডিলাজ (৪৮৪), ডজ (৮১৮), ফোর্ড (৮৮১), হচকিস (১০৮১), রেনো (১২৫৭), ফোর্ড (৩৬৬৪) ও ফোর্ড (৮৬২৫)।[২]

ব্র্যাকেটে উল্লিখিত সংখ্যাগুলি কার-প্লেট নাম্বার। কলকাতার আর-এক বিখ্যাত ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ও গাড়ি-বিলাসিতায় নীলরতনের চেয়ে কিছু কম যেতেন না। আগের তালিকা অনুসারে তিনি ছিলেন সাতটি গাড়ির মালিক—রেনো (৬১৪), রেনো (১২৩৯), রেনো (১৯০৭), রেনো (৩৬০৯), কলম্বিয়া (৬৭১০), স্টোরি (৯৩৪৭) ও শেভ্রোলে (১২৯৮৭)।

আর-এক বিখ্যাত ডাক্তার ইউ· এন· ব্রহ্মচারীর ছিল তিনটি গাড়ি—ওল্ডসমোবিল (৬৪৮), ক্লিভল্যান্ড ও অস্টিন (১৩৪০৬)।

TELEPHONE 084.

THE
CENTRE OF THE MOTORING COMMUNITY.

**Great Eastern Motor Co.,**

*44, FREE SCHOOL STREET.*

**Large Selection of New & Second-Hand Cars**
TO SELECT FROM.

Tyres, Petrol, Accessories, Repair,
Body Building, Painting, Etc., Etc.
ROCK BOTTOM PRICES.
LARGEST GARAGE IN INDIA.

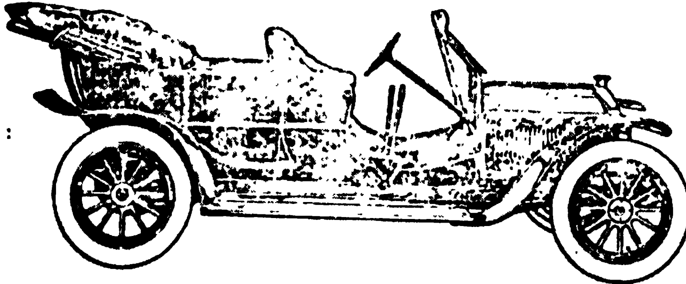
Telegrams: "FLIGHT," CALCUTTA.

বিজ্ঞাপন · ১৯১১

ব্যাপারটাকে শুধু বড়লোকের দেমাক বলে উড়িয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু বোধহয় অবিচার হবে। এতগুলো গাড়ি কিনেছিলেন বিধানচন্দ্র ও নীলরতন, কিন্তু রোল্স রয়েস বা বেন্টলি কেনেননি। স্ট্যাটাস সিম্বল হিসেবে ব্যবহার করতে চাইলে এই ধরনের গাড়িই তাঁরা কিনতেন নিশ্চয়। আসলে মাস্ প্রোডাকশনের তান্ডব শুরু হওয়ার আগে হাওয়াগাড়ির একটা রোমাঞ্চ ছিল, প্রত্যেকটা গাড়ির ব্যক্তিত্ব ছিল। আর সব বাদ দিলেও ছিল বৈচিত্র্য। কলকাতায় কত যে নির্মাতার হাওয়াগাড়ি ছিল তার ইয়ত্তা নেই। বহুকাল পরে সত্যজিৎ রায়ের শৈশবকেও উত্তেজিত করেছিল এই বৈচিত্র্য। তাঁর অবিনাশ মেসোমশাইয়ের ল্যানসিয়া গাড়ি যখন চলত তখন বনেটের ডগায় দপ্-দপ্ করে গোলাপী আলো বেরোত, একটা কাচের ফড়িং-এর গা থেকে। সত্যজিৎ লিখেছেন, "সেসব গাড়ির প্রত্যেকটার চেহারা এবং হর্নের আওয়াজ আলাদা। ঘরে বসে হর্ন শুনে গাড়ি চেনা যেত। ফোর্ড শেভ হাম্বার ভক্সহল উল্সলি ডজ ব্যুইক অস্টিন স্টুডিবেকার মরিস ওল্ডসমোবিল ওপ্যাল সিত্রোয়াঁ—এসব গাড়ি এখন শহর থেকে লোপ পেয়ে গেছে। হুড খোলা গাড়ি ক'টা দেখা যায়? খুদে বেবি অস্টিন কালেভদ্রে এক-আধটা চোখেপেড়ে। আর সাপের মুখওয়ালা 'বোয়া হর্ন' লাগানো বিশাল ল্যানসিয়া, লাসাল—এসব আমীরী গাড়ি ত মনে হয় স্বপ্নে দেখা।"[৩]

FOR THE DURBAR.

TELE-PHONE : 1084.



TELE-GRAMS : FLIGHT CALCUTTA

Motor State Carriages State Landaulets

Touring Cars, Torpedo Cars, Sporting Cars,

LARGEST GARAGE IN INDIA.

*LARGE SELECTION OF NEW AND SECOND-HAND CARS IN STOCK.*

REPAIRS, BODY BUILDING, PAINTING, ACCESSORIES.

GREAT EASTERN MOTOR Co.,

44, Free School Street, CALCUTTA.

বিজ্ঞাপন : ১৯১১

একটু বেশি এগিয়ে এসেছি। কলকাতার তিন বিখ্যাত ডাক্তারবাবুর গাড়ির নেশার প্রসঙ্গেই আবার ফিরে যাই। মেয়ো হাসপাতালের ডাক্তার দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র সেকালের কলকাতার এক বর্ণোজ্জ্বল চরিত্র। বঙ্গীয় হিতসাধনী সভার (বেঙ্গল সোশ্যাল সার্ভিস লিগ-এর) প্রতিষ্ঠাতা তিনি। তিনি অবশ্য অনেক পরে ১৯১৫-য় একটি ফোর্ড কিনেছিলেন। রেজিস্ট্রেশন নাম্বার ১২৩০২। কিন্তু তাঁকে স্মরণ করছি অন্য কারণে। মোটরগাড়ির রোমাঞ্চের একটু স্বাদ পাওয়ার আশায়। অবলম্বন, কন্যা মীরা চৌধুরীকে লেখা তাঁর কয়েকটি অপ্রকাশিত চিঠি।

১৯১৫-র ১৫ এপ্রিল তিনি মেয়েকে জানাচ্ছেন যে, একখানা মোটরগাড়ির অর্ডার দিয়েছেন। কিন্তু তারপরেও আরও একটা দেখতে গেছেন। এরপর ১ মে-র চিঠি :

"রবিবাবুরা পরশুরাত্রে জাপান যাত্রা করলেন—আমরাও খিদিরপুরে জাহাজে উঠিয়ে দিয়ে রাত ১১ টায় ফিরলাম। যাবার সময় আমার মোটরের সঙ্গে Minerva ও অন্যান্য carএর race হ'য়েছিল—আমার car came out easily first !"

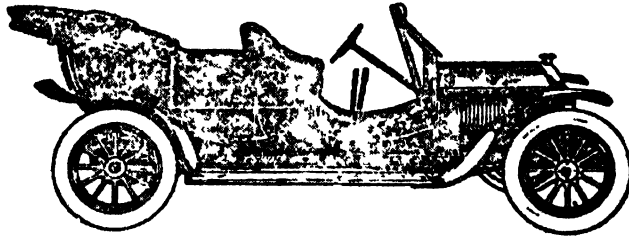
উল্লিখিত মিনার্ভা ও অন্যান্য গাড়ি সম্বন্ধে দু-চারটি অনুমান করার অবকাশ আছে। মিনার্ভা গাড়িটি ছিল অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের। রেজিস্ট্রেশন নাম্বার ২৮৩১। অবনীন্দ্রনাথের এছাড়াও আরও

— THE —

# Great Eastern Motor Co.,

44, FREE SCHOOL STREET, CALCUTTA.

Telephone 1084.



Telegrams : "FLIGHT,"

**The Largest Garage in India.**

**SIDDELEY DEASY CARS,**
**DURKOPP CARS,**
**ROVER CARS,**
**DARRACQ CARS.**

BODY BUILDING. PAINTING. REPAIRS. ACCESSORIES.

Large Selection of New and Second-hand Cars in Stock. Let us Quote for Repairs, Hire or a New Car.

CALL & SEE J. D. SIDDELEY'S LATEST PRODUCTION

"The Genuine SIDDELEY DEASY CAR."

বিজ্ঞাপন : ১৯১১

দুটি গাড়ি ছিল—ওভারল্যান্ড (৩৮৯৭) এবং আরেকটি অজানা নির্মাতার (৪২৪১)। ১৯২৫ অবধি জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির কে কি গাড়ি চড়তেন তার একটা তালিকা দিচ্ছি[৪] :

| | | |
|---|---|---|
| রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর | : | উল্‌স্‌লি (২০২৪) |
| দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর | : | ফোর্ড (৪৮৭৮) |
| গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর | : | মোর্স (৩৩৮৫) |
| সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর | : | ফোর্ড (৩৬৬৮), ফোর্ড (৪২০৩) ও অস্টিন (১৩৫৪) |
| রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর | : | স্টুডিবেকার (২৩০৭) ওভারল্যান্ড (১২১৩৯) ও ফিয়াট (১৩০৮০) |

দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্রের আর-একটি চিঠি থেকে একদিকে যেমন তাঁর রোমান্টিক মনের পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনই গাড়ির চালক সম্বন্ধে তাঁর উদারতা ও স্নেহ সম্পর্কে জানা যায়। ১৯১৬-র ১৪ মে তিনি লিখছেন, "কাল রাত্রে তোর মাকে নিয়ে খুব মোটরে করে বেড়িয়ে এলাম। চাঁদনী রাত ছিল—বড় চমৎকার লাগছিল। ১৫০ টাকা দিয়ে ২টা নতুন tyre কিনি, সেই দিনই ২টা tube

burst করে ! হরিচরণ ড্রাইভার ৪ দিন ছুটি নিয়ে বিয়ে করে এল । তাকে বিয়ের জন্য ১০০ টাকা দিলাম । বড় ভাল ছেলে । সে তার মায়ের জন্য বিয়ে করল—তার আছে একমাত্র মা ; মার শরীর খারাপ ; দেখবার কেউ নেই ; তাই বউ ঘরে আনল : না হলে হরিচরণের মোটেই বিয়ে করতে এখন ইচ্ছে ছিল না—তার অনেক ধার আছে ।"

এর কিছুদিন পরেই শিলং থেকে দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁর কন্যাকে চিঠিতে একটি রোমহর্ষক দুর্ঘটনার সচিত্র বিবরণ দিয়েছিলেন । অপ্রাসঙ্গিক বলে সেটির গভীরে আর প্রবেশ করার উপায় নেই ।

১৯২৫ পূর্ববর্তী কলকাতার কেউকেটারা কে কোন হাওয়াগাড়ি চড়তেন তার তালিকা পেশ করার আগে সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর খবরটা জানিয়ে দেওয়া দরকার ।

ফোর্ট উইলিয়ামের ফার্স্ট ক্যামেরন হাইল্যান্ডার্সের মুচি, ইংরেজিতে বললে একটু ভাল শোনায়, স্যুমেকার, শক্তু নামে একজন একটি ফোর্ড গাড়ি কিনেছিলেন । রেজিস্ট্রেশন নাম্বার ১৮৬৯ দেখে মনে হয় বিংশ শতকের প্রথম দশকেই কেনা । এটা কি শক্তু-র কোনো উপরি রোজগারের ফল, নাকি, তখনকার পাদুকা নির্মাতাদের বাড়তি কদরের পরিচায়ক ?[৫]

১৯২৫-এ কলকাতায় কে কি চড়তেন তার একটা ফর্দ এবার পেশ করছি[৫] :

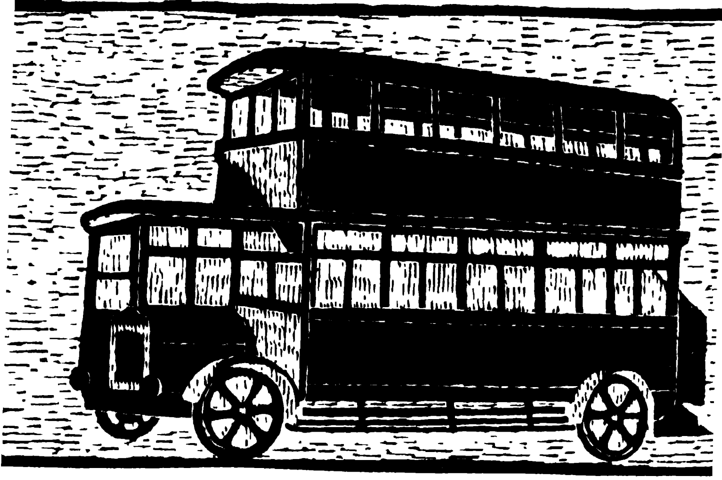
ডক্টর জগদীশচন্দ্র বোস : স্টুডিবেকার (৩৪৭৪)
চিত্তরঞ্জন দাশ : বার্লিয়েট (১১৪৮), রোমার (৪২০৫)
আশুতোষ চৌধুরী : হচকিস (১১৬৪), ওভারল্যান্ড (৬৭৬০)
এন· সি· চন্দ্র : কোল (৩২৩), বিস্টন হাম্বার (১৯৬৩)
গওহরজান : ন্যাশ (৯৯২৬)
শিশিরকুমার ভাদুড়ি : ফোর্ড (২০৮৮)
পি· মহলানবিশ : নেপিয়ার (৩৬৯৩)
প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ : ফোর্ড (৯৩৫৮)
এল· কে· এলমহার্স্ট (ডাইরেক্টর অফ এগ্রিকালচার, শান্তিকেতন ইন্টারন্যাশানাল ইউনিভার্সিটি) ফোর্ড (৯৭২৭)
মহামহোপাধ্যায় গণনাথ সেন : সিংগার (১২৩৭২)
স্যার ডি· পি· সর্বাধিকারী : অ্যারল জনস্টন (১০৭১১)
ডক্টর স্যার কৈলাসচন্দ্র বোস : উল্‌সলি (৭৪১)
ডক্টর কেদারনাথ দাস : রোভার (৩১৫১)
সত্যসুন্দর দেব : ফোর্ড (৪১২৪)
স্যার কে· জি· গুপ্ত : আর্মস্ট্রং সিড়লি (১১৯৯৯)

| | | |
|---|---|---|
| প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর | : | নেপিয়ার (২৩৪২), রোভার (৩১৯১), ডজ (৪৯০৩), ডেট্রয়েট-ম্যাক্সওয়েল (৪৯৫০) ও অস্টিন সিডলি (৭৭৩৪) |
| স্যার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি | : | ডেমলার (৮১০০) |
| সুবোধচন্দ্র মহলানবিশ | : | ফোর্ড (৯৭৯২) |

এই তালিকায় নির্মলচন্দ্র চন্দ্রের আট সিলিন্ডার বিশিষ্ট দানবীয় কোল্ এবং বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের জাতীয় নেতা সুরেন্দ্রনাথের (পরবর্তীকালে 'সারেন্ডার নট !'-এর) ডেমলার ছাড়া চোখ টাটানোর মতো গাড়ি নয় কোনোটাই।

ভারতীয় রাজা-মহারাজা বা অশালীনভাবে ধনীদের মধ্যে রোল্‌স রয়েস-এর মালিক হওয়ার পাগলামি সঞ্চারিত হয় ১৯০৮-এ পাতিয়ালার মহারাজা 'ভারতের মুক্তা' অভিহিত একটি রোল্‌স কেনার পর। (নির্মাতাদের মতে 'রোল্‌স রয়েস' নাম নয়, বিশেষণ। তাই দ্বিত্বের খাতিরে তার অন্তে 'এস' যোগ করা ব্যাকরণসিদ্ধ নয় !) ১৯২৫-এ কলকাতার রোল্‌স রয়েস মালিক তথা ধনাঢ্যদের তালিকাটি এইরকম—পি· কে· মল্লিক, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, দ্বারভাঙ্গার মহারাজা, ডেভিড এজরা, ই· এ· গাব্বে, ত্রিপুরায় মহারাজা (২টি), হিরজি খাটসে, তাজহাটের রাজা গোপাললাল রায়, কুচবিহারের মহারাজা, দীঘাপতিয়ার রাজা (২টি), তেজপুরের কুমার দিগ্বিজয় সিং, সন্তোষের রাজা, রাতলামের মহারাজা, ডানকান ম্যাকিনন (জুনিয়র), রাজপালার মহারাজা, লেফটেন্যান্ট কর্নেল ডি· এস· ওয়াগ্‌লে, এম· এন· মল্লিক (পাথুরিয়াঘাটা), স্যার আর· এন· মুখার্জি, রাজা জগন্নাথপ্রসাদ সিং, বাবু অনাথনাথ বসু (বাগবাজার), রায় এম· এন· বসু (বাগবাজার), তুলসীচরণ গোস্বামী ও শরৎচন্দ্র মল্লিক।[৭]

তবে গাড়ি নিয়ে ক্ষ্যাপামিতে সকলকে টেক্কা দিয়েছিলেন আর· এন· ম্যাথুসন নামে কলকাতার এক কোটিপতি। আলিপুরের সোয়ান পার্কের বাসিন্দা। তাঁর তৈরি 'সোয়ান'-এর মতো চমকদার ও অদ্ভুত গাড়ি কলকাতায় আর দ্বিতীয়বার দেখা যায়নি। 'সোয়ান' দেখতে ছিল সত্যিই হাঁসের মতো। রেডিয়েটারের কাছে থেকে তিনি গলা বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। গায়ে অ্যালুমিনিয়ামের পালক। কলকাতায় গাড়ির খোলটি তৈরি হওয়ার পর ১৯১২-য় ক্যালকাটা কর্পোরেশনের চিফ ইঞ্জিনিয়ারের পত্নী তার নামকরণ করেন। তারপর খোলটি পাঠিয়ে দেওয়া হয় 'লোস্টোফ্‌ট' নামক মোটরকার নির্মাতা যে· ডব্লুউ· ব্রুক অ্যান্ড কোম্পানিতে। তারা ইঞ্জিন ও স্যাসি সংযুক্ত করে। এই গাড়ির অনেক খামখেয়ালিপনার মধ্যে অন্যতম তার হর্ন। আটটি অরগ্যান পাইপ বিশিষ্ট গ্যাব্রিয়েল হর্নে চালক ইচ্ছেমতো সুর বাজাতে পারতেন চাবি টিপে। ইঞ্জিনের 'এক্সহস্ট' বা পোড়া গ্যাসের সাহায্যেই বাজানো হতো অরগ্যান হর্ন। হাঁসের চোখ হিসেবে ছিল লাল প্রিজ্‌ম—রাত্তিরে জ্বলজ্বল করতো। একটা লিভার টানলে হাঁসের মুখ ফাঁক হয়ে যেত আর অন্য একটার সাহায্যে রেডিয়েটর থেকে আধ পাঁইট জল হাঁসের নাক দিয়ে ফোঁস করে ছুঁড়ে দেওয়া সম্ভব ছিল। কম্প্রেস্‌ড এয়ার সিলিন্ডারেরও ব্যবস্থা ছিল তার জন্য। হ্যারি হব্‌সের স্মৃতিকথায় ব্যক্তি ম্যাথুসন সম্বন্ধে অনেক মজার খবর আছে। যদিও 'সোয়ান' ও তার স্রষ্টা উভয়েরই পরিণতি বিষাদময়। কর্পোরেশন 'সোয়ান'কে কলকাতার রাস্তায় চলার অনুমতি দেয়নি। আর উৎকেন্দ্রিক ম্যাথুসন নিঃস্ব অবস্থায় মারা যান।[৮]



## লাল ট্যাক্সি ও ট্রাম কোম্পানির বাস

কলকাতায় ১৯০৯ নাগাদ ট্যাক্সির আবির্ভাব। ফ্রেঞ্চ মোটর কোম্পানির শেভিজা (Sevidjan) কলকাতায় প্রথম ট্যাক্সির ব্যবসা শুরু করেন। সবই দু' সিলিন্ডারের ছোট্ট Charron গাড়ি। দু'জন করে আরোহী নিতে পারতো। প্যারিসের কেতা অনুসরণে গাড়িগুলো ছিল টকটকে লালরঙা। ভাড়া, মাইল পিছু ছ'আনা। অল্পদিনের মধ্যে ইন্ডিয়ান মোটর ট্যাক্সি ক্যাব অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানিও এই ব্যবসায়ে নামে।[১]

'ডায়োজিনিস' নামধারী কবি কলকাতায় কোন্ নির্মাতার গাড়ি চড়েছিলেন জানা নেই কিন্তু তাঁর কবিতা কলকাতার ট্যাক্সিকে সাহিত্যলোকে উত্তীর্ণ করেছে[২] :

## Thoughts in a Calcutta Taxi

As I whiz through old jolly Chowringhee,
  In a raucous succession of hoots,
Feeling bumpy and jolty and springy,
  With my heart dropping down in my boots

When I see a procession of faces
  Pass by in a nebulous blur,
On my way to the Tollygunge Races,
  I wait for the smash to occur.

When I see an old lady— a beggar
  Skip by and convulsively jump:
When ahead I see coming a figure,
  I instinctively wait for the bump.

"O doesn't he mop up the track? see
  His wonderful presence of mind!"
I exclaim, "I am backing the taxi.
  I am strike me bl —"

A jar and a shock and a quiver,
  A whirling around of the world.
Through the length of my spine runs a shiver,
  As on to the road I am hurled

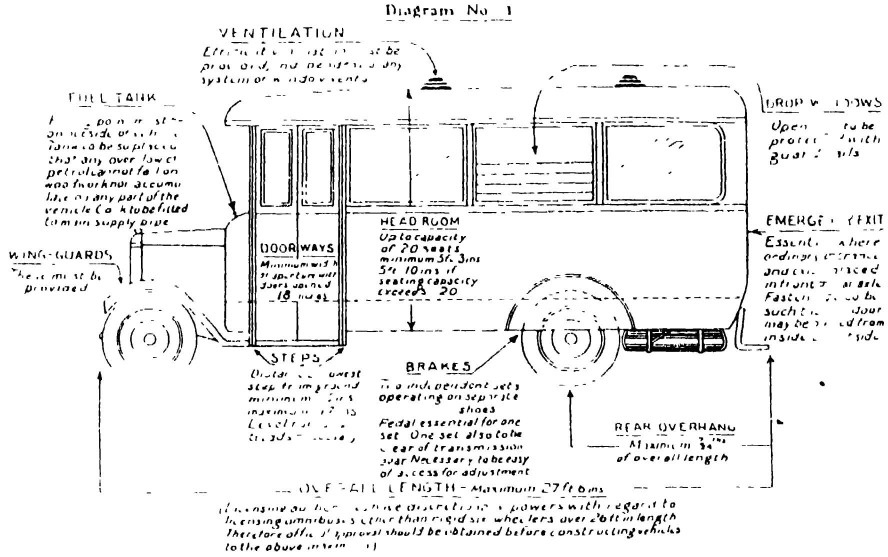
Down on to the broad of my back, see!
  The taxi has landed on me.
Instead of backing the taxi,
  The taxi has strongly backed me.

১৯২৪-এর সেপ্টেম্বর সংখ্যায় 'ওয়েলফেয়ার' কাগজের 'ডু-ইউ-নো' বিভাগের সংবাদদাতা দেখা গেল ক্যালকাটা ট্রামওয়েজ কোম্পানির ওপর বেজায় চটে গেছেন, "দিনের পর দিন কৌটোয় সার্ডিন মাছ ভরার মতো মানুষ ঠাসছে ট্রাম! কে দিল তাদের এই অধিকার! আর তাই যদি হবে তবে নির্দিষ্ট সংখ্যার যাত্রীবহনের জন্য লাইসেন্স দেওয়ার ভাঁড়ামি কেন? এমনও ঘটতে দেখা গেছে যে, ট্রাম ঠিক জায়গায় না থেমে যাত্রীদের টেনে নিয়ে গেছে দূরে। ট্রাম কোম্পানির বিরুদ্ধে আর এক অভিযোগ, কিছু কিছু রুটের কন্ডাক্টাররা প্রয়োজনমতো ভাঙানি সঙ্গে রাখে না।"

১৮৭৩-এর ২৪ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় প্রথম ট্রাম চলে। নিয়মিতভাবে চলাচল অবশ্য ১৮৮০ থেকে শুরু। ঘোড়ার বদলে পরীক্ষামূলকভাবে ১৮৮২ সালে মাস এগারো বাষ্পের ইঞ্জিন দিয়েও ট্রাম চালানো হয়েছে (পরবর্তীকালে শুধু দুর্গাপূজার ক'দিন চৌরঙ্গী রোডে স্টিম ট্রাম চলত)। তারপরে ১৯০২ থেকে বৈদ্যুতিক ট্রাম।

MINISTRY OF TRANSPORT REQUIREMENTS

FOR PUBLIC SERVICE VEHICLES




Note – These requirements are applicable to all omnibuses unless otherwise stated.

SKETCH No 518A 6

ট্রাম কোম্পানির বাস

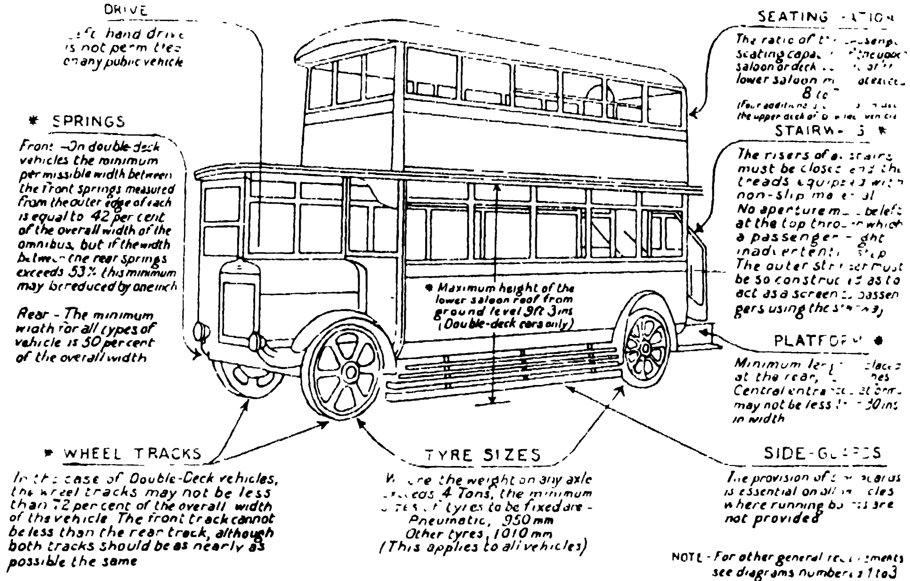
মজার কথা ও অজানা খবর, ১৮৯৭-এ হিট্‌লি অ্যান্ড গ্রেশাম কোম্পানি কলকাতা কর্পোরেশনের কাছে প্রস্তাব দেয়, তারা বিনামূল্যে তিন মাসের জন্য কলকাতায় একটি পরীক্ষামূলক গ্যাস-চালিত ট্রাম চালাতে চায়।[৩]

পরিবহণ ব্যবস্থা হিসেবে ট্রামের সমালোচনা নিশ্চয় 'ওয়েলফেয়ার'-এই প্রথম প্রকাশিত হয়নি। কিন্তু আলোচ্য সমালোচনাটি অন্য কারণে বিশিষ্ট। কলকাতায় মোটরবাস প্রবর্তনের দাবি জানানোর প্রসঙ্গেই প্রতিবেদক এখানে ট্রামকে তার আগে একহাত নেওয়া প্রয়োজন মনে করেছেন।

কলকাতায় ওয়ালফোর্ড কোম্পানি ১৯১২-তে প্রথম মোটরবাস প্রবর্তন করেন। কিন্তু কিছুদিন বাদে তা বন্ধ হয়ে যায়। নতুন উদ্যোগ শুরু হয় ১৯২২-২৩ নাগাদ। খোদ কলকাতা শহরে ১৯২৪-এ মাত্র দশটি রেজিস্টার্ড বাস ছিল। তার মধ্যে দুটি ওয়ালফোর্ড কোম্পানির আর বাকি আটটিরই মালিক কলকাতার ট্রাম কোম্পানি।[৪]

ট্রাম কোম্পানির বাস, শুনতে অনেকটা সোনার পাথরবাটির মতো। আসলে, মোটরবাসের অনিবার্য আগমন ট্রাম কোম্পানির ব্যবসাকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে ভেবেই যুগপৎ বাসের ব্যবসাতেও

Diagram No 4




ট্রাম কোম্পানির বাস

SKETCH No 5 & 6

নামতে চেয়েছিল তারা। ১৯২৬-এ ট্রাম কোম্পানির সবসুদ্ধ সতেরটি বাস ছিল। সবই লেল্যান্ড-এর ইঞ্জিন। ট্রাম কোম্পানির নথিপত্র থেকে এইসব বাসের বডি-বিল্ডিঙের বিবরণ পাওয়া যায়। একটি নকশায় মাথা-খোলা ও আর একটিতে ঢাকাঢুকি দেওয়া ডাবল-ডেকারও আছে। তবে ট্রাম কোম্পানি ডাবল-ডেকার শেষ পর্যন্ত চালিয়েছিল কিনা জানা যায় না।

কলকাতায় প্রথম ডাবল-ডেকার বাস চালিয়েছিল ওয়ালফোর্ড অ্যান্ড কোম্পানি, ১৯২৬-এ। ছাপ্পান্নজন যাত্রীবাহী একটি 'এ· ই· সি·' গাড়ি, রেজিস্টার্ড নাম্বার এম· বি ৪২।[৫]

কলকাতায় ট্রামের কামরা তৈরি হতো, তৈরি হতো বাসের কামরাও। এখনও প্রাইভেট রুটের বাস যেভাবে তৈরি হয়। বড়-বড় জানলা (ড্রপ শাটার) থাকায় ভাল হাওয়া খেলে। কাঠের কাঠামোর জন্য গরমও হয় কম। কিন্তু তুলনামূলকভাবে আজও সরকারী পরিবহণ, বিশেষ করে ডাবল-ডেকার, চৈত্র-বৈশাখে তপ্ত কটাহ। হবে না কেন, পুরোপুরি লন্ডনের বাসের অনুকরণেই তো এগুলি নির্মিত।

Diagram No. 5

WEIGHTS

Maximum ... weight - 8 tons (4 wheels), 12 tons (6 wheels)
Axle weights —— 5½ tons (2 axles) 4½ tons (3 axles)
Unladen weight of six-wheel omnibuses 10 tons maximum
Weight allowance for passengers and crew 140 lbs each

* GUARD RAILS

The top side rail must be at least 3 feet from the upper deck floor, and 18 inches above the highest part of the seats
The front and back rails must follow the camber of the roof, and be at least 3 ft 3 ins above the floor battens

* SEATING RATIO

The ratio of the passenger seating capacity of the upper deck to that of the lower saloon ... not exceed 8 to ...

* STAIRWAY

The risers of all ... must be closed, and the treads equipped with non-slip material
No aperture may ... at the top through which a passenger might inadvertently step
The outer stringer must be so constructed as to act as a screen ... passengers ... the stairway

* HEIGHT

Maximum height of the lower saloon roof, from ground level 9 ft 3 ins (Double-deck vehicles only)

* PLATFORM

Minimum ... if placed at ... 36 inches

For other general requirements see diagrams numbered 1 to 4

* Denotes special requirements for double deck vehicles

OVERALL LENGTH

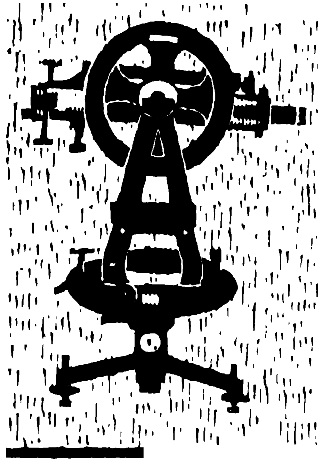
Maximum, for 4-wheel omnibuses — 27 ft 6 ins
(see note on Diagram N° 1)
Maximum for 6 wheel omnibuses — 30 feet

SKETCH No ...

BY H RAHMAN

ট্রাম কোম্পানির বাস

ধাতব চাদরে তৈরি কামরা আর ঘুলঘুলির মতো তিন-পাল্লা জানলা। লন্ডনের যাত্রীরা যদি হাওয়া বর্জন করে, আমাদেরও সেই নিয়ম মানতে হবে নিশ্চয়।



# এভারেস্ট-প্রমাণ মহসীন ও আরও কয়েকজন

সৈয়দ মীর মহসীনের অসংখ্য জীবনী রচিত হলেও অবাক হওয়ার কিছু থাকত না। পরিবর্তে, তাঁর নামটাই আজ লোকের কাছে অপরিচিত।

হিমালয়ের সর্বোচ্চ শিখর এভারেস্ট যাঁর নামে, ভারতের জরিপ বিভাগের অধিকর্তা সেই জর্জ এভারেস্টের কাছে ভারতীয় কারিগর ও বিজ্ঞানী মহলের একটি বিশেষ ঋণ আছে। গণিতজ্ঞ রাধানাথ শিকদার ও গাণিতিক যন্ত্রনির্মাতা সৈয়দ মীর মহসীনের প্রতিভা আবিষ্কার করে তিনি তাঁদের যথাযোগ্য কর্মে নিয়োগ করেছিলেন।

'মেজারমেন্ট অফ মেরিডিওনাল আর্ক অফ ইন্ডিয়া' গ্রন্থের ভূমিকায় এভারেস্ট লিখছেন, "সৈয়দ মহসীন ছিলেন আর্কটের বাসিন্দা। ১৮৩০-এ কলকাতায় আসার পর অবশ্য আমি তাঁকে আবিষ্কার করি। আমি তাঁর অসাধারণ স্বকীয় প্রতিভার (talent) কথা উপলব্ধি করে, তাঁর 'ন্যাচারাল জিনিয়াস' বিকাশের জন্য সাধ্যমতো চেষ্টা করি। মিস্টার ব্যারোর পর তিনি তাঁর পদে অভিষিক্ত হন এবং এখন তিনি অনারেবল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির 'ইন্সট্রুমেন্ট মেকার'।

এই ভূমিকায় ঘুরেফিরে এভারেস্ট মহসীনের দক্ষতার প্রশংসা করেছেন :

I must do that artist the justice to say that for excellence of workmanship, accuracy of division, steadiness, regularity, and glibness of motion, and the general neatness, elegance and nice fittings of all parts, not only were my expectations exceeded, but I really think it as a whole as unrivalled in the world as it is unique.

বিশ্বে অতুলনীয়, সৃষ্টিছাড়া শিল্পী মহসীনের উপর এভারেস্ট কতটা নির্ভরশীল ছিলেন, একাধিক উদাহরণ দিয়ে তা বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন তিনি, "অ্যাজিমুথ সার্কল-টা যখন আমার হস্তগত হয় তখন তার এমন অনেক খুঁত ছিল যার প্রতিকার প্রয়োজন। হাতের কাছে মহসীন না থাকলে এই মেরামতির কাজে আমি একেবারেই অসহায় বোধ করতাম....।"

অন্যত্র তিনি বেস লাইন মাপার কাজের সময় নির্মিত বড় থিওডোলাইট, সাইট্ ভেন্স, বা ল্যাম্প ইত্যাদির উল্লেখ করে বলছেন :

..it is to my native artist Syed Mohsin, I am chiefly indebted for the felicitous issue of my plans.

এভারেস্ট নিজের ও অন্যের সংগ্রহভুক্ত বহু বইপত্রের পাতা উলটে বা চেনাজানা সকলের সঙ্গে পরামর্শ করেও ফ্রিকশন রোলার বা আরগ্যান্ড ল্যাম্প সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য কিছুই সংগ্রহ করতে পারেননি। তাঁকে নিজের বুদ্ধি অনুযায়ীই চলতে হয়েছিল এবং তিনি দ্বর্থ্যহীন ভাষায় স্বীকার করেছেন, হাতের কাছে মহসীন না থাকলে এসব যন্ত্র ব্যবহার করাই হয়তো কঠিন হতো :

...unless I had a person like Syed Mohsin at hand as able to enter into my ideas, as willing to co-operate with me and give efficiency to my schemes, it is hardly to be expected that amidst so many calls on my time to distract me I should ever have been able to give them a fair trial.

'ম্যাথমেটিক্যাল ইন্সট্রুমেন্ট অফিস' নামে 'সার্ভে অফ ইন্ডিয়া'র যে সংস্থায় মহসীন কাজ করতেন, নাম বদলে গেলেও সেটি আজও সগৌরবে বর্তমান। যাদবপুরে অবস্থিত ন্যাশনাল ইন্সট্রুমেন্টস লিমিটেড, একটি সরকারী স্বনির্ভর প্রতিষ্ঠান।

ন্যাশনাল ইন্সট্রুমেন্টস তথা 'ম্যাথমেটিক্যাল ইন্সট্রুমেন্ট অফিস'-এর জন্মের পিছনে রয়েছে জর্জ এভারেস্টের প্রস্তাব, জরিপের যন্ত্রপাতি মেরামতি ও সংস্কারের জন্য একজন সুদক্ষ কারিগর নিয়োগ করা হোক। এভারেস্টের অনুমতি লাভের পর প্রথম গাণিতিক যন্ত্র নির্মাতা হিসেবে মিস্টার ব্যারো নামে এক ইংরেজ কাজে যোগ দেন। ৭/১৬ থিয়েটার স্ট্রিটে শিবপ্রসাদ ঘোষের বাড়ি ভাড়া নিয়ে কারখানার কাজ আরম্ভ হয় ১৮৩০-এর ডিসেম্বর।[১]

১৮৪৩-এ অবসর গ্রহণের দিনটি পর্যন্ত এভারেস্ট কিন্তু মহসীনকে তাঁর সঙ্গছাড়া করেননি। এমনকি মুসৌরিতে আলাদাভাবে একটি যন্ত্র-নির্মাণের কারখানা বসানোর জন্যও সরকারী অনুমোদন চেয়েছিলেন। যাতে, দেরাদুন বা আগ্রায়, ভারতের সার্ভেয়ার জেনারেলের ফিল্ড হেড কোয়ার্টার্সের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ রক্ষা করা যায়। সেই আবেদনে কাজ হয়নি। কলকাতার কারখানা থেকেই সব কাজ করাতে হবে, এই সিদ্ধান্ত হয়। মহসীন ১৮৩৬-এর ৩ অক্টোবর থেকে গ্রেট ট্রিগোনোমেট্রিকাল সার্ভের সাব-অ্যাসিস্টেন্ট হিসেবে কাজ করতে থাকেন। অবশ্য এভারেস্টের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকারের আগে থেকেই মহসীন কলকাতার সার্ভে অফিসে ইন্সট্রুমেন্ট রিপেয়ারার হিসেবে চাকরি করছিলেন। মহসীনের আগে, ভারতীয় বলতে সাব অ্যাসিস্টেন্ট পদ লাভ করেছিলেন শুধু রাধানাথ শিকদার, ১৮৩২-এ।

মহসীন কলকাতার ইন্সট্রুমেন্ট অফিসে যোগ দেওয়ার পূর্ববর্তী পর্বে ব্যারোর অধীনস্থ এই কারখানার ভারতীয় কারিগরদের সম্বন্ধেও কয়েকটি কথা এখানে বলা দরকার। ১৮৩১-এর জানুয়ারি

মাসে কর্মচারীদের তালিকাটি ছিল এইরকম[২] :

| পদ ও নাম | মাসিক বেতন (টাকা) |
|---|---|
| রাইটার | ২৫ |
| হেড ডাইস মিস্ত্রি (রাধানাথ) | ১২ |
| টার্নার (ঈশ্বর) | ৮ |
| ডাইস মিস্ত্রি (হারান, নারায়ণ ও মাথুর) | ৭ |
| কার্পেন্টার (শঙ্কর) | ১৪ |
| পিওন (আবদুল) | ৬ |
| দারোয়ান (হরানন্দ) | ৫ |
| চৌকিদার (ঠাকুর সিং ও চেরাঙ্গি) | ৬ |
| জমাদার (কাল্লু) | ৪ |

ব্যারো ছাড়া দ্বিতীয় কোনো শ্বেতাঙ্গ নেই। তার চেয়েও লক্ষণীয়, কলকাতায় স্টিম-যুগের প্রবর্তনের আদিপর্বেই লেদম্যান ঈশ্বরের কাজে যোগদান। একা ঈশ্বর নন, প্রথম চার বছরের মধ্যে একাধিক লেদম্যান চাকরি নিয়েছেন বা ছেড়েছেন। ১৮৩২-এর মার্চে পীতাম্বর নামে আরেকজন ঈশ্বরের দল ভারী করেন। ওই একই মাইনেয়। ১৮৩৪-এর জানুয়ারি মাসে দেখা যাচ্ছে, ঈশ্বর কাজ ছেড়ে দিয়েছেন, তাঁর জায়গায় নারায়ণ নিযুক্ত হয়েছেন এবং বেশি মাইনেয়। পীতাম্বর তখনও মাসে আট টাকা পাচ্ছেন কিন্তু নারায়ণের মাইনে মাসে এগার টাকা। সম্ভবত, এই নারায়ণই প্রথমে সাত টাকা মাইনের ডাইস মিস্ত্রির কাজ করতেন। মাইনে বাড়িয়েও কিন্তু নারায়ণকে ধরে রাখা যায়নি। পরের মাসেই নারায়ণের জায়গায় মাসিক আট টাকা মাইনেয় কাজে যোগ দেন হলধর। পীতাম্বরও কাজ ছেড়ে দিলেন ১৮৩৪-এর জুন মাসে। এলেন রামসোনা, ছ' মাস না যেতেই রামসোনার জায়গায় পুরান। অতি দক্ষ নারায়ণ ছাড়া এই পর্বে আর কোনো পদধারীর বেতন বৃদ্ধি হয়নি।

রেলওয়ে প্রবর্তনের কম করে কুড়ি বছর আগেই কলকাতায় যে বড়সড় লেদম্যান সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছে, তার আর এর চেয়ে স্পষ্ট ইঙ্গিত কি হতে পারে। শুধু তাই নয়, অনবরত চাকরি ছাড়াও নিশ্চয় আরও ভাল বেতনে অন্যত্র কাজ ধরার ব্যাপারটারই ইঙ্গিতবাহী।

ব্যারো কাজ ছেড়ে দেওয়ার পর এই কারখানার সাময়িক হাল ধরেন মিলিটারি বোর্ডের অফিসাররা। ১৮৪৩-এ এভারেস্ট অবসর নেওয়ার সময়ে মহসীনের হাতে কলকাতার কারখানার ভার তুলে দেওয়ার কথা চিন্তা করেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মহসীনকে 'হেড আর্টিফিসার টু দা ডিপার্টমেন্ট অফ সায়েন্টিফিক ইন্সট্রুমেন্টস'—এই পদে নিযুক্ত করতে চায়। এভারেস্টের বিবেচনায় এটা অসম্মানজনক। মহসীনের 'source of deep mortification'-এর কারণ হতে পারে ভেবে তিনি এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন।

শেষ পর্যন্ত, ১৮৪৩-এ ৯ সেপ্টেম্বর তারিখের চিঠিতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ডিরেক্টররা ব্যারোর শূন্যপদে 'ম্যাথামেটিক্যাল ইন্সট্রুমেন্ট মেকার' হিসেবে মহসীনকে নিযুক্ত করার সিদ্ধান্তটি

মেনে নেন। যদিও, তিনি যে একছত্রও ইংরেজি লিখতে পারেন না, তারও উল্লেখ ছিল ওই চিঠিতে। আমৃত্যু, ১৮৬৪ পর্যন্ত মহসীন এই পদেই অধিষ্ঠিত ছিলেন।[৩]

ব্যারোর পদটি লাভ করলেও, দক্ষতায় ঢের বেশি তুখোড় হলেও, মাইনের দিক থেকে ফিরিঙ্গি আর ভারতীয়দের মধ্যে বৈষম্যটা কিন্তু যথারীতি বজায় ছিল। ব্যারো মাসিক পাঁচশো টাকা বেতনে কাজে নিযুক্ত হন। মহসীন পেতেন ঠিক তার অর্ধেক। ১৮৫৪-এ ব্যক্তিগত ভাতা হিসেবে আরও দেড়শো টাকা করে দেওয়া হতো তাঁকে। (তুলনামূলকভাবে, রাধানাথ শিকদার ১৮৩৮ থেকে মাসে একশো তিয়াত্তর টাকা পেতেন। তারপর বিশেষ ভাতা হিসেবে মাসে আরও একশো টাকা দেওয়া হতো। ১৮৫২-য় রাধানাথের মাসিক বেতন ছ'শো টাকায় পৌঁছয়)।[৪]

ঐতিহ্য সম্বন্ধে আমরা এতই সচেতন যে 'ন্যাশনাল ইন্সট্রুমেন্টস'-এর দফতরে মহসীনের জীবন ও কর্ম সম্বন্ধে কোনো তথ্যই নেই। নেই তাঁর ছবি বা নির্মিত কোনো যন্ত্র। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল দরবার, অন্যদিকে, সাহেব ঘেঁষা ইতিহাসের উপাদান নিয়ে এতই গর্বিত যে, এভারেস্টের আমলের সেই 'গ্রেট-থিওডোলাইট' যন্ত্র শুধু এককোণে দাঁড় করিয়ে রেখেই নিশ্চিন্ত। মহসীনের নামগন্ধ সেখানেও নেই। দেরাদুন সার্ভে অফিসে সাধারণের নাগালের বাইরে সংরক্ষিত আছে বলে শোনা যায় মহসীনের শিল্পকর্মের কিছু যান্ত্রিক নিদর্শন। মহসীনের তৈরি বা সংস্কার-করা কয়েকটি যন্ত্রের সংক্ষিপ্ত বিবরণের জন্য পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)।[৫]

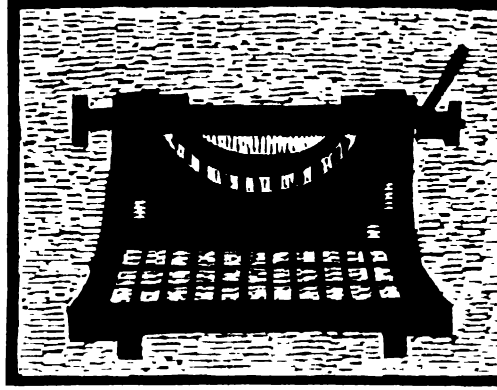
মহসীনের প্রসঙ্গক্রমে কলকাতা বা কলকাতা-সন্নিহিত অঞ্চলের বৈজ্ঞানিক যন্ত্র-নির্মাতা কয়েকটি সংস্থার নাম এখানে উল্লেখ করছি।

'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় ১৮৯১-এ ৩০ জুন প্রকাশিত হয় এই বিজ্ঞাপন :

P. D. MITTER & Co.
Scientific Instrument Maker, Repairers and
importers and contractors to the Govt. of
India. (Estd. 1883)

১০ লোয়ার সার্কুলার রোডে ছিল এই কোম্পানির হেড অফিস ও কারখানা। ১১/৩ ক্লাইভ রো-তে শাখা অফিস। জরিপের কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রাদি তৈরি করত তারা। ১৮৯৯-এর ইন্ডাস্ট্রিয়াল এগজিবিশনে প্রিজমেটিক ও আমিন'স কম্পাস নির্মাণের জন্য তারা লাভ করেছিল স্বর্ণপদক। কিন্তু পরের বছরেই একটি বিজ্ঞাপন থেকে লক্ষ্য করা যায় যে, বৈজ্ঞানিক যন্ত্র নির্মাণের চেয়ে বাইসাইকেল আমদানি ও বিক্রির দিকেই বেশি উৎসাহ। ১৮৯৯-প্যাটার্নের ডানলপ নিউমেটিক টায়ার, ঘণ্টা ও আলো সংযুক্ত সাইকেল মাত্র একশো পঁয়ত্রিশ টাকায় অফার করেই কৃতার্থ।[৬]

১৯০৬-এ কলকাতার ইন্ডাস্ট্রিয়াল এগজিবিশনে হুগলীর ঘুটিয়াবাজারের রবীন্দ্রনাথ ধরের নির্মিত রিফ্লেক্টিং টেলিস্কোপকে স্বর্ণপদক দান করা হয় ডক্টর জগদীশচন্দ্র বোসের বিচার অনুসারে।[৭] ১৯০৮-এ প্রকাশিত কামিং-এর রিপোর্ট থেকে জানা যায়, হুগলীর এস· কে· ধর অ্যান্ড কোম্পানির, যার তৎকালীন ম্যানেজার ছিলেন গোকুলনাথ ধর, তৈরি নিউটোনিয়ান দূরবীক্ষণের মান ছিল সুউন্নত।[৮]



# বাংলা-লেখার কল ও গোনার কল

বাংলা লেখার কল বা টাইপরাইটার বিক্রি প্রথম শুরু করে ব্লিক টাইপরাইটার কোম্পানি। ১৯১৪-য় 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় প্রকাশিত 'কলের লেখা'র পাদটীকায় পত্রিকার সম্পাদক জানিয়েছিলেন, "প্রায় ৭/৮ বছর পূর্বে কলিকাতায় রেমিংটন টাইপরাইটার কোম্পানির অধ্যক্ষ মিস্টার এ· পি· স্টক্ওয়েল-এর অনুরোধে শ্রীগণদেব গাঙ্গুলী তাঁর পিতা বেণীমাধব গাঙ্গুলীর উপদেশক্রমে বাঙ্গালা-লেখার এইরূপ একটি কল-প্রস্তুতের বিশদ বিবরণী লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। শুনিতেছি, উক্ত কোম্পানি সম্প্রতি বাঙ্গালা লেখার এইরূপ কল আমদানী করিয়াছেন।"[১]

কলকাতার পেটেন্ট অফিসের নথি থেকে জানা যায়, ১৯০১ সালেই হ্যামন্ড টাইপরাইটার একটি পেটেন্ট নিয়েছিল (সংখ্যা ২৮৪) 'ওরিয়েন্টাল লেঙ্গুয়েজ'-এর টাইপরাইটারের জন্য। কিন্তু বাংলা টাইপরাইটার তৈরি করেছিল কিনা জানা নেই।

বাংলা টাইপরাইটারের লেখার নমুনা ছাপা হয়েছিল ১৯১৯-র 'প্রবাসী'তে। ময়মনসিংহের ধনকুড়া নিবাসী সত্যরঞ্জন মজুমদারের আবিষ্কৃত যন্ত্রে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের গানের কয়েক পঙ্‌ক্তি।[২]

সত্যরঞ্জন আবিষ্কৃত যন্ত্রের বিশদ বিবরণও প্রকাশিত হয়েছিল। সাধারণ ইংরেজি টাইপরাইটারের বিয়াল্লিশটি চাবির (key) স্থানে এখানে একটি বেশি ছিল। কাজেই আয়তনের ফারাক ছিল না। কিন্তু ইংরেজি-যন্ত্রের প্রত্যেক চাবি-পিছু দুটি করে মোট ৮৪টি অক্ষরের জায়গায় বাংলা-যন্ত্রের প্রত্যেক চাবি-পিছু তিনটি করে মোট ১২৯টি অক্ষর ছিল। বাংলা-যন্ত্রের অক্ষরগুলি তিন স্তরে বা সারিতে সাজানো ছিল। প্রথম স্তরে সদা-ব্যবহার্য অক্ষর, দ্বিতীয় স্তরে অন্যান্য অক্ষর ও তৃতীয় স্তরে কতকগুলি বিশেষ আয়তন-বিশিষ্ট বিশেষ অক্ষর ও চিহ্ন। প্রথম স্তরের অক্ষর দিয়ে লেখার সময়ে, অক্ষরের চাবিতে আঘাত করলেই হতো। কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের অক্ষর দিয়ে লেখার জন্য দুটি 'চালক চাবির বন্দোবস্ত' (shifting arrangement) ছিল। দ্বিতীয় স্তরের অক্ষর দিয়ে লেখার জন্য ইংরেজি টাইপরাইটারের ক্যাপিটাল হরফ লেখার মতো একটি 'চালক চাবি' (shift key) চেপে, অক্ষরের চাবিতে আঘাত করতে হতো। তৃতীয় স্তরের অক্ষর সহযোগে 'উপর-নীচ

সংযোগে' যুক্তাক্ষর লেখা যেত। 'উপর-নীচ সংযোগ' বলতে 'ন্ত' 'ত্ন' 'প্ল' 'ন্তু' 'ন্ত্র' ইত্যাদির অনুরূপ সংযোগ বোঝাচ্ছে। এই সংযোগ সাধনের জন্য যন্ত্রের চালক চাবির একটি বিশেষত্ব ছিল। চালক চাবিটির গায়ে নির্দিষ্ট দুটি স্থানে চাপ দেওয়ার পরে অক্ষরের চাবিতে আঘাত করলেই যথাক্রমে উপরে ও নীচে লেখা হয়ে যেত। 'পার্শ্ব সংযোগ' অর্থাৎ 'ব্ব' 'চ্ছ' 'শ্চ' ইত্যাদির অনুরূপ সংযোগ সাধনের জন্য 'কাগজবাহী গাড়িতে' (carriage) ব্যবস্থা ছিল। লেখার সময় ক্যারেজের একটা নির্দিষ্ট স্থানে আঘাত করলেই সংযোগ হতে যেত। যেসব যুক্তাক্ষর সংযোগের পর মূল অক্ষরের আকৃতির আমূল পরিবর্তন ঘটে, যেমন 'ক্ষ' 'ষ্ম' কি 'খ্র', সেই যুক্তাক্ষরগুলি সবই ছিল যন্ত্রে। সংখ্যাবাচক অক্ষর, যেমন ১, ২, ৩ ইত্যাদি, টাকা গণ্ডার এবং পণ নির্দেশক চিহ্ন অক্ষর বা ইলেক সমস্তই সন্নিবেশিত ছিল। ফলে টাকা, চৌক, পণ, গণ্ডা, জমিজমা-সংক্রান্ত কাজে দ্রোণ, পাখী, কাণি, গণ্ডা, কড়া, ক্রান্তি কি বিঘা, কাঠা ইত্যাদি যাবতীয় চিহ্ন লেখার সুযোগ ছিল।

প্রবন্ধকার জানান, যন্ত্রটির অক্ষর-বিন্যাস ও কার্যপ্রণালীর পেটেন্ট রেজিস্ট্রি কবা হয়েছে এবং "এ যন্ত্র বাঙ্গালা-সাহিত্য-ক্ষেত্রে এক নবযুগের সূচনা করবে।" চাকরিজীবী স্বল্পবিত্ত উদ্ভাবককে আর্থিক সহায়তা করার জন্য তিনি 'বঙ্গীয় গভর্নমেন্টের তৎপরে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ও বাঙ্গালার সাহিত্যসেবীগণের ও অবশেষে সমর্থ বাঙ্গালী'—সবাইকে অনুরাধ করেন, "বাঙ্গালা ভাষা যাঁহাদের আপন, বাঙ্গালা সাহিত্য যাঁহাদের আদরের জিনিস, তাঁহাদের সকলেই সত্যরঞ্জনবাবুর এই সাধু উদ্যমকে সাহায্য সহানুভূতি ও উপদেশ দ্বারা সফল করিয়া তুলিবেন আশা করি।"

সত্যরঞ্জনের লেখার যন্ত্র উদ্ভাবনের কম করে দশ বছর আগে তরুণ বাঙালি আশুতোষ মল্লিক একটি অভিনব গণক যন্ত্র বা ক্যালকুলেটর তৈরি করেন। কালীঘাটের দশ নম্বর সাহানগরের এই বাসিন্দার যন্ত্রটিতে যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ—সবই করা যেত। শুধু সরল অঙ্ক নয়, টাকা আনা পয়সা বা পাউন্ড শিলিং পেন্স নিয়ে 'কম্পাউন্ড' হিসেবের কাজও সম্পন্ন হতো। 'দা ডন অ্যান্ড ডন সোসাইটি'র পত্রিকায় (অগাস্ট ১৯০৯) যন্ত্রটিকে মৌলিক চিন্তাপ্রসূত বলা হয়। ডিজাইন যেমন সরল, তেমনই সহজ যন্ত্রচালনা। আশা প্রকাশ করা হয়, হিসেব-রক্ষণের ক্ষেত্রে যন্ত্রগণকটি যুগান্তর আনবে।[৩]

সেকালের পরিচিত জার্মান ক্যালকুলেটর ব্রান্সউইগ ছিল অনেক স্থূল। ব্যবহারবিধির দিক থেকেও ঢের জটিল। সময়সাপেক্ষ। সামান্য একটা যোগ করার সময়েও লিভার ঠেলা, হাতল ঘোরানো, ক্যারেজ সরানো ও উইং-নাট টাইট করা ইত্যাদি নানা ঝঞ্ঝাট। সেইজন্যই এই যন্ত্রটি সরকারী বা অন্য অফিসে তেমন প্রচলিত হয়নি। তুলনামূলক ভাবে, মল্লিকের গণক-যন্ত্র একটি চোদ্দ বছরের ছেলেও স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করতে পারে বলে উল্লিখিত হয়। সবচেয়ে বড় সুবিধে ছিল, যন্ত্রচালক তার হিসেবের খাতার ওপর চোখ রেখেই পুশ্-বার ও প্রেস-বাটনের সাহায্যে সোজাসুজি অঙ্ক কষতে পারতেন। অনেকটা টাইপ-রাইটার ব্যবহারের মতো। তাছাড়া জার্মান যন্ত্রটি টাকা আনা পয়সা বা পাউন্ড শিলিং পেন্সের হিসেব করতে পারতো না। দামেও মল্লিকের যন্ত্র অনেক সস্তা, মাত্র একশো টাকা। জার্মান যন্ত্রের এক-চতুর্থাংশ।

মল্লিকের যন্ত্রের তিন বিশিষ্ট ব্যবহারকারীর প্রশংসাপত্র থেকে 'ডন' পত্রিকার প্রতিবেদক উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, 'ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অফ কালটিভেশন অফ সায়েন্স'-এর ডক্টর অমৃতলাল সরকার ও বীজগনিতের পাঠ্যপুস্তক প্রণেতা এস· সি· বোস মল্লিকের

উদ্ভাবন-পটুত্বের ও যন্ত্রটির প্রশংসা করেন । আশুতোষ মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন, "It shows distinct improvement upon the machine now in use."

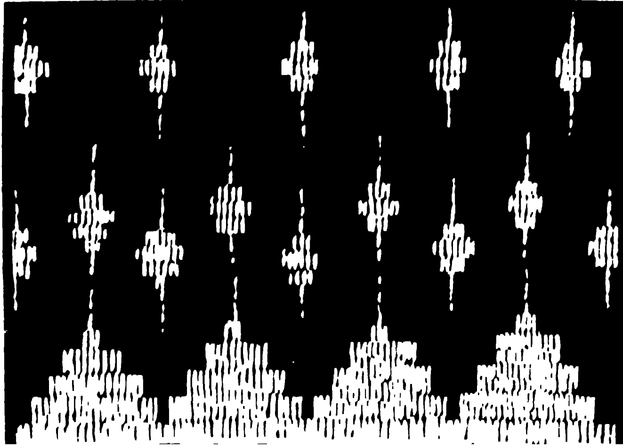
প্রতিবেদনে বলা হয় যে, স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যন্ত্রটি ভারতে 'রেডি মার্কেট' লাভ করবে । তাছাড়া বিদেশে রপ্তানির পক্ষেও এটি একটি সম্মানজনক বস্তু । কিন্তু তরুণ উদ্ভাবকের আর্থিক সঙ্গতি অতি সামান্য । একটি যন্ত্র তৈরি করার পর তাঁর এমন অবস্থা হয় যে, মেশিনটির পেটেন্ট নেওয়ার প্রাথমিক ব্যয় বহন করাই প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে । কাজেই আর্থিক সাহায্য ও সহযোগিতা ভিন্ন উদ্ভাবনটির অকালমৃত্যু যে অবধারিত, সে-কথা তখনই উচ্চারিত হয় । ডক্টর রাসবিহারী ঘোষ, 'সায়েন্টিফিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাসোসিয়েশন'-এর যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ ও নরেন্দ্রনাথ সেন এবং বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইন্সটিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা তারকনাথ পালিতের সাহায্য প্রার্থনা করার জন্য তরুণ উদ্ভাবককে পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল ।

'ডন'-এর প্রবন্ধে বলা হয়েছিল, মল্লিক তাঁর গণক-যন্ত্র নির্মাণের আগে আরও দুটি যন্ত্র তৈরি করেছিলেন । স্বয়ংক্রিয় 'ডাব্‌ল লুম্' (বয়ন যন্ত্র) ও রাইস হালার্ (ধান ও তুষ স্বতন্ত্র করার যন্ত্র) । কিন্তু অর্থাভাবে কিছুই করতে পারেননি শেষ পর্যন্ত ।

সদ্যঃস্নান-সিক্তবসনা, চিকুর সিন্ধুশীকরলিপ্ত ;
ললাটে গরিমা, বিমল হাস্যে অমলকমল-আনন দীপ্ত ;
উপরে গগন ঘেরিয়া নৃত্য করিছে -- তপন তারকা চন্দ্র ;
মন্ত্রমুগ্ধ, চরণে ফেনিল জলধি গরজে জলদমন্দ্র ।
ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণ-কমল করিয়া স্পর্শ ;
গাইল, "জয় মা জগন্মোহিনি, জগজ্জননি, ভারতবর্ষ"।

শীর্ষে শুভ্র তুষারকিরীট ; সাগর-ঊর্মি ঘেরিয়া জঙ্ঘা ;
বক্ষে দুলিছে মুক্তার হার -- পঞ্চসিন্ধু যমুনা গঙ্গা ।
কখন মা তুমি ভীষণ দীপ্ত তপ্ত মরুর ঊষর দৃশ্যে ;
হাসিয়া কখন শ্যামল শস্যে, ছড়ায়ে পড়িছ নিখিল বিশ্বে !
ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণ-কমল করিয়া স্পর্শ ;
গাইল, "জয় মা জগন্মোহিনি, জগজ্জননি, ভারতবর্ষ" ॥

সত্যরঞ্জন মজুমদারের তৈরি টাইপরাইটারে লেখার নমুনা



# কল করেছেন হরেক রকম....

'জীবনস্মৃতি'তে স্বদেশী গামছা ও স্বদেশী দেশলাই-এর যে-সুখ্যাতি রবীন্দ্রনাথ করেছেন তাতে এসব জিনিসের উদ্ভাবকের হাসির গল্পের চরিত্র ছাড়া আর কোনো ভূমিকা থাকার কথা নয়। অনেক পরে ১৯০৫-এ আবার নতুন স্বদেশিয়ানার হাওয়া বইতে শুরু করলে প্রায় একই সুরে সুকুমার রায়ও দিশি উদ্ভাবন নিয়ে রসিকতা করেছিলেন, "দেখতে খারাপ, টিকবে কম দামটা একটু বেশি।" এর মধ্যে সত্য নিশ্চয় ছিল কিন্তু নির্বিচারে সব দিশি উদ্ভাবকদের 'খুড়োর কল' তৈরির অভিযোগে বাতিল করা যাবে না।

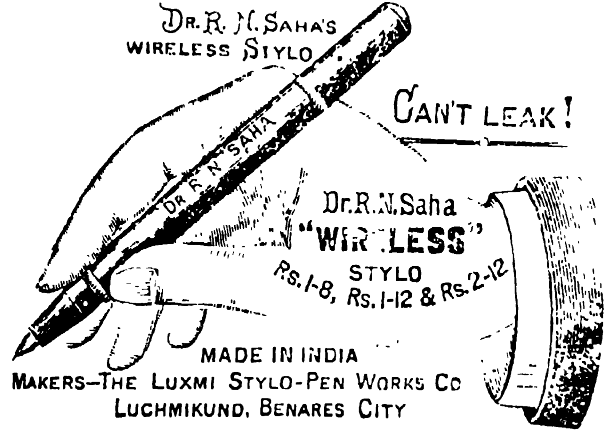
ছেলেবেলায় মাস্টারমশাইদের এক বিপুল ফৌজ রবীন্দ্রনাথকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিল। তাঁদের মধ্যে ব্যতিক্রম ছিলেন প্রাকৃতবিজ্ঞানের শিক্ষক সীতানাথ ঘোষ। রবীন্দ্রনাথের কৌতূহল জাগাতে পেরেছিলেন তিনি। সীতানাথ ছিলেন কলকব্জা তৈরিতে সিদ্ধহস্ত।

১৮৭০-এ 'হিন্দুমেলা'র চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশনের পর 'জাতীয় সভা'য় যন্ত্র বিষয়ে বক্তৃতা দেওয়ার সময় তিনি নিজের তৈরি 'এয়ার পাম্প' ও 'যন্ত্রচালিত তাঁত' প্রদর্শন করেন।[১]

সীতানাথ দাবি করেন, এই 'তন্তু যন্ত্রে' একজন লোকে চারজনের কাজ করতে পারবে। ব্যবহারিক বিজ্ঞানের গবেষণায় বিশেষ আগ্রহী সীতানাথ 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'তেও প্রবন্ধ লিখেছেন। জাতীয় সভায় সীতানাথের ওই বক্তৃতা সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা হয়েছিল 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য়। ১৮৭০-এর ২৪ মার্চ প্রতিবেদক লিখলেন :

"বাবু সীতানাথ ঘোষের বাটি যশোহর, রায়গ্রামে। অবস্থা ভাল না থাকায় এবং অন্যান্য কারণবশতঃ তিনি কলেজে পাঠ সমাপ্ত করিতে পারেন নাই। এক্ষণে কলিকাতায় অল্প বেতনে কেরানিগিরি করিতেছেন। সীতানাথবাবুর বয়স অল্প কিন্তু অতি শৈশবকাল অবধি তাঁহার মনের গতি এক দিকে-নূতন যন্ত্র নির্ম্মাণ করা।




আর. এন. সাহা-র কলম

"আমাদের যতদূর স্মরণ হয়, সীতানাথবাবুর প্রথম যত্নের ফল, নূতন একরূপ ঘানি গাছ....আমরা তাঁহার দুইটি যন্ত্রের চিত্র দেখিয়াছি, একটিএয়ার পাম্প আর একটি এঞ্জিন। এয়ার পাম্পে তিনি কৃতকার্য হইয়াছেন। এক্ষণে তিনি তাহার পেটেন্ট লইতে পারেন, কিন্তু তাহাতে লাভ কি, তাঁহার এয়ার ইঞ্জিন সম্পূর্ণ হয় নাই, কিন্তু যতদূর হইয়াছে তাহাতে তাঁহার বিস্তর বুদ্ধির পরিচয় আছে। এ যন্ত্রের উদ্দেশ্য বাষ্পের পরিবর্তে সামান্য বায়ু ব্যবহার করা ও বায়ুর স্থিতিস্থাপকত্ব শক্তিকর্তৃক যন্ত্রের গতি দেওয়া।"

জাতীয় মেলার পঞ্চম অধিবেশনে গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁর তৈরি একটি চরকা প্রদর্শন করেন ও সীতানাথ ঘোষ 'এই কলটিতে কত উপকারের সম্ভাবনা তাহা সভ্যগণকে বুঝাইয়া দেন।'[২]

১৮৭৬-এ মেলার দশম অধিবেশনেও গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় অংশ নিয়েছিলেন। তাঁর তৈরি একটি হরফ ও কাগজ বানানোর কল প্রদর্শিত হয়েছিল।[৩]

হিন্দু মেলার পঞ্চম অধিবেশনে (১৮৭১) ও নবম অধিবেশনেও (১৮৭৫) সীতানাথের তৈরি চরকা ও বয়নযন্ত্র প্রদর্শিত হয়।[৪] সীতানাথ প্রদর্শিত চরকা সম্বন্ধে 'সুলভ সমাচার' (২১ ফেব্রুয়ারি ১৮৭১) জানিয়েছিল, "আমাদের বহুকালের বৃদ্ধ মাতামহী চরকা সমস্ত দিন ঘেনর-ঘেনর করিয়া চালাইলেও তাহার নিকট হইতে চার আনার সূতা পাওয়া মুস্কিল, কিন্তু একটি ভদ্রলোক নূতন রকমের সূতার কল প্রস্তুত করিয়া দেখাইয়াছেন, তাহাতে তিন জায়গায় চাকা ঘুরিয়া সূতা হইতেছে এবং তাহা আপনা আপনি জড়াইয়া যাইতেছে। বারবার হাত উঁচু করিয়া একবার সূতা কাটা একবার সূতা জড়ান

সে ভোগ ইহাতে ভুগিতে হয় না। খানিকটা তুলা থেকে এক সময়েই সূতা কাটা ও জড়ান হইতেছে। একটি ত্রুটি দেখা গেল যে সূতা বরাবর এক আঁচের হইতেছে না। এক একবার মোটা এবং সরু হইয়া পড়িতেছে। আশা করি এ দোষটির শীঘ্রই নিরাকরণ হইবে।"

১৮৭৫-এ সীতানাথ উৎপন্ন কাপড়ের যে নমুনা প্রদর্শন করেন সেটি এমন একটি কলে তৈরি হয়েছিল যা "গোরু, মহিষ, বাষ্প কিম্বা মনুষ্যদ্বারা [চালিত] হইতে পারে। একজন লোক একদমে এই কল দ্বারা বিশ হাত কাপড় বুনিতে পারে।"[৫]

'সঞ্জীবনী' সভার সদস্য ব্রজবাবু যে গামছাটি মাথায় বেঁধে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে তাণ্ডব-নৃত্য করেছিলেন তা সীতানাথ ঘোষের যন্ত্রেই নির্মিত কিনা বলা কঠিন। প্রায় একই সময়ে আরও কয়েকজন বাঙালি বস্ত্রবয়ন যন্ত্র তৈরি করেছিলেন।

১৮৭৭-এর ১৩ মার্চ 'সমাচার চন্দ্রিকা' লিখছে, " 'হিন্দু হিতৈষিণী' বলেন, বাবু দীননাথ সেনের বস্ত্রের কল ক্রয় করিবার জন্য কুমারখালী হইতে দীনবন্ধু প্রামাণিক আমাদিগকে পত্র লিখিয়াছেন।.... বাবু মহেন্দ্রনাথ নন্দীও একটি বস্ত্রের কল প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহাতে এক ঘণ্টায় একখানি বস্ত্র হইতে পারে, ইহা হইলে দীনবাবুর যন্ত্র অপেক্ষা উহার উৎকৃষ্টতা স্বীকার করিতে হয়।"[৬]

একই পত্রিকা ওই বছরের ৫ এপ্রিল লিখল, "আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম বাবু দেবেন্দ্রনারায়ণ বসাক কলিকাতায় একটি তেলের কল বাষ্প দ্বারা চেষ্টা পাইতেছেন, বাবু সীতানাথ ঘোষ, বাবু মহেন্দ্রনাথ নন্দী ও বাবু দীননাথ সেন, বস্ত্র বুনিবার কল প্রস্তুত করিয়াছেন—পাথুরিয়াঘাটার বাবু আনন্দচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মুদ্রাযন্ত্র নিৰ্ম্মাণ করিয়াছেন, বাবু গিরীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সুতার কল প্রস্তুত করিয়াছেন, মহেন্দ্রনাথ নন্দী দেশলাই প্রস্তুত করিয়াছেন।"

কাপড়ের কল নিয়ে দ্বিধা যাই থাক, সেই স্বদেশী দেশলাই, যার এক বাক্স তৈরি করতে যা খরচ পড়ত তাই দিয়ে একটি পল্লীর সংবৎসরের চুলা-ধরানো চলত, তার নির্মাতা নিঃসন্দেহেই মহেন্দ্রনাথ নন্দী।

১৮৭৭-এর ২১ ফেব্রুয়ারি 'একটি শুভ চিহ্ন' শিরোনামে 'সমাচার-চন্দ্রিকা' লিখছে, "আজ আমরা একটি নূতন দেশলায়ের বাক্স দেখিলাম। বাক্সটীর আকার বিলাতি ব্রায়ান্ট এবং মে-র সেফটিম্যাচের ছোট বাক্সের ন্যায়। পাতলা পাতলা দেবদারু কাঠেই সুন্দর রূপে বাক্সটী নিৰ্ম্মিত হইয়াছে। দুই ধারে দেশলাই ঘষিবার মসলা মাখান। কাঠিগুলি দেবদারু কাঠের না হইয়া বাঁসের করা হইয়াছে, ঘর্ষণ মাত্রেই উত্তম জ্বলিয়া উঠিল, কিন্তু একটু ঠাণ্ডা লাগিলে বাঁসের কাষ্ঠ যেমন সহজেই শীতল হইয়া জ্বলন শক্তির হ্রাস হয় এগুলিকেও সে দোষ হইতে মুক্ত দেখিলাম না। নিৰ্ম্মাতারা আজিও বাজারে বাহির করিতে পারেন নাই, বোধ হয় শীঘ্রই বাহির হইবে। সাধারণকে আমাদের বিশেষ অনুরোধ যেন সকলেই এখন হইতে এই দেশলাই ক্রয় করেন....অবশ্যই নূতন অবস্থায় দুই একটি দোষ দেখিতে পাইবেন, কোন কাৰ্য্যই প্রথমে একেবারে নিৰ্দ্দোষি হইতে পারে না, লোকের উৎসাহ পাইলে ক্রমে অবশ্যই সে সমস্ত দোষ চলিয়া যাইবে।..... আমরা এই দেশলাই প্রস্তুতকারী বাবু মহেন্দ্রনাথ নন্দীকে তাঁহার বিপুল পরিশ্রমের জন্য অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিয়া একটি অনুরোধ করি তিনি অগ্রে উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া বাজারে বাহির করেন।"

মহেন্দ্রনাথ নন্দী শেষ পর্যন্ত দেশলাই উৎপাদনে ও বস্ত্র বয়ন যন্ত্র নির্মাণেও সফল হয়েছিলেন। ১৯২১-এর 'ভারতবর্ষ' পত্রিকা থেকে জানা যায়, তাঁর আদি বাড়ি ছিল ত্রিপুরা জেলার কালিকচ্ছ

গ্রামে। কলকাতায় এসে মেডিকেল কলেজে অধ্যয়ন করার সময়ে পটুয়াটুলি লেনে বাস করতেন। তাঁর স্বপ্ন সফল হয় যখন ঢাকার নারায়ণগঞ্জে গোবিন্দ ম্যাচ ফ্যাক্টরি তাঁর তৈরি কল বসিয়ে দেশলাই উৎপাদন শুরু করে।[৭]

১৯০৮-এ প্রকাশিত জি· এন· গুপ্তর সরকারী রিপোর্ট অনুসারে মহেন্দ্রনাথ নন্দীর উদ্যোগে কুমিল্লার কুড়িজন তন্তুবায় উন্নত ধরনের 'ফ্লাই-শাট্‌ল লুম' ব্যবহার শুরু করেন।[৮]

আরেক বাঙালি উদ্ভাবক দেশলাই তৈরির যন্ত্র তৈরি করেছিলেন ১৯০৬ নাগাদ। ইন্ডিয়ান ম্যাচ ফ্যাক্টরির প্রাক্তন ম্যানেজিং এজেন্ট ও ইঞ্জিনিয়ার ডি· এন· কর্মকার সস্তা ডিপিং ও ফিলিং মেশিন ও স্কোরিং ব্লক ইত্যাদি তৈরি করেন। কলকাতার ২ নম্বর হলধর বর্ধন লেন থেকে এইসব সামগ্রী বিক্রি হতো।[৯]

শুধু কলকাতা নয়, বাংলাদেশেরও কিছু সুতো ও কাপড় তৈরির কল-নির্মাতা বা নতুন কৌশল উদ্ভাবনকারীর পরিচয় পাওয়া যায় ১৯০৮ সালের একাধিক রিপোর্ট থেকে।

তেজপুরের মনোমোহন লাহিড়ি 'ওয়ার্পিং' ও 'সাইজিং'-এর প্রচলিত পদ্ধতির উন্নতি-সাধন ও ছয় ববিন বিশিষ্ট একটি কলও তৈরি করেন।[১০] জি· এন· গুপ্ত তাঁর রিপোর্টে বিশেষভাবে সুপারিশ করেন, শিলচরের মীর আসগর আলিকে এককালীন পাঁচশো টাকা অনুদানের জন্য। তিনি তখন একটি হ্যান্ড স্পিনিং মেশিন উদ্ভাবনের জন্য পরীক্ষা চালাচ্ছিলেন।[১১] শ্রীরামপুরে ব্যবহৃত 'ফ্লাই শাট্‌ল লুম' নির্মাণ প্রথম শুরু করে চুঁচুড়ার ঘোষ, চৌধুরী অ্যান্ড কোম্পানি। তারপর ঘোষ, পালিত অ্যান্ড কোম্পানি ও পি· এন· দে-র কারখানায় সেগুলি তৈরি হতো।[১২]

১৯০৬-এর 'ডন' পত্রিকা থেকেও আরও কিছু উদ্ভাবক ও নির্মাতার পরিচয় পাওয়া যায়। ভবানীপুরের ডি· এম· কীর্তিকারের কাছে পাওয়া যেত খুলনার বি· রাহার তৈরি স্পিনিং যন্ত্র।[১৩] চন্দননগরের বি· কে· ঘোষ অ্যান্ড কোম্পানি একটি সাধারণ ফ্লাই শাট্‌ল লুম (৫০ টাকা) ও একটি উন্নততর প্যাড্‌ল লুম (১৫০ টাকা) বিক্রি কবতো।[১৪] চুঁচুড়ার হেমশশি সোম ও মিস্টার ব্যানার্জি বানাতেন ডাব্‌ল ফ্লাই শাট্‌ল লুম।[১৫] ৩৮ নম্বর রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রিটের এ· সি· মল্লিক শুধু কাপড় বোনার কল তৈরি করেননি, বয়নবিদ্যা শিক্ষার একটি স্কুলও চালিয়েছিলেন কিছুদিন।[১৬]

বাখরগঞ্জের নলচিদা স্কুলের শিক্ষক ঈশানচন্দ্র মজুমদার একটি বস্ত্র বয়নযন্ত্র ছাড়াও ছবি আঁকার যন্ত্র, অভিনব যান্ত্রিক পাখা, তালা ও হাস্কিং মেশিন ইত্যাদি উদ্ভাবন করেছিলেন।[১৭]

তবে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের মধ্যে তৈরি যাবতীয় বয়নযন্ত্রের মধ্যে 'দীনবন্ধু লুম'—এরই বিশেষ কদর হয়েছিল। ১৩১০ সালে প্রকাশিত 'কমলা' পত্রিকার প্রথম সংখ্যা থেকে জানা যায়, দীনবন্ধু মুখোপাধ্যায় 'একজন অবসরপ্রাপ্ত প্রাচীন ইঞ্জিনিয়ার।'[১৮] বাড়ি ব্যাপারীটোলা। বৃদ্ধ বয়সে তিনি একটি 'কাপড়ের টানার কল' তৈরি করেন। ১৩১১-র ভাদ্র সংখ্যা 'কমলা'-য় দীনবন্ধু মুখোপাধ্যায় তাঁর উদ্ভাবিত যন্ত্রের বিবরণ প্রকাশ করেন (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য), "সাধারণ লোকের সহজে বস্ত্র বয়ন কার্য্য নির্ব্বাহ হেতু বস্ত্রের লম্বা টানা তৈয়ারি করিবার কারণ একটি হস্তচালিত ওয়ার্প মেশিন গবর্নমেন্ট হইতে পেটেন্ট লইয়া প্রস্তুতি করিয়াছি। কলটীর নাম Hand Power Warp Machine for Weaving All Sorts of Textures।"[১৯]

১৮৮৪-তে বৈদ্যবাটীর বাসিন্দা ও কলকাতার অ্যান্ডারসন রাইট অ্যান্ড কোম্পানির কেরানি প্রাণকৃষ্ণ মুখার্জি দড়ি তৈরির কল নির্মাণ করে কলকাতার আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে সার্টিফিকেট অফ

মেরিট লাভ করেন। 'স্টেটসম্যানের' সংবাদদাতা লিখেছিলেন, ইয়ং বেঙ্গলের যাবতীয় প্রয়াসের মধ্যে এইটিই সেরা।[২০]

১৮৮৫-তে স্থাপিত ২ কালাচাঁদ লেনের কে· সি· বসু অ্যান্ড কোম্পানির স্বত্বাধিকারী কালীচরণ বসু বিস্কুট প্রস্তুতের জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় কলকব্জা নিজে উদ্ভাবন ও প্রস্তুত করেছিলেন। পার্ল বার্লি ও বার্লি পাউডার নির্মাতা হিসেবও দীর্ঘকাল এই কোম্পানি সুনামের সঙ্গে ব্যবসা করেছে। বাঙালির দ্বিতীয় বিস্কুট কোম্পানি 'লিলি'র প্রতিষ্ঠাতা পি· শেঠ অ্যান্ড কোম্পানি (স্থাপিত ১৮৮৭)। এই কোম্পানির কারিগরি বুদ্ধিদাতা ও অন্যতম অংশীদার বিনয়কৃষ্ণ শেঠ উদ্যোগী মানুষ ছিলেন। ইলেক্ট্রো ও হাফটোন ব্লক, 'সুষমা' তেল ইত্যাদিও প্রস্তুত করতেন তাঁরা।[২১]

চেতলার প্রসিদ্ধ উকিল কাশীশ্বর ঘটকের পুত্র জগদীশ্বর মাত্র আঠার বছর বয়সে ১৮৮৫ নাগাদ তিন চাকার একটি জলচর সাইকেল তৈরি করেন। জ্যোতির্ময় ঠাকুর, সাজাহানপুরের রাজা ও বর্ধমানের মহারাজা প্রমুখ তাঁর কাছ থেকে এই অদ্ভুত কলের নৌকা কিনেছিলেন।[২২] ১৮৯৬ সালের 'স্টেটসম্যান" পত্রিকা থেকে জানা যায় জগদীশ্বর ঘটক একটি ধানভানা কল (রাইস হাস্কিং মেশিন) ও পাংখা-পুলিং মেশিনও তৈরি করেছেন এবং শেষোক্ত মেশিনটির জন্য অবিলম্বে পেটেন্ট নেবেন।[২৩] ১৮৯৮-এর ইন্ডাস্ট্রিয়াল এগ্‌জিবিশনে জগদীশ্বরের রাইস হাস্‌কিং মেশিনটি স্বর্ণপদক লাভ করেছিল। ১৮৯৮ সালেই, ৪২ নম্বর চেতলা রোডের বাসিন্দা জগদীশ্বর ঘটক ৪৩৬ নম্বর পেটেন্ট পেয়েছিলেন তাঁর 'বয়েল্‌ড রাইস কুকিং অ্যাপারেটাস'-এর জন্য।[২৪] কলকাতার পেটেন্ট অফিসের কাগজপত্র থেকে আরও দেখা যায় ১৯০২-এ ১৭৬ নম্বর এবং ১৯০৪-এ ৩৬ নম্বর পেটেন্ট দাখিল করেছিলেন জগদীশ্বর। (প্যাডি হাস্কিং অ্যান্ড ক্লিনিং মিল এবং মেশিনারি ফর ট্রিটিং প্যাডি উইথ স্টিম, হট অর কোল্ড এয়ার)।

প্রায় একই সময়ে পেটেন্ট তালিকায় আরও দুই বা তিন ঘটক পদবীধারীর নাম পাওয়া যায়। এস· ঘটক 'রিভলভিং ড্রায়ার ফর গ্রেন', এল· ঘটক 'স্পেশাল অ্যালয় অফ কপার, অ্যালুমিনিয়ম অ্যান্ড গোল্ড' এবং সুরপতি ঘটক 'প্যাডি বয়লার অর স্টিমার'-এর পেটেন্ট নিয়েছিলেন।

১৮৯৯-এর ইন্ডাস্ট্রিয়াল এগ্‌জিবিশনে প্রদর্শিত হয় কেদারনাথ চক্রবর্তী উদ্ভাবিত 'দা ইজি প্রিন্টার' নামে অভিনব মুদ্রণযন্ত্র। 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র সংবাদে প্রকাশ, সরকারী মুদ্রণ বিভাগের ডেপুটি সুপারিন্টেন্ডেন্ট যন্ত্রটি পরীক্ষা করে বলেছিলেন যে, এটি প্রিন্টিং প্রেস ও হ্যান্ড প্রেসের একটি সংমিশ্রণ, নির্মাণ-কৌশল অত্যন্ত সরল এবং দাম হ্যান্ড প্রেসের এক-চতুর্থাংশ মাত্র।[২৫] ১৯০১-এর ২৭ ফেব্রুয়ারি কেদারনাথ তাঁর প্রিন্টিং প্রেস উইথ রোলার অ্যান্ড র‍্যাক্স -এর জন্য পেটেন্ট লাভ করেন। 'চরকা' তৈরির জন্য ১৯০৭-এ আর একটি পেটেন্ট নিয়েছিলেন তিনি।[২৬]

কলকাতার বাইরে বাঙালি উদ্ভাবক ও যন্ত্রশিল্পীদের মধ্যেও কয়েকজনের কথা এখানে উল্লেখ না করাটা অমার্জনীয়।

১৮৯০-এ ই· ডব্লুউ· কলিন লিখছেন যে, 'ভারতের ম্যাঞ্চেস্টার' কাঞ্চননগরের সেরা যন্ত্রী প্রেমচাঁদ মিস্ত্রি। স্বশিক্ষিত এই মানুষটির কারখানায় তখন পনেরজন কারিগর কাজ করেন। বাংলা ও বোম্বাই সরকারের স্টেশনারি বিভাগের জন্য যাবতীয় ছুরি কাঁচি তারাই সরবরাহ করতেন। প্রেমচাঁদ নিজের কারখানায় ছুরি কাঁচির ফলায় শান দেওয়ার জন্য একধরনের লেদ-যন্ত্র উদ্ভাবন করেন।[২৭] এর প্রায় আঠার বছর পরে জে· জি· কামিং তাঁর রিপোর্টে জানিয়েছেন, প্রেমচাঁদ একটি অয়েল ইঞ্জিন দিয়ে

তাঁর লেদ চালাতে শুরু করেছেন ।[২৮]

কামিং-এর রিপোর্ট থেকে বিষ্ণুপুরের তিরিশ মাইল দূরে শাসপুরের দক্ষ কারিগর মাখন কর্মকারের কথাও জানা যায় । তিনি সেলাই কলের মতো পায়ে-চালানো লোহার লেদ তৈরি করেছিলেন ।[২৯]

বিংশ শতাব্দীর শুরুতে ঢাকায়, 'শর্মাজি আয়রন ওয়ার্কস' নামে একটি ঢালাই লোহার কারখানা স্থাপন করেন জমিদার রাজেন্দ্রনাথ শর্মা । কারখানার ম্যানেজার ছিলেন কানাইলাল কর্মকার । কানাইলাল কোনো কারিগরি শিক্ষা পাননি, কিন্তু তাঁর দক্ষতা ছিল কিংবদন্তি । তাঁর পরিকল্পনা অনুসারে স্টিম ফার্নেস বসানো হয়েছিল এবং ঢালাই লোহার রেলিং, আলোর স্তম্ভ, গেট ইত্যাদি তৈরি হতো । কয়েকটি স্টিমারের মেরামতির কাজও করা হয়েছিল আর ঢাকার কয়েকটি লোহার ব্রিজ সারানোর কাজ অবিলম্বে গ্রহণ করার কথা ছিল ।[৩০]

ইটাখোলার প্রকাশচন্দ্র রায় টালি বানাতেন । গুপ্ত তাঁর রিপোর্টে বলেছেন, মানের দিক থেকে তা রানীগঞ্জের বার্ন অ্যান্ড কোম্পানির চেয়ে কোনো অংশে ন্যূন নয় । দশ হাজার টাকা সরকারী অনুদানের জন্য গুপ্ত তাঁদের হয়ে সুপারিশ করেন ।[৩১]

১৮৮৯-এ বাঁটরার ফকিরচন্দ্র দাস তাঁর উদ্ভাবিত 'সুগারকেন মিল্'-এর উন্নত সংস্করণের জন্য দুটি পেটেন্ট পেয়েছিলেন (৪১ ও ৪২ সংখ্যক) রেভিনিউ ও এগ্রিকালচারাল ডিপার্টমেন্ট থেকে । 'দা বেঙ্গল টাইম্স' এই সংবাদ জানিয়ে মন্তব্য করেছিল, "we have rarely ever seen so encouraging an announcement."[৩২]

পটুয়াখালির গোপালচন্দ্র কর্মকার বানিয়েছিলেন (১৯০৫) নিব তৈরির ইস্পাতের যন্ত্র । দিনে প্রায় পাঁচশো নিব উৎপাদনে সমর্থ ।[৩৩]

আখ পিষে রস বের করার জন্য কাঠের পেষণযন্ত্রের বদলে লোহার যন্ত্র তৈরি করে (১৯০৯) হাওড়ার রামনারায়ণ ব্যানার্জি অ্যান্ড সন্স । তিন রোলার বিশিষ্ট যন্ত্রের দাম পঁয়ষট্টি টাকা ।[৩৪]

উনিশ শতকের প্রবাসী বাঙালিদের মধ্যে কর্মোদ্যোগে প্রধান নেপালের রয়াল ইঞ্জিনিয়ার ক্যাপ্টেন রাজকৃষ্ণ কর্মকার । ১২৩৫-এ হাবড়া দফরপুর নামে এক স্থানে তাঁর জন্ম । পিতা মাধবচন্দ্র ছিলেন সামান্য কর্মকার । স্কুলের পড়া চালানোর খরচও তিনি বহন করতে পারেননি । বিভিন্ন কলকারখানায় হাতে-কলমে কাজ করার সূত্রেই রাজকৃষ্ণ কারিগরি শিক্ষা লাভ করেন । শিবপুরে আপকার কোম্পানিতে জাহাজ মেরামতি, রেলওয়ে ইঞ্জিন, বয়লার, জাহাজ ও সেতু ইত্যাদি নির্মাণ বা সংস্কারের কাজ, ম্যাথামেটিক্যাল ইন্সট্রুমেন্ট ওয়ার্কশপে অনুবীক্ষণ ও জরিপ যন্ত্রাদির সঙ্গে পরিচয়, তাছাড়া পলতার ওয়াটার ওয়ার্কস, ঘুসুড়ির জুট মিল, বালির পেপার মিল, কলকাতার মিন্ট, কাশীপুরের গভর্নমেন্ট গান ফাউন্ড্রি ও দমদমের কার্ট্রিজ অ্যান্ড বুলেট ফ্যাক্টরিতেও কাজ করেছিলেন তিনি । তাঁর প্রথম বড় কাজ, সিমলা পাহাড়ের কাছে কশৌলীতে ছয় অশ্বশক্তি বিশিষ্ট স্টিম ইঞ্জিন ও বয়লার বসিয়ে ময়দা ও পাউরুটি তৈরির তিনটি কল স্থাপন । ১৮৬৯-এ তিনি নেপাল যাত্রা করেন । সঙ্গে ছিলেন আরও পাঁচ কারিগর—শ্যামাচরণ কর্মকার, দিগম্বর লস্কর, গিরিশচন্দ্র কাঁসারী, কৈলাসচন্দ্র ঘোষ এবং যদুনাথ নন্দী । প্রথমেই রাজকৃষ্ণ নেপালের টাঁকশালের সংস্কার করেন । যন্ত্রযোগে মুদ্রা প্রস্তুত শুরু হয় । তারপর নেপালের অস্ত্রশস্ত্র উৎপাদনের আধুনিকীকরণের ভার নেন রাজকৃষ্ণ । একটি ঝরনার জল কেটে প্রবাহিত করে, তিনি পানিচাক্কি বসিয়েছিলেন কারখানার যন্ত্রাদি চালনার

জন্য। ১৮৭৬-৭৭ নাগাদ দেশে ফিরে আসেন রাজকৃষ্ণ। কয়েক বছর পরে, বারজন কারিগর সহ কাবুল যাত্রা করেন। কাবুলের বাবুরবাগে তিনটি অস্ত্র নির্মাণের কারখানা স্থাপিত করেন তাঁরা। কারখানার যন্ত্রাদি সরবরাহ করেছিলেন ওয়াল্টার লক্ অ্যান্ড কোম্পানি। দরবার থেকে আমীর যাতে সহজেই কারখানা পরিদর্শনে আসতে পারেন, তার জন্য রাজকৃষ্ণ একটি রেল লাইন স্থাপন করেন। একটি পাঁচ অশ্বশক্তির রেলইঞ্জিনও আনানো হয় গাড়ি টানার জন্য। আড়াই বছর কাবুলে কাটিয়ে দেশে ফেরার পরই আবার ডাক আসে নেপাল থেকে। ১৮৮৪-তে দ্বিতীয়বার নেপালে এসে একটি কামান ও বন্দুকের কারখানা ও কাঠের কারখানা স্থাপিত করেন। ১৮৮৬-তে তিনি 'ক্যাপ্টেন' খেতাব লাভ করেন। দু' বছর কাজের পর দু' মাস ছুটি পান তিনি এবং নেপালে ফিরে সেখানে প্রথম বৈদ্যুতিক আলো জ্বালার ব্যবস্থা করেন। উন্নত প্রণালীর কামান ও কামানবাহী শকট, এমনকি মেশিনগান নির্মাণেও সফল হয়েছিলেন রাজকৃষ্ণ।[৩৫]

রাজকৃষ্ণের মতোই সফল, কুশলী আর-এক প্রবাসী বাঙালি কারিগর বেণীমাধব মুখোপাধ্যায় কাচের তৈরি বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি নির্মাণে ছিলেন সিদ্ধহস্ত। এখানে ভারতে কাচশিল্প সম্বন্ধে কয়েকটি কথা জানানো দরকার। মুঘল আমলেই কিছু দক্ষ কাচদ্রব্য-নির্মাতা পারস্যবাসী ভারতে আসে। খাস কলকাতাতেও তাদেরই বংশধরদের সাক্ষাৎ পাই আমরা অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে। কলকাতার কাছারি থেকে ১৭৬৮ খ্রীস্টাব্দে কালি শিশগড় বাৎসরিক পাঁচশো টাকায় কাচের জিনিস তৈরি ও বিক্রির লাইসেন্স নিয়েছিলেন।[৩৬] ওই 'শিশগড়' বা 'কাচ-নির্মাতা' পদবীটিই তাঁর পারসিক ঐতিহ্য নির্দেশ করছে। ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দে চিৎপুরের রাস্তা দিয়ে ভোরবেলা জাহাজঘাটায় যাওয়ার পথে রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করেছিলেন, "কাবাবের দোকানের পাশেই ফুঁকো ফানুষ-নির্মাণের জায়গা, অনেক ভোর হইতেই তাহাদের চুলায় আগুন জ্বালানো হইয়াছে।"[৩৭]

ফুঁকো কাচ বা ফুঁ-দিয়ে কাচের জিনিস বানানোর কারিগররা কিন্তু উনিশ শতকের মধ্যেই প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যায়। শৌখিন ও সস্তা বিদেশী কাচের সঙ্গে তারা পাল্লা দিতে পারেনি। এমনকি ১৮৯০-এ স্থাপিত কলকাতার প্রথম আধুনিক রীতির কাচ তৈরির কারখানা, টিটাগড়ের 'দা পায়োনিয়ার গ্লাস ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি', দক্ষ ফুঁকো কারিগর বা গ্লাস-ব্লেয়ারদের অভাবেই শেষ পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।[৩৮]

এই প্রেক্ষাপটে বেণীমাধবের কৃতিত্ব বিস্ময়কর। এলাহাবাদ প্রবাসী বেণীমাধব ১৮৯১-এ রুড়কির ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ কেমিক্যাল ডেমনস্ট্রেটর পদে যোগ দেন। পরে অধ্যাপকের পদও লাভ করেন। গ্লাস ব্লোয়িঙে নৈপুণ্যের জন্য কলেজ কর্তৃপক্ষের বিশেষ অনুমতি পেয়ে তিনি রুড়কিতে নিজের কারখানা স্থাপন করেন। ১৯০৭ সালে তাঁর তৈরি কাচের বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদির যে-তালিকা প্রকাশিত হয়, তার সমালোচনা-সূত্রে প্রফুল্লচন্দ্র রায় জানান, শুধু প্রচলিত যন্ত্র নকল করাই নয়, তার সংস্কার ও উন্নতিসাধনের মধ্যেও রয়েছে বেণীমাধবের প্রতিভার স্বাক্ষর। সমালোচনাটি পরিশিষ্টে পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। প্রফুল্লচন্দ্র জানিয়েছিলেন, শুধু বই পড়েই বেণীমাধব গ্লাস-ব্লোয়িঙের বিদ্যা আয়ত্ত করেন।[৩৯] বেণীমাধব ১৯১১-য় কারখানাটি এলাহাবাদে নিয়ে আসেন এবং 'সায়েন্টিফিক ইন্সট্রুমেন্ট কোমপানি' নাম দেন।

ভারতে বৈজ্ঞানিক কাচযন্ত্র নির্মাণে তিনি শুধু পথিকৃত নন, তাঁর কাছেই এদেশের যাবতীয় কারিগর প্রথম পাঠ নিয়েছেন। বেণীমাধবের শিষ্য রাধারমণ দাসের কাছে থেকে শিক্ষা নিয়েছিলেন

ননীগোপাল সরকার, যাঁর প্রতিষ্ঠান 'সায়েন্টিফিক গ্লাস কোম্পানি লিমিটেড' কলকাতার গর্ব।[৪০]

উদ্ভাবনপটু আর-এক সার্থক বাঙালি ব্যবসায়ী ডক্টর আর· এন· সাহা কলম তৈরির কারখানা স্থাপন করেন বেনারসে। চুঁচুড়া নিবাসী রূপেই ১৯০০ সালে তিনি 'ওয়ারলেস স্টাইলো পেন্'-এর জন্য প্রথম পেটেন্টটি (১৮৭ সংখ্যক) লাভ করেন। এছাড়া স্টাইলো পেনের জন্য আরও পেটেন্ট নিয়েছিলেন তিনি : ইংলন্ডের পেটেন্ট সংখ্যা ১৮৫৮৩ (১৯০২), আমেরিকার পেটেন্ট সংখ্যা ৯৬২৯৮২ (১৯১০) এবং ভারতের পেটেন্ট সংখ্যা ২০০ (১৯০৪) এবং ৩৯৪ (১৯০৭)।

কলকাতা মেডিকেল কলেজের স্নাতক ডক্টর সাহা বেনারসে প্র্যাকটিশ করতেন। ১৯০৭-এ ১৬ ও ১৭ নম্বর লছমিকুণ্ডায় তিনি স্থাপন করেন 'লক্ষ্মি স্টাইলো-পেন ওয়ার্কস'—ভারতে একমাত্র ইঞ্জিন-চালিত পেন তৈরির কারখানা। ১৯১০-১১ সালে ৭৭/২ হ্যারিসন রোডে এই প্রতিষ্ঠানের একটি শাখা খোলা হয়েছিল।[৪১]

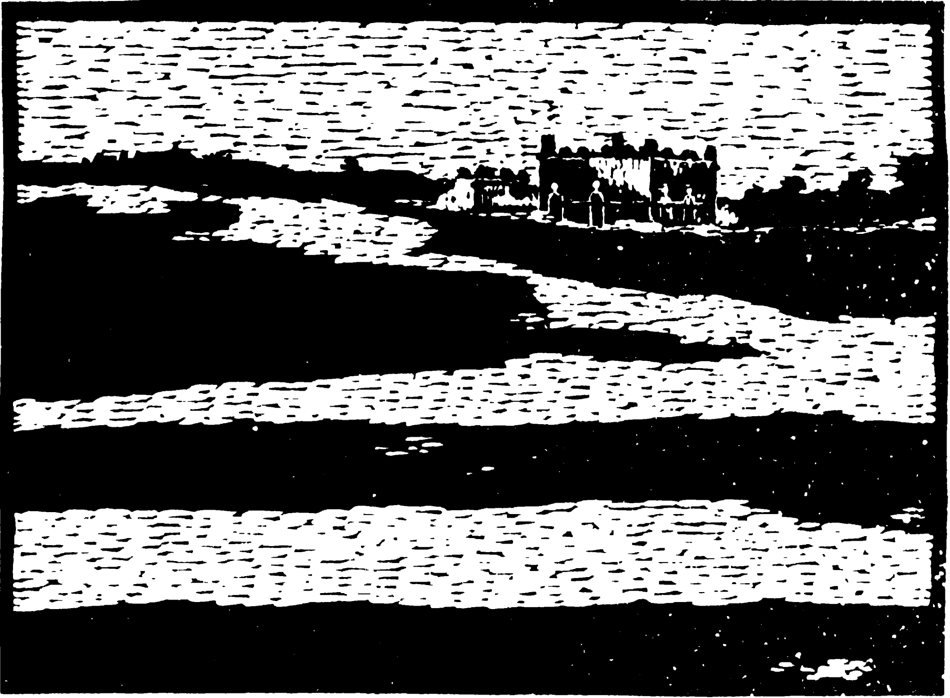
রাজশেখর বসুর পরেই 'বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস'-এর যে প্রযুক্তিবিদের নাম মনে পড়ে তিনি সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত। পরবর্তী জীবনে সৎ আদর্শবান গান্ধীবাদী হিসেবে তিনি অধিক প্রতিষ্ঠিত। সতীশ দাশগুপ্তের নিজের মুখ থেকে শোনার সৌভাগ্য হয়েছিল কলকাতায় নলকূপ বসানোর ক্ষেত্রে কিভাবে স্বদেশী উদ্যোগ ফলপ্রসূ হয়েছিল। বেঙ্গল কেমিক্যাল নিজেদের নলকূপ বসানোর প্রয়োজনে প্রথমে বিলিতি কোম্পানির দ্বারস্থ হয়েছিল। তখন অবধি দিশি কোনো প্রতিষ্ঠান এ-কাজে হাত দেয়নি। অত্যাধিক মুনাফা-লোভী বিলিতি কোম্পানিকে হটিয়ে শেষ পর্যন্ত বেঙ্গল কেমিক্যাল নিজেরাই নিজেদের নলকূপ বসানোর কাজ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়। কাজে সফল হওয়ার পর তারা কিছুদিন কলকাতার বিভিন্ন স্থানে নলকূপ বসানোর অর্ডারও গ্রহণ করে। সতীশবাবু বলে ছিলেন, তাঁদের ওই প্রাথমিক প্রয়াসে যে-কারিগরদের নিযুক্ত করা হয়েছিল তারা সবাই ছিল ওড়িয়া। কিছুদিনের মধ্যেই দেখা গেল এই কারিগররা নিজেরাই ছোটখাটো ব্যবসা শুরু করে দিয়েছে। বেঙ্গল কেমিক্যাল নলকূপ বসানোর কাজ ছেড়ে দেওয়ার পর এই ওড়িয়া সম্প্রদায় সে-দায়িত্ব সেই যে গ্রহণ করেছে, আজও সে ঐতিহ্য অপ্রতিহত। মনে পড়ে যায়, কলকাতার ছাপাখানার লাইনে এখনও মেদিনীপুরবাসীদের সংখ্যাধিক্যের কথা। বিদ্যাসাগর মহাশয় মারফত তাঁর গ্রামবাসীরা যে সুযোগ পেয়েছিল, বংশপরম্পরায় আজও তা প্রবাহিত। যাই হোক, নলকূপ প্রসঙ্গে 'ভাগীরথী' হ্যান্ডপাম্প উদ্ভাবক বাঙালি টিউবওয়েল-বিশেষজ্ঞ বিপদবরণ সরকারের নামও স্মরণযোগ্য। ঢাকা বিক্রমপুরের এই আদর্শবাদী শিক্ষক বহু যন্ত্র উদ্ভাবন করেন। বাঁশের নলকূপের তিনি প্রথম ভারতীয় প্রবক্তা।

সতীশ দাশগুপ্তের প্রসঙ্গে আবার ফিরে যাই। সতীশবাবুর একটি কীর্তির কথা আজ সবাই ভুলে গেছেন। ১৯০৮-এ তিনি সেলুলয়েড তৈরির একটি সরল অথচ কার্যকর পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন।[৪২]

কলকাতায় অনুষ্ঠিত বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিয়াল এগ্‌জিবিশনে প্রদর্শিত অভিনব কলের মধ্যে ১৮৯৮-এ ব্যানার্জি কোম্পানির তৈরি স্টিম লঞ্চ (রৌপ্যপদক প্রাপ্ত)[৪৩] ও ১৮৮৩-তে প্রতিষ্ঠিত পি· ডি· মিটার কোম্পানির জরিপ কাজের যন্ত্রপাতি (স্বর্ণপদক প্রাপ্ত) উল্লেখযোগ্য।[৪৪] স্বদেশী কলকব্জার বিপুল সমাবেশ হয়েছিল ১৯০৬-এ, সেকালের পি· জি· হসপিটালের উলটো দিকের প্রাঙ্গণে আয়োজিত প্রদর্শনীতে। ভবানীপুরের আর· কে· দাসের তৈরি বেডরুম ফ্যান, সায়েন্টিফিক ইন্সট্রুমেন্টের মধ্যে

হুগলীর রবীন্দ্রনাথ ধরের রিফ্রেকটিং টেলিস্কোপ, এম· ইসাজি অ্যান্ড সন্স ও মহাদেও অ্যান্ড সন্স-এর ক্যামেরা, জে· এ· দাস অ্যান্ড ব্রাদার্সের 'এইট ডে ক্লক', ক্ষুদিরাম কর্মকারের 'টেস্টিং ব্যালান্স', ডক্টর সি· এস· কালি-র 'র‍্যাপিড ফিল্টার' ও এস· পি· ঘটকের 'ডোমেস্টিক মেশিনারি' ইত্যাদি পুরস্কৃত হয়েছিল।[৪৫]

কলকাতার পেটেন্ট অফিসের রেকর্ড থেকেও বহু উদ্ভাবক বাঙালির নাম পাওয়া যায়। এর মধ্যে উন্নত ধরনের কৃষিকাজের উপযোগী যন্ত্র নির্মাণে প্রয়াসী ভূষণচন্দ্র দাস, প্রিয়নাথ বোস ও বি· এন· ঘোষ, বয়নযন্ত্রের উন্নতি সাধনে জে· কে· বিশ্বাস, কৃষ্ণচন্দ্র দাস ও বি· সি· মৈত্র এবং ম্যাকার্থি টাইপ কটন জিন-নির্মাতা (ইউ কে পেটেন্ট নাম্বার ১৩৪৮৮, ১৯০২) এ· এম· দস্তুর ও সি· সি· ঘোষের নাম উল্লেখযোগ্য। ১৯১০ সালে জি· এন· বড়ুয়ার 'ফ্লাইং মেশিন' (গ্লাইডার) এর জন্য এবং ১৯০১ সালে জওহরলাল ধর ও কৃষ্ণচন্দ্র দাসের 'ম্যাগনেটিক' চাবি-তালার জন্য পেটেন্টের দরখাস্ত সত্যিই বিস্ময়কর।



# নীলমণি মিত্রের কলকাতা

জন্মদিন পালনের রীতিটাই সাহেবি কাণ্ড। তাই ওই সাহেবি বিচারেই কলকাতার বয়স তিনশো ধরে নিতে হয়েছে আমাদের। আর কলকাতা তিনশো নিয়ে যত মাতামাতি তার মধ্যে সাহেবদের গড়া বিদেশী গন্ধওলা বাড়িঘরগুলিই বারবার ধরা দিচ্ছে ক্যামেরায়, শিল্পীর রেখায়, গবেষকদের আলোচনায়। অথচ এই সাহেবি প্রাসাদনগরীর মধ্যেই রয়েছে উনিশ শতকের কিছু অভিনব স্থাপত্য, যার রূপকার এক বাঙালি। সাহেবি পাঠশালায় হাতেখড়ি হলেও তিনি পাশ্চাত্য রীতিকে চোখ বুজে অনুসরণ করেননি।

বছর তিনেক আগে ফরাসী স্থপতি ক্যান্টা কুজিনো পুরনো কলকাতার ঘরবাড়ি দেখতে বেরিয়ে বাগবাজারের পশুপতি বোসের ভগ্নপ্রায় প্রাসাদের সামনে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন তার বিশাল স্তম্ভগুলির চেহারা দেখে। মাথার দিকে উল্টোনো ঘটের মতো ব্যাপারটা তাঁকে মিশরীয় স্থাপত্যের কথা মনে করিয়ে দিয়েছিল। এটি যে বাঙালি স্থপতি নীলমণি মিত্রের কীর্তি, সে-কথা তাঁকে তখন বলার ফুরসত হয়নি।

বাঙালিদের মধ্যে প্রথম পাস-করা, সরকারী খেতাবধারী ইঞ্জিনিয়ার নীলমণি মিত্র। কলেজে পড়ার সময়েই গণিতে তাঁর অসাধারণ ব্যুৎপত্তি চোখে পড়েছিল রেভারেন্ড ডাফ-এর। তাঁর অনুরোধেই

An Estimate of the Cost of Constructing Laboratories &c for the Indian Association for the Cultivation of Science for the portion Colo[ure]d Red in the accompanying plan.

| | Number | Measurement L | B | D | Quantity | Total Quantity | Rate | Amount Rs | a | p |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Excavation of Foundations | 2 | 155'0" | 4'0" | 5.0 | 6200.0 | | | | | |
| | 8 | 50'0" | 4'0" | 5.0 | 8000.0 | | | | | |
| | 4 | 15'0" | 4'0" | 5.0 | 1200'0 | | | | | |
| | 4 | 20'0" | 4'0" | 5.0 | 1600'0 | | | | | |
| | 4 | 15'0" | 4.0 | 5.0 | 1200'0" | | | | | |
| | 4 | 20'0" | 4.0 | 5.0 | 1600.0" | | | | | |
| | 4 | 11'3 | 4'0 | 5.0 | 850'0" | | | | | |
| (Verandah) | 1 | 40'0" | | | | | | | | |
| | 1 | 70'0" | | | | | | | | |
| | 1 | 10'0" | | | | | | | | |
| | 1 | 30'0" | | | | | | | | |
| | 1 | 20'0" | | | | | | | | |
| | 1 | 80'0" | | | | | | | | |
| | 1 | 20'0 | | | | | | | | |
| | 1 | 25'0" | | | | | | | | |
| | | 295.0 | 2'0 | 3.0 | 1770'0" | 22450.0 | 5% | 112 | 4 | 0 |
| Concrete in Foundation | 2 | 155'0 | 4'0 | 1'0 | 1240'0" | | | | | |
| | 8 | 50'0 | 4'0 | 1'0 | 1600'0" | | | | | |
| | 4 | 15'0 | 4'0 | 1'0 | 240'0 | | | | | |
| | 4 | 20'0 | 4'0 | 1'0 | 320'0 | | | | | |
| | 4 | 15'0" | 4'0 | 1'0 | 240'0" | | | | | |
| | 4 | 20'0 | 4'0 | 1'0 | 320'0" | | | | | |
| | 4 | 11'0" | 4'0 | 1'0 | 176' | 4136.0 | 25% | 1034 | 0 | 0 |
| Foundation Brickwork | 2 | 155'0 | 2'8 | 4'0 | 3307.0" | | | | | |
| | 8 | 50'0 | 2'8 | 4'0 | 4267.0" | | | | | |
| | 4 | 15'0" | 2'8 | 4'0 | 640.0" | | | | | |
| | 4 | 20'0 | 2'8 | 4'0 | 853'0" | | | | | |
| Carried over Rupees | | | | | 9067.0 | | | [illegible] | 4 | 0 |

ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর কাল্টিভেশন অফ সায়েন্স-এর গবেষণাগার তৈরির এস্টিমেট থেকে

উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের গভর্নর হেনরি লরেন্সের সুপারিশে নীলমণি মিত্র রুড়কির টমাসন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন ১৮৫১-র মার্চ মাসে। বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ প্রতিষ্ঠার পাঁচ বছর আগে।[১]

কলকাতায় ফেরার পর তিনি কর্মজীবন শুরু করেন প্রেসিডেন্সি বিভাগের সহকারী আর্কিটেক্ট রূপে এবং ১৮৫৮-য় অ্যাসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ার পদ লাভ করেন। স্বাধীনভাবে স্থপতি ও নির্মাতা রূপে কাজ করবেন মনস্থ করে তিনি কয়েক বছরের মধ্যেই চাকরিতে ইস্তফা দেন। পাইকপাড়ার রাজাদের 'বেলগাছিয়া ভিলা'র নবরূপায়ণ, নতুন অন্দরমহল তৈরি, বেলগাছিয়া স্কুল নির্মাণ, বিদ্যাসাগরের মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন, বহুবাজার স্ট্রিটে মহেন্দ্রলাল সরকার প্রতিষ্ঠিত কালটিভেশন অফ সায়েন্স-এর প্রথম বাড়ি, মোহনবাগানের কীর্তিচন্দ্র মিত্রের বাড়ি, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের প্রাসাদ এবং 'এমারেল্ড বাওয়ার' প্রভৃতি কলকাতা ও তার আশেপাশে নীলমণি মিত্র অসংখ্য ঘরবাড়ি তৈরি করেন, যা তাঁর ভারতীয় স্থাপত্য তথা হিন্দু-মুসলিম মিশ্র স্থাপত্যের প্রতি অনুরাগের সাক্ষী। চন্দননগরের 'রতন লজ', পানিহাটির নরেন্দ্রনাথ দত্তের স্নানের ঘাট ইত্যাদিও তাঁর কীর্তি। মাহেশের বিখ্যাত লোহার রথও তাঁরই পরিকল্পনা অনুসারে ও তত্ত্বাবধানে গঠিত হয়েছিল। নিজে ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রহণ না করলেও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরের প্ল্যানও তিনি তৈরি করেন। স্কুল-কলেজ-গবেষণাগার বা জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনার জন্য তিনি পারিশ্রমিক গ্রহণ করেননি। শ্যাম স্কোয়ারে ১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দে তিনিই প্রথম স্ত্রী-পুরুষের জন্য স্নানাগার তৈরি করেছিলেন।[২]

হাওয়া বদলের জন্য সাঁওতাল পরগনার মধুপুরে বাঙালিদের উপনিবেশ স্থাপনের পিছনেও নীলমণি মিত্র। মধুপুরে স্বাস্থ্যনিবাসের উপযোগী সাদামাঠা অথচ মনোরম প্রথম দুটি বাড়ি তিনি ১৮৮৮-তে তৈরি করেন। বাড়ি দুটি 'বটতলা' নামে পরিচিত ছিল। পরের বছর 'কাঁটালতলা' এবং তার পরের বছর 'বড় দোতলা বাড়ি' ও 'পিয়ারাতলার বাড়ি' নামে আরও দুটি তৈরি করেন তিনি। সেই থেকেই মধুপুরের দিনবদল শুরু।[৩]

১৮৯৪-এর ২ অগাস্ট তাঁর মৃত্যু হয়। পরের বছর, ১৮৯৫-এর ২৬ জানুয়ারি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশনে ভাইস-চ্যান্সেলর অ্যালফ্রেড ক্রফট্‌ তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেছিলেন,[৪]

To the residents of Calcutta, it may be said si monumentum requires circumspice (if you seek his monument look around you). The mansions of many of the wealthy inhabitants of Calcutta and other important buildings of public character, bear witness to the originality and success of his ideas.

টালার নীলমণি মিত্র রো-এ তাঁর বংশধরদের সংগ্রহে সযত্নে রক্ষা পাচ্ছে কলকাতা-নির্মাতা এই পথিকৃৎ ইঞ্জিনিয়ারের প্রাচীন একটি তৈলচিত্র। সেই চিত্রে নীলমণি মিত্রের হাতে যে কম্পাসটি দেখা যায়, সেটিও সংরক্ষিত তাঁর ইন্সট্রুমেন্ট বক্সের অন্যান্য উপকরণের সঙ্গে।



# ‘বাবু’ ইঞ্জিনিয়ার আর ‘বিশ্বকর্মা’ মিস্ত্রি-মজুর

স্বদেশী কারিগরদের দক্ষতার পরিচয় লাভের সঙ্গে-সঙ্গেই পাঠক নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন যে, নীলমণি মিত্র, শিশিরকুমার মিত্র প্রমুখ জনা-কয়েকের কথা বাদ দিলে প্রায়োগিক কর্মে যাঁদের সৃজনশীল উদ্যোগ নিয়ে আমরা গর্ব করতে পারি তাঁরা কেউই স্কুল-কলেজের প্রথাগত যন্ত্রবিদ্যার পাঠ নেননি। উপেন্দ্রকিশোর, এইচ বোস প্রমুখ শিক্ষিত মানুষ, কিন্তু কারিগরি ক্ষেত্রে তাঁরাও ‘সেল্‌ফ-টট’-দের দলে।

নীলমণি মিত্র সাহেবি শিক্ষানিকেতনে প্রযুক্তিবিদ্যার পাঠ গ্রহণ করলেও গোলামখানায় ঘানি ঘোরাননি। স্বাধীন স্থপতি তথা নির্মাতা-রূপেই তাঁর প্রতিভা বিকশিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছিল।

ইংলন্ডের শিল্পবিপ্লবের মহা-মহা যন্ত্রী, জেমস ওয়াট, ট্রেভিথিক, নেস্মিথ কি জর্জ স্টিফেনসন প্রমুখ যেমন গ্রামের সূত্রধর বা কর্মকার পরিবারের ঐতিহ্যের মধ্যে থেকেই আত্মপ্রকাশ করেন, তেমনই করেছিলেন আমাদের গোলোকচন্দ্র ও আরও অনেকে। কিন্তু ইংলন্ডে গ্রামীণ হস্তশিল্পীদের মধ্যে থেকে প্রথমে মিল-রাইট ও কালক্রমে ইঞ্জিনিয়ারদের আবির্ভাবের ছকটি আমাদের এখানে অনুসৃত হয়নি। এদেশে ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যাশিক্ষার আয়োজন হওয়ার পর গোলোকচন্দ্ররা তার সুযোগ গ্রহণ করতে পারেননি। শিক্ষিত ভদ্রলোক শ্রেণীর ছাত্ররাই ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হয়েছেন। এবং পাশ করার পর সাধারণত সাহেবদের ব্রিজ, পথঘাট ও বাড়িঘর তৈরির কর্মকাণ্ডের মধ্যে শুধু চাকুরে হিসেবেই যশ লাভ করেছেন। রক্তে যাঁদের বংশগত কারিগরি দক্ষতা ছিল তাঁদের জুটল না সুযোগ আর অন্যদিকে দক্ষতাহীনদের ডিগ্রিলাভজনিত আরেক ধরনের বাবু চাকরিজীবী ‘ইঞ্জিনিয়ার

বাবু'-র জন্ম ।

স্বাভাবিক ভাবেই, এই শেষ অধ্যায়ে, আমাদের জেনে নেওয়া দরকার, বিদেশী শাসকরা কেন ভারতে আধুনিক প্রযুক্তি-বিষয়ক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনে উদ্যোগী হয়েছিল । এই 'কেন'র সঙ্গে 'কবে'র সম্পর্কটিও অবিচ্ছেদ্য ।

জে· সি· মার্শম্যান ১৮৫৩-য় হাউস অফ লর্ডসের সিলেক্ট কমিটির সামনে বলছেন, "যোগ্যতম ইঞ্জিনিয়ার অফিসারদের অধীনে মিস্টার টমসন বেশ কিছু ইউরোপীয় ও 'নেটিভ'দের শিক্ষাদানে প্রবৃত্ত হয়েছেন যাতে তারা উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের সর্বত্র পথ, সেতু নালা এবং জরিপ ইত্যাদি বিভাগে চাকরি করতে পারে ।"[১]

একই কমিটির সামনে এই বছরেই ট্রেভেলিয়ানের উক্তিতেও এরই প্রতিধ্বনি, "আমার বিবেচনায় বিশ্ববিদ্যালয়ে আর-একটি বিষয়ে বিশেষভাবে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা প্রবর্তন কবা উচিত—সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং, সার্ভেয়িং ও আর্কিটেকচার ।....আমরা ভারতে বেলপথেব যুগে প্রবেশ করেছি, এবং আমাদের ইংরেজ সিভিল ও মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ারদের অধীনে কাজ করার জন্য সেখানে 'নেটিভ ইঞ্জিনিয়ার'দের বিশাল ডিম্যান্ড হবেই"[২] :

Another branch of learning for which I consider that special means of instruction should be provided in the university is civil engineering, surveying and architecture. It is of the highest importance to develop the great latent resource of India, and it is impossible to do this, unless we call the Natives to our assistance in this as in other branches of our administrations. We have also entered upon an ara of railroads in India, and there will be a great demand for native engineers to act under our English civil and military engineers.

স্যার সি· ই· ট্রেভেলিয়ান ও মার্শম্যান-এর এই জাতীয় বিদগ্ধ অভিমতকে উপেক্ষা করার স্বাভাবিক ভাবেই কোনো উপায় ছিল না । ফলে, বছর তিনেকের মধ্যেই কলকাতায়, ১৮৫৬-এর ২৪ নভেম্বর গভর্নমেন্ট কলেজ অফ সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিঙের পত্তন হলো । রাইটার্স বিল্ডিং, প্রেসিডেন্সি কলেজ, ডালহাউসি ইন্সটিটিউট ইত্যাদি ঘুরেফিরে শেষ পর্যন্ত যা বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হিসেবে শিবপুরে পাকাপাকি আস্তানা লাভ করেছে ।

এর আগে ভারতের প্রথম পুরোদস্তুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ১৮৪৭-এ রুড়কিতে স্থাপিত হয়েছিল । উদ্দেশ্য, সেচ ও পূর্ত বিভাগের জন্য চাকুরে সংগ্রহ । মনে রাখা দরকার, কট্‌লি তখন তাঁর 'গ্যাঞ্জেস প্রজেক্ট' নিয়ে ব্যতিব্যস্ত । ওভারসিয়ার, অ্যাসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি পদে কাজ করার জন্য শ্বেতাঙ্গ সংগ্রহ করা বেশ কঠিন হয়ে পড়েছে ।

কলকাতায় সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ খোলার সময়েও উদ্দেশ্য অভিন্ন, "পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্টের হায়ার গ্রেডের জন্য বাইশ বছরের কম বয়সী তরুণদের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিঙের শিক্ষাদান ।"[৩]

রাইটার্স বিল্ডিঙে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ক্লাস শুরু হওয়ার সময়ে মুষ্টিমেয় শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন মহেন্দ্রলাল সোম । প্রেসিডেন্সি কলেজের স্নাতক । তিনি গণিত-শিক্ষক নিযুক্ত হন ।

কিন্তু প্রবল শ্বেতকায় আপত্তি ওঠে তাঁর নিযুক্তি নিয়ে। লেফটেন্যান্ট গভর্নর বলেন, "নীতিগত ভাবেই এদেশের এক নেটিভ এই মাইনেয় নিয়োগ করা উচিত নয়, কারণ মাইনের অঙ্কটি যে-কোনো ইংরেজ ক্যান্ডিডেটকে আকৃষ্ট করার পক্ষে সুপ্রচুর।"[৪]

শিক্ষক নিয়োগে বৈষম্যের কাহিনীর চেয়ে যেটা বর্তমান আলোচনার পক্ষে বেশি জরুরি, কলকাতা বা শিবপুরের এই সরকারী কলেজ থেকে যথাক্রমে ১৯৩২ ও ১৯৩৬-এর আগে কোনো ডিগ্রিধারী মেকানিক্যাল বা ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার বেবোননি। পঁচাত্তর বছবেব বেশি কাল জুড়ে শাসকরা শুধু ঘরবাড়ি, পথঘাট ও সেতু ইত্যাদি তদারকির কাজে ভারতীয়দের শিখিয়ে-পড়িয়ে নিয়েছে। তার বেশি নয়। সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিঙের অতিরিক্ত বিষয়ে যেসব পাঠক্রম ছিল, সেগুলি 'ওভারসিয়ার', 'ফোরম্যান' বা 'মেকানিক' ইত্যাদি স্তরের মধ্যেই ছিল সীমাবদ্ধ। যেমন, ১৮৬৫-তে প্রবর্তিত হয় মাইনিং ওভারসিয়ারের ও ১৮৮৩-তে মেকানিক্যাল ফোরম্যানের পাঠক্রমে। মোটরগাড়ির ড্রাইভার তৈরির জন্যও পাঠ দেওয়ার ব্যবস্থা হযেছিল ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে।[৫]

বলা বাহুল্য, প্রযুক্তিবিদ্যা শিক্ষার এই সরকারী আয়োজন কোনোভাবেই স্বদেশী শিল্পায়নের বা বংশাণুক্রমে প্রবাহিত কারিগরি দক্ষতার সৃজনশীল বিকাশের পক্ষে সহায়ক ছিল না।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে ভারতের উৎপাদন শিল্প বিকাশের জন্য কুম্ভীরাশ্রু বর্ষণের একটি নতুন কেতা শুরু হয়। বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা ও প্রতিকারের পথ বাতলানোর জন্য রিপোর্ট পেশ। কলিন (১৮৯০), কামিং (১৯০৮) ও জি· এন· গুপ্ত (১৯০৭-০৮) প্রমুখর রিপোর্টে কারিগরি শিক্ষাপ্রদানের প্রসঙ্গ থেকেও উপরোক্ত সিদ্ধান্ত সমর্থন লাভ করে।

কলিন বলছেন যে, শিবপুর থেকে প্রধানত সিভিল ইঞ্জিনিয়ার বেরোয়। কলেজের কারখানা পি· ডব্লুউ· ডি-র নিয়ন্ত্রণে থাকায় মেকানিক্যাল ছাত্রদের মধ্যে 'সাব-অর্ডিনেট' শ্রেণীও সামান্য সুযোগ পায়, 'আপার' শ্রেণীর উল্লেখই করেননি তিনি। কারণ[৬] .....it is doubtful if the college can with its present workshops ever hope to be successful in training mechanical students.

অন্যত্র, আরও স্পষ্ট ভাষায় তিনি বলছেন[৭] :

Seebpore College, though well adopted to teach Civil Engineers, does not give sufficient facilities for the training of Mechanical Engineers.

শিবপুর কলেজে মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারিঙের পাঠক্রম প্রবর্তিত হতে চলেছে ঘোষণা করে তিনি আশা প্রকাশ করেছেন যে, মেকানিক্যাল অ্যাপ্রেন্টিসরা যে-শ্রেণী থেকে আসে, তার থেকে উচ্চতর শ্রেণীর ছাত্র পাওয়া যাবে।[৮]

ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্রদের শ্রেণী অবস্থানের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি এরপরেও আবার বিবেচনা করতে হবে।

কলিনের রিপোর্ট থেকে স্পষ্ট যে, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ছাড়া শিবপুর থেকে অন্যান্য বৃত্তিতে যাঁরা সে-সময়ে শিক্ষা নিতেন, তাঁদের সবারই চরম মোক্ষ ছিল 'ফোরম্যান' জাতীয় পদ তথা চাকরিলাভ।

'ফোরম্যান' বলতে ঠিক কি বোঝায়, বা কলিন কি অর্থে শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন, তা তাঁর নিজের ভাষাতেই ব্যক্ত করা উচিত। কলকাতার মিল বা কারখানার মালিকরা কেন ইউরোপীয়ান

ফোরম্যান নিযুক্ত করতে চান, তার কারণবোঝাবার জন্য কলিন এই পদাধিকারীর কাছে প্রত্যাশিত গুণাবলীর উল্লেখ করেছেন। বৈজ্ঞানিক বা কারিগরি জ্ঞান নয়, ফোরম্যানের প্রধান দায়িত্ব হলো অধীনস্থদের উপর খবরদারি করা।[৯]

আঠার বছর পরে প্রকাশিত কামিং-এর রিপোর্টেও একই কথার প্রতিধ্বনি, ইউরোপীয় ফোরম্যানদের পছন্দ করার প্রধান কারণ দক্ষতা নয়, চারিত্রিক দৃঢ়তা[১০] :

...the firms which are financed by European capital and organised under European management prefer to employ European foremen, inasmuch as force of charater in managing factory hands is considered an essential as much as technical skill.

এর চেয়ে স্পষ্ট স্বীকারোক্তি আর কি হতে পারে যে, কারিগরি শিক্ষা বলতে ফোরম্যান স্তরে মিস্ত্রি ঠেঙানোর পাঠগ্রহণই বোঝাত। এবং সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ছাড়া সেকালে টেকনিক্যাল এডুকেশনের কোনো শাখাই ফোরম্যান বা সুপারভাইজার প্রসবের চেয়ে উচ্চতর কোনো আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেনি।

'সুপারভাইজার'-এর ভূমিকা বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে কি ভাবে শিল্প বিকাশের গতি-প্রকৃতির হদিশ পাওয়া যায় তার আভাস পাই আমরা দীপেশ চক্রবর্তীর কলকাতার জুট মিল শিল্প ও তার শ্রমিকদের অবস্থা সম্পর্কিত গবেষণা থেকে। পুঁজিবাদী ইংলন্ড ও উপনিবেশ ভারতে 'সুপারভাইজার' শ্রেণীর ভূমিকার ভিন্নতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ, তাঁর গবেষণার একটি মৌলিক গুণ। কারণ, এই ভিন্নতার সঙ্গেই জড়িত, কেন ভারতে 'সুপারভাইজার' শ্রেণীর কাছে পুঁজিপতিরা কখনোই প্রথমত বা মুখ্যত কারিগরি দক্ষতার প্রত্যাশী ছিলেন না।[১১]

দক্ষতা ও নৈপুণ্যের পাশে চোখ-রাঙানি ও দুর্ব্যবহারজড়িত ম্যানেজারি বা ছড়িদারি যেখানে সমান গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হয়, সেখানে স্বাভাবিক ভাবেই অশিক্ষিত মিস্ত্রি-মজুরদের উপর খবরদারি করার কাজে 'শিক্ষিত' মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অগ্রাধিকার। এটা আরোপিত সিদ্ধান্ত নয়, কামিং-এর রচনারই অংশবিশেষের ব্যাখ্যা[১২], "ফোরম্যান হিসেবে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর তরুণদের অতি চমৎকার সুযোগ রয়েছে, সেটা তাদের ছাড়া উচিত নয়।" (...there is a splendid opening for the middle class youth as formen if they will only take advantage of it.)

দেশী যন্ত্রবিশারদ তৈরির জন্য মধ্যবিত্ত শ্রেণীকেই যে টার্গেট করেছিল সাম্রাজ্যবাদীরা, সেটা কলিনের রিপোর্ট থেকেও জানা যায়। তাঁর মতে উচ্চবর্ণের তরুণরা যদিও সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পেশার জন্য 'ওয়েল ফিটেড', তারা মেকানিক্যাল কাজকর্মে উদ্যোগী হবে, এটা দুরাশা। দৈহিক শক্তির অভাব যদি নাও ঘটে, সামাজিক প্রতিবন্ধকতা দূর হওয়া কঠিন :

...objections, both social and physical, will for a long time prevent the adoption of an industrial career by high caste youths. They are well-fitted for civil engneering, but can hardly be expected to take up mechanical work, even if they are physically capable of it.

মোদ্দা কথাটা খুবই সরল, 'বাবু'দের মধ্যে থেকে তাঁরা ইঞ্জিনিয়ার পেতে চাইছেন কিন্তু বাড়িঘর রাস্তাঘাট তৈরির কাজ ছাড়া অন্য ক্ষেত্রের চিত্রটি বড়ই করুণ। একদিকে শিক্ষিতের মেহনতে অনীহা,

অন্যদিকে কারিগরি শিক্ষালয়ে সুযোগ-সুবিধের অভাব।

এই দুই প্রতিবন্ধকতার মধ্যে কার্যকারণের সম্পর্ক নির্ণয়ের চেষ্টা পণ্ডশ্রম। বিচারের রায় যাই হোক, 'ক' অথবা 'খ', শেষ পর্যন্ত উপকৃত বিদেশী প্রভু আর তাঁদের পণ্য।

স্বার্থপ্রণোদিত বিদেশী পরিচালনাধীন কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে এবার দৃষ্টি ফেরানো যাক স্বদেশী রণাঙ্গনে।

১৯০৫-এ বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের সময়ে ধ্বনিত হয় বিদেশী দ্রব্য বয়কটের ও বিদেশী শিক্ষা-ব্যবস্থা পরিহারের আহ্বান। সেই পর্বে 'সোসাইটি ফর দা প্রোমোশন অফ টেকনিকাল এডুকেশন' ও 'ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশন'-এর উদ্যোগে প্রায় পিঠোপিঠি স্থাপিত হয় যথাক্রমে 'বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট' ও 'বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজ'। এই ইনস্টিটিউট ও কলেজের মধ্যে প্রয়োজন ও পদ্ধতির প্রশ্নে প্রথম থেকেই মতপার্থক্য ছিল। ইনস্টিটিউট চেয়েছিল 'বিশুদ্ধ' ইন্ডাসট্রিয়াল শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও ডিপার্টমেন্ট অফ পাবলিক ইনস্ট্রাকশন যা অবহেলা করেছে। কলেজটি কিন্তু একাধারে 'টেক্‌নিশে হোক্‌শূলে' (কারিগরি উচ্চ বিদ্যালয়) ও বিশ্ববিদ্যালয় রূপে কাজ করতে চাইছে —বিনয় সরকারের ভাষায়, একাধারে একটি হার্ভার্ডি বিশ্ববিদ্যালয় ও একটি ম্যাসাচুয়েট্‌স ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি রূপে।[১৩]

টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটে ভর্তি হওয়ার জন্য নূন্যতম শিক্ষাগত যোগ্যতার চাহিদা ছিল অপেক্ষাকৃত ভাবে হালকা। সেকেন্ডারি বিভাগে ম্যাট্রিকুলেট এবং ইন্টারমিডিয়েট বিভাগে আরও কম শিক্ষাপ্রাপ্তরা ভর্তি হতে পারতো। সেকেন্ডারি বিভাগের লক্ষ্য ছিল প্রসপেক্টর, ফোরম্যান, ইন্ডাসট্রিয়াল কেমিস্ট ও অ্যাসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি পদের জন্য প্রশিক্ষণ দান। ইন্টারমিডিয়েটের ছাত্ররা গ্রহণ করতো ফিটিং, ডাইয়িং, কার্পান্ট্রি, ইলেকট্রো-প্লেটিং, লিথোগ্রাফি, সাবান তৈরি ও ট্যানিং ইত্যাদিতে হাতে-কলমে শিক্ষা।[১৪]

১৯১০-এ কলেজ ও ইনস্টিটিউট যখন এক দেহে লীন হলো, কলেজের মতাদর্শই পেল অগ্রাধিকার। কিন্তু লক্ষণীয় এরপরে কয়েক যুগ ধরে ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশন-এ (বর্তমান যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে) বলতে গেলে শুধু ইঞ্জিনিয়ারিং শাখাগুলিই ছিল কার্যকর।[১৫]

সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ, কলেজ ও ইনস্টিটিউট, উভয়ই চাইছিল, বিনয় সরকারের ভাষায়, 'মিস্ত্রিফিকেশন'—অর্থাৎ মিস্ত্রি তৈরি করতে। আপাতদৃষ্টিতে প্রশংসনীয় উদ্যম। কিন্তু সৃজনশীল দক্ষ মিস্ত্রিদের যে বিরাট এক বাহিনী তখনই বিরাজ করছে, সে-সম্বন্ধে কি আদৌ কোনো চেতনা ছিল শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনকারীদের ? তাঁরা একবারও চিন্তা করেননি, প্রায় 'নিরক্ষর' অথচ দক্ষ মিস্ত্রিদের আধুনিক ইঞ্জিনিয়ার রূপে আত্মপ্রকাশের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য কি করা প্রয়োজন। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উপর নির্ভরতার ক্ষেত্রে বিদেশী বা স্বদেশী শিক্ষাবিদদের মধ্যে কোনো পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় না।[১৫]

'মিস্ত্রিফিকেশন' শব্দটি নিহিতার্থে, মিস্ত্রির কাজে অন্য শ্রেণীর মানুষদের প্রলুব্ধ করার ইঙ্গিতবাহী। মিস্ত্রির স্বার্থরক্ষার নয়।

কাজেই, ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশনের সৌজন্যে যদিও বাংলাদেশে প্রথম মেকানিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল ও কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিঙের প্রকৃত শিক্ষাক্রম প্রবর্তিত হলো, সুবিধে ভোগী শ্রেণীর চৌহদ্দির বাইরে তার কোনো প্রভাব পড়লো না।

শুধু, 'মিস্ত্রিফিকেশন' শব্দটির ব্যাখ্যার সুবাদে এই সিদ্ধান্ত যাতে অতি-সম্প্রসারিত বলে বিবেচিত না হয়, তাই 'দা ডন অ্যান্ড ডন সোসাইটির ম্যাগাজিন'-এ প্রকাশিত একটি নিবন্ধ স্মরণ করছি। ডন সোসাইটি ও তার প্রতিষ্ঠাতা, প্রবাদ-প্রতিম সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ছিলেন ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশনের গঠনমূলক পর্বে তার চালিকাশক্তি স্বরূপ।

ঐতিহাসিক, নৃতত্ত্ববিদ ও 'ডন'-এর সক্রিয় সদস্য হারাণচন্দ্র চাকলাদার এবং বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজের মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিঙের প্রথম বাঙালি শিক্ষক এন· এন রক্ষিত—দু'জনে মিলে ১৯১০-এ রচিত একটি নিবন্ধে বলছেন যে, আধুনিক শিল্প-কারখানার জন্য (নির্মাণমূলক শিল্পপ্রতিষ্ঠানে) আধুনিক কারিগরদের একটি শ্রেণীকে গড়েপিঠে নিতে হবে। বংশানুক্রমিক হস্ত শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি বংশানুক্রমিক কারিগররা দেখাশোনা করুক, তাতে ক্ষতি নেই, কিন্তু আধুনিক কারখানাগুলির ভার তুলে দিতে হবে 'অগ্রসর শ্রেণীর' সন্তানদের হাতে[১৭] :

...a class of men, who may aptly be called the 'modern' artizans, have to be trained in what may be called the 'modern' industries (manufacturing industries). The heriditary industries are to be confined to the hereditary craftsmen, but the modern ones are to be thrown to sons of 'advanced races'. These modern-trained artizans will become soap-makers, candle-makers, match-makers, glass-blowers, braziers, pencil-makers, brush-makers, oil-pressors, sugar-refiners, handloom-weavers, hand-mill spinners, calico-hand-working-roller-printers and so on. These modern artizans can alone counteract the present overflowing of Indian homes with improted foreign stuffs.

মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু যোগ করা দরকার যে, সরকারি বিশেষজ্ঞ জে· জি· কামিং তাঁর ১৯০৮-এর রিপোর্টের একটি অধ্যায়ে 'বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজে কোন্ শ্রেণীর ছাত্ররা শিক্ষা নেয়', এই শিরোনামেই নিবেদন করেছিলেন, সাহিত্যিক বৃত্তিতে এতদিন যে সুযোগ-সুবিধে ছিল তা হ্রাস পাওয়ায় উচ্চতর শ্রেণীর ছাত্ররাও প্রথাগত কুসংস্কার ত্যাগ করে কল-কারখানার কাজে বাধ্য হয়ে যোগ দিচ্ছে[১৮] :

At the present moment, apart from the advice of the Indian publicists, the better class youths have been forced inspite of their traditional prejudices against manual labour, into industrial lines on account of the competition which has closed up the avenues hitherto open to them in literary careers.

রুজি-রোজগারের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা তীব্রতর হওয়ায় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যে অংশকে বাধ্য হয়ে কারিগরি শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়েছিল, তাদের কাছে নিশ্চয় সৃজনমূলক কিছু আশা করা অন্যায়। অন্যদিকে, সৃজনশীল প্রতিভাধর কারিগররা রয়ে গেলেন উপেক্ষিত, অনাদৃত, শেষ সারিতে তাঁদের ঠাঁই।

কারিগরি শিক্ষা প্রবর্তনের প্রথম স্বদেশী প্রস্তাবটির কথা সবার শেষে উল্লেখ করছি। কারণ,

প্রস্তাবটি গৃহীত বা প্রযুক্ত হয়নি । অথচ, এইটিই ছিল সবচেয়ে সম্ভাবনাময় ও বাস্তবানুগ পরিকল্পনা ।

অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষ প্রমুখের উদ্যোগে ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের 'সিস্টার' সংস্থা হিসাবে স্থাপিত হয় 'ইন্ডিয়ান লীগ' । 'ইন্ডিয়ান লীগ' কলকাতায় যুবরাজের আগমন উপলক্ষে 'অ্যালবার্ট টেম্পল অফ সায়েন্স' প্রতিষ্ঠা করে । এই সংস্থা ও ডাইরেক্টর অফ পাবলিক ইনস্ট্রাকশনের অনুরোধে বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী, উদ্ভাবক ও কারিগরি বিষয়ে অভিজ্ঞ, ঢাকা নর্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক দীননাথ সেন করিগরি বিদ্যায়তন স্থাপনের জন্য একটি প্রস্তাব রচনা করেন ।[১৩] ১৮৭৬-এ স্বতন্ত্র পুস্তিকা আকারে ও বিভিন্ন দৈনিক পত্রেও সেটি মুদ্রিত হয়েছিল । (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য) । স্মরণীয়, এই বছরেই মহেন্দ্রলাল সরকার প্রতিষ্ঠা করেন বিজ্ঞান চর্চার স্বদেশী কেন্দ্র ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর কাল্টিভেশন অফ সায়েন্স ।

ভারতের শিল্পোন্নতির ক্ষেত্রে প্রধান প্রতিবন্ধকতার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে দীননাথ জানিয়েছিলেন, তাঁর মতে, মিল ও কল-কারখানা স্থাপনের জন্য যথেষ্ট মূলধন নিয়োগ হচ্ছে না । এবং না হওয়ার অন্যতম তিনটি কারণ— (১) ইওরোপীয় ইঞ্জিনিয়ার ও সুপারিন্টেন্ডেন্ট নিয়োগের অতিরিক্ত ব্যয়ভার (২) ইওরোপে তৈরি যন্ত্র আমদানির খরচ ও (৩) সেগুলি মেরামতি বা সংস্কার সাধনের অসুবিধা । দীননাথের মতে তাই দেশী ইঞ্জিনিয়ারকুল সৃষ্টি না হলে সমস্যার সুরাহা হবে না ।

দেশী ইঞ্জিনিয়ারদের কাছে দীননাথের আরও একটি প্রত্যাশা ছিল । ইংলন্ডের সঙ্গে ভারতের পরিস্থিতির ভিন্নতার উল্লেখ করে তিনি বলেছিলেন, ভারতীয় পরিবেশের বৈশিষ্ট্যকে নিশ্চয় কাজে লাগাতে পারবে দেশী ইঞ্জিনিয়াররা । উদাহরণ স্বরূপ, আমাদের দেশে জল ও বায়ু-প্রবাহকে চালিকা শক্তি হিসাবে ব্যবহারের সম্ভাবনার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তিনি । ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ারদের রেলওয়ে ও স্টিমারে, মিল ও ডক-ইয়ার্ডে এবং যাবতীয় ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে আদৃত না হওয়ার কোনো কারণ আছে বলে তিনি মনে করেননি । এবং ইঞ্জিনিয়ার বলতে তিনি সর্বদাই মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারদেরই বুঝিয়েছেন । সিভিল ইঞ্জিনিয়ারদের নিয়ে চিন্তা করেননি কারণ, তার জন্য বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ তো ছিলই ।

এই শিক্ষায়তনকে তিনি এমনভাবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন যাতে শিক্ষাপ্রাপ্তরা বিদেশী যন্ত্রপাতি শুধু মেরামত নয়, তার সংস্কার বা উন্নতিসাধনেও সক্ষম হয়, ভারতীয় ইঞ্জিনিয়াররা যাতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কৃষি-খামার পরিচালনার ভার নিতে এবং নিজেরাই স্বল্প মূলধনের কারখানা স্থাপন করতে পারে ।

দুই ধরনের শিক্ষাক্রম প্রবর্তনের কথা তিনি চিন্তা করেন । ইংরেজিতে যাদের ব্যুৎপত্তি এন্ট্রান্স মানের সমতুল তাদের জন্য একটি শ্রেণী আর যারা শুধু বাংলা জানে, তাদের জন্য দ্বিতীয়টি ।

পাঠ্যক্রম ছাড়াও শিক্ষায়তনের বিভিন্ন বিভাগ, শিক্ষক ও কর্মচারীর তালিকা ইত্যাদি প্রণয়নের মধ্যেও দীননাথের দূরদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায় । ব্যবহারিক শিক্ষাদানের জন্য শুধু কারখানা স্থাপন নয়, বিদ্যায়তন-সংশ্লিষ্ট সেই কারখানাটিকে অর্থকরী ভাবে উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করার কথাও চিন্তা করেছিলেন তিনি । কারখানার নিজস্ব আয় বা অনুদান বৃদ্ধি সাপেক্ষে একটি 'মডেল' কৃষিক্ষেত্রকেও বিদ্যায়তনের সঙ্গে সংযুক্ত করার ইচ্ছা ছিল তাঁর ।

হাতেকলমে শিক্ষাদানের জন্য কারখানা ছাড়াও তিনি একটি 'মিউজিয়াম' স্থাপনের সুপারিশ করেছিলেন । তাঁর প্রস্তাবটির মধ্যে এইটিই সবচেয়ে অভিনব এবং মৌলিক দর্শনের পরিচায়ক । বৃহৎ

যন্ত্রশিল্প, বিশেষ করে রাসায়নিক কারখানা ইত্যাদির কাজের ধারার সঙ্গে ছাত্রদের পরিচয় ঘটানোর জন্য তিনি 'প্রোটোটাইপ' বা মডেলের আশ্রয় গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। বৃহৎ যন্ত্রশিল্পের অতিকায় স্টিম ইঞ্জিন কি ভাবে সারি সারি যন্ত্রের চাকা ঘুরোচ্ছে তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জনের সুবিধা যদি নাও জোটে, মিউজিয়ামের ব্যাখ্যামূলক ছোট্ট একটি ইঞ্জিন, গুটি কয়েক যন্ত্রকে চালনা করার সুবাদেই ছাত্রদের প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা বা জ্ঞান সরবরাহ করতে পারবে।

দীননাথের এই প্রস্তাবটি প্রকাশ হওয়ার অল্প দিনের মধ্যেই 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' পত্রিকায় প্রতাপচন্দ্র ঘোষের একটি দীর্ঘ প্রতিবাদ-পত্র প্রকাশিত হয়। প্রতাপচন্দ্র দীননাথের প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। তাঁর বিচারে, আধুনিক ইউরোপীয় রীতিতে শিক্ষা প্রাপ্ত ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ারদের জন্ম দেওয়ার চেয়ে অনেক বেশি প্রয়োজন ঐতিহ্যবাহী ভারতীয় হস্তশিল্পী বা কুটীরশিল্পে নিযুক্তদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা।

প্রত্যুত্তরে দীননাথের যে-চিঠিটি প্রকাশিত হয় তা তাঁর কারিগরি শিক্ষায়তন স্থাপনের প্রস্তাবটির চেয়েও আজ ঐতিহাসিকদের কাছে সম্ভবত অধিকতর মূল্যবান উপাদান।[২০] চিঠিটিই স্বাক্ষী, কী স্বচ্ছ বিচারধারা ও উপলব্ধি তাঁর ওই মূল প্রস্তাবটিকে প্রণোদিত করেছিলে।

হস্তশিল্পী বা কুটীরশিল্পী বলতে কাদের বোঝাতে চেয়েছেন প্রতাপচন্দ্র এবং কি তাদের মূল সমস্যা, প্রথমত সেইটি আলোচনা করেন দীননাথ। তাঁর মতে এঁরা হলেন সেই সম্প্রদায়ভুক্ত দক্ষ কারিগর যাঁরা সাধারণত একা হাতে নগণ্য পুঁজি ও সাদামাটা হাতিয়ার অবলম্বন করেই উৎপাদনে ব্রতী। কখনো তেমন প্রয়োজন থাকলে পরিবারের সদস্যরা তাঁদের সাহায্য করেন। এই তথাকথিত 'আর্ট ম্যানুফ্যাকচারার্স'—এমব্রয়ডারি, গয়না, সোনা রূপা বা হাতীর দাঁতের কারিগর কি ঢাকাই মসলিন-নির্মাতা, বংশানুক্রমিক ভাবে তাঁরা অর্জন করেছেন কুশলতা। দীননাথ ঠিকই মন্তব্য করেছিলেন যে, কোন বিদ্যালয় বা কোন পাঠক্রমের পক্ষেই এ-ধরনের কারিগরদের জন্মদান সম্ভব নয়।

উল্লিখিত হস্তশিল্পীদের দুরবস্থার মূল কারণ চাহিদার অভাব। উৎপন্ন সামগ্রীর বাজার ছিল না। সরকারী উদ্যোগে তাঁদের তৈরী দু' চারটি দ্রব্য বিদেশের প্রদর্শনীতে ঠাঁই বা উচ্চ-প্রশংসা পেলেও সমস্যা লাঘব হয়নি। বরং দীননাথের মতে, বিদেশী প্রদর্শনীতে এই সব জিনিস নিয়ে যাওয়ার আসল কারণ হলো, দ্রব্যগুলির শস্তা ও খেলো ধরনের নকল নির্মাণে ইওরোপীয় উৎপাদকদের উৎসাহিত করা।

আরেক ধরনের কুটিব শিল্পীদের কথা উল্লেখ করেন দীননাথ। তাঁরা তৈরি করতেন নিত্যব্যবহার্য দ্রব্য—পোশাক, বাসন ইত্যাদি। এই ধরনের জিনিসের চাহিদা ছিল কিন্তু দামের দিক থেকে ইওরোপের কারখানার 'মাস প্রোডিউস'-এর সঙ্গে পাল্লা দিতে পারতো না।

এই পরিপ্রেক্ষিতেই দীননাথ পেশ করেছিলেন তাঁর ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ার তৈরির শিক্ষায়তনের প্রস্তাব। দেশী ইঞ্জিনিয়ারদের অভাব অনুধাবন করেছিলেন দীননাথ কিন্তু দক্ষ কারিগরের নয়। তিনি লিখেছেন, এ দেশে ইওরোপীয় ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানায় দিশী কারিগররাই যাবতীয় জটিল ও দুরূহ উৎপাদনের কামে নিযুক্ত। সংক্ষিপ্ত শিক্ষানবিশ পর্বের পরে তাঁরা অসামান্য দক্ষতা অর্জন করেন। টমসন, জেসপ ও বার্নের কারখানায় তিনি শুধু দেশী কারিগরই দেখেছিলেন। তিন চারবার বরানগর জুট মিল পরিদর্শন করেন তিনি, একটি মাত্র শ্বেতাঙ্গকে, তাও লেখাপড়ার কাজে ব্যস্ত থাকতে

দেখেছেন। ম্যাকঅ্যালিস্টার্স মিলের বিদেশী ইঞ্জিনিয়ার কর্মরত এক কারিগরের দিকে দীননাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করে মন্তব্য করেছিলেন, "ওই লোকটির তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আর আঙুলের ক্ষিপ্রতা দেখে ল্যাঙ্কাশায়ারের সবচেয়ে অভিজ্ঞ ও প্রবীণ কারিগরও ঈর্ষা বোধ করবে।" দীননাথ জানাচ্ছেন, "হ্যামিলটন অ্যান্ড কোম্পানি, কুক অ্যান্ড কেলভি কি ল্যাজারাস অ্যান্ড কোম্পানি—সর্বত্রই শুধু ভারতীয় কারিগর। কলকাতা বা তার সন্নিহিত অঞ্চলে যাবতীয় কলকারখানা বা ডক-ইয়ার্ডেও তাই। ভবানীপুরের সার্জিকাল ইন্সট্রুমেন্ট নির্মাতার তৈরী উপকরণ ডক্টর সাটক্লিফ ইওরোপীয় দ্রব্যের চেয়েও উন্নতর বিবেচনা করেন এবং সে-কথা শিক্ষাদপ্তরের রিপোর্টেও প্রকাশিত হয়। আমহার্স্ট স্ট্রিটের ঘড়ি-ওলা বাড়ির ঘড়ি-নির্মাতা ইংলন্ড থেকে 'হুইল কাটিং' ও আরো নানা যন্ত্রপাতি আনিয়েছেন। ঘড়ি ও হাত-ঘড়ি নির্মাণের (শুধু মেরামতি নয়) ব্যাপারে তাঁর অসাধ্য কিছু নেই।"

দক্ষতার এই প্রাচুর্য ও ঐশ্বর্য সত্ত্বেও কারিগররা কেন স্বাধীন ভাবে কল কারখানা স্থাপন করার বা তার হাল-ধরার কাজে এগিয়ে আসছে না, তারও উত্তর সন্ধান করেন দীননাথ। 'ইংলিশম্যান' পত্রিকা সে-সময়ে একবার মন্তব্য করেছিল, "সত্য এইটাই যে এ দেশের কারিগররা, নিতান্ত ব্যতিক্রমের কথা বাদ দিলে, কখনোই ইঞ্জিনিয়ারদের গোত্রে আরোহণ করতে পারবে বলে আশা করা যায় না এবং একমাত্র ইঞ্জিনিয়াররাই পারে বড় আকারের কাজকর্ম সম্পাদন বা তার তদারকি।"

এই শ্বেত-যুক্তি খণ্ডন করে দীননাথ জানিয়েছিলেন, দক্ষ কারিগরদের তত্ত্বজ্ঞানের অভাবটিই তাদের ইঞ্জিনিয়ারের গোত্রে আরোহণের পথে একমাত্র বাধা। এবং সেইটি অপসারণও তাঁর শিক্ষায়তন স্থাপনের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

প্রাচ্যের দেশসমূহের মধ্যে ভারতই প্রথম বৃহৎ যন্ত্রশিল্পের ধাক্কা টের পায়। তবু ভারতের শিল্পোন্নয়নের কাজ রয়ে গেল অসম্পূর্ণ, অথচ জাপান, পরে শুরু করে এবং অপেক্ষাকৃত ভাবে কম সম্পদের অধিকারী হয়েও সেই কাজ সমাধা করল। এই 'প্রহেলিকা'র রহস্যভেদ করার জন্য প্রখ্যাত গবেষক অমিয় কুমার বাগচী দৃষ্টি দিয়েছেন ব্যক্তিগত পুঁজি বিনিয়োগের ক্ষেত্রটিতে।[২১] প্রসঙ্গ সূত্রে এসেছে, ১৯০০ থেকে ১৯৩৯ পর্বে, ভারতে দক্ষ কারিগরদের লভ্যতা, চাহিদা ও যোগানের প্রশ্ন। তাঁর একাধিক সিদ্ধান্তের সমর্থনে এই প্রসঙ্গটি কিছু উদাহরণ সরবরাহ করবে। ভারতীয় কারিগরদের চাহিদা প্রসঙ্গে, তাদের নিয়োগ করার ব্যাপারে ব্রিটিশ ম্যানেজার ও শিল্পপতিদের জাতিগত পক্ষপাত এবং কুপার্স হিল-এ রয়েল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে শ্বেতাঙ্গদের জন্য বিশেষ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা যাতে তারা ভারতে পূর্ত বিভাগের উচ্চতর পদগুলি লাভ করতে পারে—এই বিষয় দুটি নিয়েও শ্রীবাগচীর অনুসন্ধিৎসা প্রসঙ্গত স্মরণযোগ্য। তিনিও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়েছেন যে, ভারতের শিল্পক্ষেত্রে অনগ্রসরতার কারণ দক্ষ কারিগরের অপ্রতুলতা নয়[২২] :

> ....the shortage of skill was not a fundamental bottleneck but was largely a reflection of the industrial backwardness of India and the policies of recruitment pursued by the British Government and British businessmen. Among ordinary workers lack of skills was primarily due to their illiteracy.

একদিকে ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার পরিকল্পিত ফাঁকি, অন্যদিকে জাতীয়তাবাদী নেতাদের মধ্যবিত্ত অবস্থান—দুয়ে মিলে 'বাবু' ইঞ্জিনিয়ারদের জন্ম দিয়েছে, আর সেই সূত্রে তাদের সঙ্গে

'বিশ্বকর্ম্মা' মিস্ত্রি-মজুরদের মধ্যে যে ভেদরেখা সৃষ্টি করেছে, আজও তার জের বহন করে চলেছি আমরা।

গোলোকচন্দ্র, কি হানেফ সারেঙ প্রমুখর সন্তানরা জেমস ওয়াট বা স্টিফেনসনদের পরবর্ত্তী প্রজন্মের মতো কোনো সুযোগ-সুবিধে পেলেন না, না বিদেশী না স্বদেশী কারিগরি শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের পরেও।